ISSN : 2320-9275

বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও বাংলা সাহিত্য

বিশেষ সংখ্যা

জানুয়ারি-ডিসেম্বর ঃ ২০১৪

উদ্দালক

সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

উদ্দালক

ষা ণ্মা সি ক সা হি ত্য প ত্রি কা

চতুর্দশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্মসংখ্যা

২০১৪

Office Copy

বিষয়

বাঙালিজীবনে বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতি

প্রধান সম্পাদক

সন্তোষকুমার মণ্ডল

সম্পাদক

কিঙ্কর মণ্ডল   অনুপ বিশ্বাস

অমিত দে   সংঘমিত্রা কর্মকার

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

১১/৩, উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯

Uddalak Sahitya Patrika. 14th year, 1st and 2nd combined issue.
Subject : **Bangalee-Jibane Boudtha-Sahitya O Sanskriti**
Chief editor : Dr. Santosh Kumar Mandal. Editors: Kinkar Mandal, Anup Biswas, Amit De & Sanghamitra Karmakar.

ISSN 2320-9275

© প্রধান সম্পাদক

প্রকাশক : সন্তোষকুমার মণ্ডল
উদ্দালক পাবলিশিং হাউস,
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা,
কলকাতা-৭০০০৪৯.

মুদ্রক: সুকান্ত ঘোষ
নবলোক প্রেস,
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০০৬

পরিবেশক : দে'জ, পাতিরাম, কলেজ স্ট্রিট।

মূল্য : ১০০ টাকা।
Price : One hundred rupees only.

সম্পাদকীয়

বাংলার বুকে নেমে এসেছে এক মহাতামস। সমগ্র বাঙালি জাতি আপন চিত্তবিকারজনিত মনুষ্যত্বের অপূর্ণতায় এই মহাতামসে আত্মপীড়ন অনুভব করে অনুশোচনায় মগ্ন হয়েছে। পীড়িত-আত্মার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করে যে মহামানব একদা রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, আজ বাঙালির এই দুঃসময়ে সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করবার দিন এল- বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

মনুষ্যত্বের জ্যোতির্ময় আলোকশিখায় তিনি একদা বাঙালি জাতিকে জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন, তারপর বাঙালি জাতি তাঁকে বিস্মৃত হয়েছে। জাতির জীবনে ঘনীভূত মহাতামস তারই ফল। এই মহাতামসে 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা;' তাতে শিক্ষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য-কৃষ্টি সবই রসাতলে যাচ্ছে। এই রসাতল থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হলে ধর্মে এর বিধান মিলবে না, রাজার শাসনদণ্ডও এর তল খুঁজে পাবে না। বেদ-বাইবেল-গীতা নয়, একমাত্র উপায় ভগবান-বুদ্ধের অষ্টাঙ্গিক মার্গ- সম্যক দৃষ্টি, সৎকর্ম. সৎবাক্য, সৎসংকল্প, সৎচেষ্টা, সৎজীবন, সৎস্মৃতি ও সম্যক সমাধি- মুক্তিপথের পাথেয়। এর জন্য বৌদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন নেই, বিশেষ কোন ধর্মের ছত্রছায়াও নিষ্প্রয়োজন। কেবল পূর্ণতর মানুষ হয়ে ওঠবার সাধনপথেই তামসবিনাশী জ্যোতির্ময়লোকে উত্তরণ ঘটে। ভগবান-বুদ্ধ সেই পথের অগ্রপথিক। আজ আমাদের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে- 'সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কার্যে ধ্বজা ধরে আমরাও হব বরণীয়।' নইলে এই সর্বব্যাপী অধঃপতনের হাত থেকে আমাদের মুক্তি নেই।

উদ্দালকের এই সংখ্যা স্মরণে-বরণে সেই মহামানবের প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

প্রধান সম্পাদক

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত গ্রন্থ

• রবীন্দ্রসাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থ

ড. পুলিন দাস — মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ ২৪০ টাকা

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল — রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য ১০০ টাকা
রবিকিরণে নবরত্ন ৬০ টাকা
রবীন্দ্রকাব্যনাট্য : রূপ ও রূপান্তর ৯০ টাকা
রক্তকরবী : আলোকিত উদ্ভাসন (সম্পাদিত) ২২৫ টাকা

• শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ

ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় — ভারতীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ১২০ টাকা

• অধ্যাপকদিশারী গ্রন্থ

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল ও সৌম্য দত্ত — নেট-সেট জেনারেল (প্রথমপত্র দ্বিভাষিক) ৪০০ টাকা

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল — নেট-সেট বাংলা (দ্বিতীয়পত্র) ৫০০ টাকা
নেট-সেট বাংলা (তৃতীয়পত্র) ৩৬০ টাকা

• শিক্ষকদিশারী গ্রন্থ

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল — আর.এল.এস.টি বাংলা (প্রকাশিতব্য)
এস.এস.সি টেট ৩৭৫ টাকা
সি. টেট প্রথমপত্র (প্রাইমারি) ৩০০ টাকা

দূরশিক্ষা দিশারী

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল সম্পাদিত

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ বাংলা পার্ট-ওয়ান ৩০০ টাকা, পার্ট-টু ৩০০ টাকা

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ বাংলা পার্ট-ওয়ান ৩৫০ টাকা, পার্ট-টু (প্রকাশিতব্য)

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
এম.এ বাংলা পার্ট-ওয়ান ৪০০ টাকা, পার্ট-টু (প্রকাশিতব্য)

যোগাযোগের ঠিকানা

কাশনা দপ্তর, ১১/৩, উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৪৯
ান- (০৩৩) ২৫৪১ ৪৬১৭, (M) ৯৮৭৪৩১৭৩৫৭
মেল uddalakpublishing@gmail.com
য়েবসাইট www. uddalakpublishing.com

সূচিপত্র

বৌদ্ধদর্শনে মধ্যমপন্থা : একটি সমীক্ষা	রজিনা কবীর	০৭
বৌদ্ধদর্শনে শ্রদ্ধাবাদ	ড. স্বপ্না বসু	১৭
প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধশিক্ষাদর্শন	চন্দ্রমিত্রা কর্মকার	২৩
বৌদ্ধভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে জাতক	গৌরী সাঁফুই	৩৩
তান্ত্রিক বৌদ্ধদর্শন : বাঙালিজীবন ও সাহিত্যে	ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম	৪২
বৌদ্ধসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি	সুশোভন চ্যাটার্জি	৫৫
বাংলায় বৌদ্ধচর্চা প্রসঙ্গে	পুলিন দাস	৬২
ক্রমবিবর্তনের ধারায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালিবৌদ্ধ	উত্তমকুমার মণ্ডল	৬৫
বাংলায় বৌদ্ধধর্ম : প্রভাব ও পরিণতি	তন্ত্রী বিশ্বাস	৭৩
বৌদ্ধধর্মে পরিবেশচেতনা	ড. সুকন্যা সরকার	৮৩
বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে বৌদ্ধপ্রভাব : প্রাক্-আধুনিক পর্ব	ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল	৯৩
চর্যাপদের বাঙালিজীবন ও বৌদ্ধধর্ম	মৌসুমী চক্রবর্তী	১০২
বৌদ্ধধর্ম: আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির নিয়ামক	অমিত দে	১০৭
ভগবান বুদ্ধের দিব্যজন্ম : বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের অনুসরণে	ড. অর্ণব পাত্র	১১৫
রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধপ্রভাব	ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	১২০
রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব- একটি আলোচনা	অনুপ বিশ্বাস	১২৯
বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ	ড. প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত	১৩৪
রবীন্দ্রনাটক : বৌদ্ধ আখ্যানের নবনির্মাণ	ড. সুরঞ্জন মিদ্দে	১৪৪
বুদ্ধজীবনকথা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘তথাগত’ : ইতিহাসের পুনর্জন্ম	ড. সনৎকুমার নস্কর	১৫৪
হার না মানা চণ্ডালিকা	ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৭৯
কাকাবাবু ও বজ্রলামা : না-ধর্মী সুনীলের ধর্মীয় স্ট্রাটেজি	শৌভিক দাশগুপ্ত	১৮৫
The Story of Ramayana in Buddhist Literature	Modhurima Mukherjee	১৯১
Buddhism and a new Definition of Nirvana	Dr. Nibedita Pal	১৯৪
Psycho-Therapeutic Aspects of Buddhist Meditation	Animesh Prakash	২০১

বৌদ্ধদর্শনে মধ্যমপন্থা : একটি সমীক্ষা

রেজিনা কবীর

ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে 'দর্শন' শব্দের অর্থ হ'ল সত্যদর্শন বা তত্ত্বদর্শন।[১] এই সম্যক্ জ্ঞানের বিষয় বাহ্য ও অন্তর ভেদে দুপ্রকার হতে পারে – বাহ্যজগৎ ও জীবের অন্তর জগৎ তথা স্বরূপের উপলব্ধি। এই উভয় ক্ষেত্রেই বৌদ্ধ দার্শনিকগণ তাঁদের দর্শনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। যথাক্রমে তাঁদের কার্যকারণ সংক্রান্ত মতবাদ ও আত্মতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়। উভয়ক্ষেত্রেই মধ্যমপন্থা কিভাবে বৌদ্ধ দর্শনের স্বাতন্ত্রতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছে তারই বিশ্লেষণ এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

মানুষের জীবনাদর্শ ও লক্ষ্য প্রসঙ্গে পর্যালোচনা করলে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের দৃষ্টিভঙ্গির স্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বলিষ্ঠ জীবন ও সক্রিয় সেবা পাশ্চাত্যকে আকৃষ্ট করে। পাশ্চাত্য মতে কোন অজ্ঞাত, অলভ্য এবং অসীম পরিতৃপ্তির জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করার চেয়ে জীবন পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা ও সদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত করা বুদ্ধিমানের কাজ। পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় জীবনের লক্ষ্য ও তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করলে ড: সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের ভাষায় বলতে হয় – "মানবিক ও জাতিগত দক্ষতার ভিত্তিতে ব্যাখ্যাত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশই আদর্শ লক্ষ্য। প্রথা অনুসরণই ধর্ম।"[২]

অপরদিকে প্রাচ্যে ধর্ম আধ্যাত্মিক মুক্তির সূচনা করে। দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই হ'ল প্রাচ্যের ধর্ম তথা দর্শনের লক্ষ্য। প্রাচ্যে ধর্ম বলতে অন্তরজীবনের উৎকর্ষসাধন বোঝানো হয়।[৩] ভারতীয় দর্শন মতে ভূমা বা অসীমের সাধনাই মানুষের জীবনাদর্শ হওয়া উচিত। ছান্দোগ্যোপনিষৎ-এ বলা হয়েছে – "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।"[৪] অর্থাৎ 'যাহা ভূমা, তাহাই সুখ: অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ।' আরো বলা হয় "যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত; আর যাহা অল্প, তাহা মর।"[৫] ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য এই মর জগতের গণ্ডীকে অতিক্রম করে অমৃতত্ব প্রাপ্তি। ভারতীয় দর্শনের একটি সম্প্রদায়রূপে বৌদ্ধ দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়, যার লক্ষ্য হ'ল জ্বরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর গণ্ডী অতিক্রম করে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করা।

ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে দর্শন শব্দটি নানা বিষয়ের আলোচনা বা তত্ত্ববিশ্লেষণ করলেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তির নিজ স্বরূপ অর্থাৎ আত্মোপলব্ধিতেই পর্য্যবসিত।[৬] এই আত্মোপলব্ধি এবং তদনুসারে প্রাপ্ত ফলকেই বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলির সংজ্ঞা বা পর্য্যায়শব্দ বা নাম যথাক্রমে মোক্ষ, অপবর্গ,

---

অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন্।

কৈবল্য, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স ইত্যাদি।[৭] আত্মার স্বরূপের অনুসন্ধান ও উপলব্ধিই দর্শনের বা দার্শনিকের অভিপ্রেত। ভারতীয় দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায়রূপে স্বীকৃত বৌদ্ধদর্শনে উপরিউক্ত পর্য্যায় শব্দগুলির মধ্যে নির্বাণ শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা তাকে মানব জীবনের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। বৌদ্ধদর্শন মতে এই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর মূল মন্ত্র হ'ল মধ্যমপন্থা অবলম্বন। বৌদ্ধদর্শন মতে মধ্যমপন্থাই শ্রেষ্ঠ পথ যা সকলের অনুসরণ করা উচিত। ধম্মচক্কপবত্তন – সুত্ত গ্রন্থের প্রথম সূত্রেই সতর্ক করে বলা হয়েছে প্রত্যেকেরই দু'প্রকার চরমপন্থা পরিহার করা উচিত।[৮] মধ্যমপন্থার মূল উদ্দেশ্য হ'ল সত্য অনুসারে জীবনের আদর্শ উপলব্ধি। বৌদ্ধমতে এটিই আর্যপথ যা 'সম্বোধিগামিন্' বা 'সম্বোধিপরায়ণ' নামে উপদীষ্ট – অর্থাৎ এই পন্থা যথাযথ অনুসরণ করে বোধি প্রাপ্তি সম্ভব।[৯]

মধ্যমপন্থা অবলম্বনে তপস্যার দ্বারা বোধিপ্রাপ্ত গৌতমবুদ্ধ বোধির আলোকে চারটি সত্যের উপলব্ধি করেন যা বৌদ্ধদর্শনে আর্যসত্য চতুষ্টয় নামে প্রসিদ্ধ। এই চারটি আর্য সত্য হ'ল – দুঃখ, দুঃখ সমুদায়, নিরোধ ও মার্গ।[১০] বৌদ্ধদর্শনের প্রথম আর্যসত্যে বলা হ'ল – 'সর্বং দুঃখম্'[১১] অর্থাৎ সবই দুখময়। আপাতদৃষ্টিতে জগতে যা কিছু সুখকর বা সুখদায়ক বলে মনে হয় তার অন্তরালেও দুঃখের বীজ নিহিত আছে। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে প্রথম আর্যসত্য যেভাবে জাগতিক সমস্ত বিষয়কেই দুঃখের কারণরূপে প্রকাশ করে তা পরিণামে দুঃখবাদে পরিণত হয়। তাই বৌদ্ধদর্শনকে দুঃখবাদী দর্শন রূপে অভিহিত করতে হয়। কিন্তু এই আপত্তি যথার্থ নয়, যেহেতু বৌদ্ধমতে দুঃখ সার্বভৌম সত্য হলেও, অলঙ্ঘনীয় নয়। ইহজীবনেই সম্যক্ জীবনযাপন দ্বারা দুঃখ অতিক্রম করা যায়। দুঃখ ও দুঃখকে অতিক্রম করার উপায় দুই-এর সন্ধানই বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায়।[১২] অতএব বৌদ্ধদর্শনকে দুঃখবাদী দর্শনরূপে চিহ্নিত করা যায় না। বরং আর্যসত্য চতুষ্টয়ের প্রধান তাৎপর্য হ'ল মানুষকে দুঃখ, তার উৎপত্তি, নিবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে সচেতন করার ঐকান্তিক প্রয়াস।[১৩]

দ্বিতীয় আর্যসত্যে বলা হয় 'দুঃখ সমুদয়' বা 'দুঃখের কারণ আছে'। দ্বিতীয় আর্যসত্যটি দর্শনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তার কারণ বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন দার্শনিক তত্ত্বগুলি দ্বিতীয় আর্যসত্য নির্ভর।[১৪] বাহ্য ও অন্তর সর্বক্ষেত্রে কার্যকারণ নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ যে মতবাদের প্রতিষ্ঠা করেন তা প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব দ্বিতীয় আর্যসত্য থেকে অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। আত্মস্বরূপের উপলব্ধির জন্য আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ যে মত প্রতিষ্ঠা করেন তা এক আঙ্গিকে নৈরাত্মবাদ ও অপর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সংঘাতবাদ নামে পরিচিত যা প্রতিত্যসমুৎপাদতত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল।[১৫] এখন প্রশ্ন হ'ল কেন বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এই

তত্ত্বগুলি স্বীকার করেছেন? এগুলির স্বরূপই বা কী? সর্বোপরি মধ্যমপন্থা অবলম্বনে এই তত্ত্বগুলি স্বীকারের মাধ্যমে কিভাবে বৌদ্ধদর্শন সম্প্রদায় স্বতন্ত্রতা লাভ করেছে?

বৌদ্ধদর্শন স্বীকৃত সার্বভৌম ও সর্বব্যাপক কার্যকারণ বিধিই প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব নামে পরিচিত। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'প্রতীত্যসমুৎপাদ' মানে 'ধর্মের উৎপত্তি প্রতীত্য'[১৬] অর্থাৎ যে কোন ধর্মের উৎপত্তি, শর্তাধীন বা কারণের ওপর নির্ভর করে। এই মতবাদ স্পষ্ট করে যে সৃষ্টি সদাসর্বদা কারণনির্ভর অর্থাৎ সত্তা মাত্রেই কারণসাপেক্ষ। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বের স্বীকৃতির মধ্যদিয়ে কিভাবে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা হয়েছে তা আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে দুটি চরমপন্থী মতবাদের নিদর্শন পাওয়া যায়। যথা চার্বাক দর্শন সম্প্রদায় কার্যকারণ সম্বন্ধে বিশ্বাসী নন। চার্বাকরা স্বভাববাদ বা আকস্মিকতাবাদে বিশ্বাসী।[১৭] যার মূল বক্তব্য হ'ল কারণ ও কার্যের মধ্যে অনিবার্য বা আবশ্যিক সম্বন্ধ বলে বাস্তবে কিছু নেই। জগতের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যার জন্য চার্বাকগণ বস্তুর স্বভাব নিয়মের উল্লেখ করেন। পদার্থসমূহের প্রতিনিয়ত শক্তিই স্বভাবপদবাচ্য – 'স্বভাবঃ পদার্থানাং প্রতিনিয়তশক্তিঃ'[১৮] – এই স্বভাব থেকেই জগদ্‌বৈচিত্র্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সূচিত হয়। স্বভাব নিয়মেই জড়চৈতন্যময় এই জগদ্‌বৈচিত্র্যের উদ্ভব।[১৯] তর্ক সংগ্রহকার শান্তরক্ষিত স্বভাববাদীদের দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। একদল স্বভাবের কারণত্ব স্বীকার করেন, অপরদল তা করেন না। যাঁরা স্বভাবকে জগদ্‌বৈচিত্র্যের কারণ স্বীকার করেন, তাঁরাও বলেন যে – যদিও স্বভাব অন্যকার্যের হেতু বা কারণ, তথাপি স্বভাবে আর হেতুভাব নেই, অর্থাৎ স্বভাব কোন কারণ জন্য উৎপন্ন নয় – 'স্বতোভাবে হ্যহেতুত্বম্'।[২০] কার্যকারণ বিষয়ে যাঁরা যদৃচ্ছাবাদের সমর্থন করেন তাঁদের মতে কার্য কোন কারণের অপেক্ষা না করেই উৎপন্ন হয়, এমনকি স্বভাব নিয়মেরও অপেক্ষা করে না। কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান বিষয়ে স্বভাবাবাদীদের মধ্যে একদল স্বভাবের বা স্বভাবনিয়মের কারণতা স্বীকার করেন, আর স্বভাববাদীদের মধ্যে যাঁরা নির্হেতুবাদী তাঁরা এবং যদৃচ্ছাবাদীগণ এই স্বভাবনিয়মকেও অস্বীকার করে বলেন – জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় অহেতুক বা আকস্মিক।[২১]

ভারতীয় দর্শনে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিষয়ে অপর চরমপন্থী মতবাদ শাশ্বতবাদ নামে পরিচিত। যার মূল বক্তব্য হ'ল জগতের সমস্ত কিছুই শাশ্বত বা চিরস্থায়ী।[২২] বৌদ্ধদর্শনে এই মতকেও সমর্থন করা হয় না। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্বরূপ সার্বিক কার্যকারণনিয়ম স্বীকারের মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শনে আকস্মিকতাবাদ ও শাশ্বতবাদ এই উভয় চরমপন্থী মতবাদকেই অস্বীকার করা হয়।[২৩] কোন কার্যই অকারণ নয়। অতএব দুঃখরূপ কার্যও কারণসাপেক্ষ। সেই কারণের অনুসন্ধান পূর্বক তার নিবৃত্তি দ্বারাই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে – এটিই বৌদ্ধ দর্শনের মূল বার্তা।

প্রশ্ন হতে পারে এই সার্বিক কার্যকারণ নিয়মকে চালনা করার জন্য কি কোন চৈতন্য সত্ত্বা বা নিমিত্ত কারণের প্রয়োজন আছে? বৌদ্ধদর্শনে সার্বিক কার্য-কারণ নিয়মকে পরিচালনা করার জন্য কোন নিমিত্ত কারণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়নি। বৌদ্ধমতে যদি কারণকূট (কারণ সামগ্রী) উপস্থিত থাকে তাহলে স্বভাবতই কার্য উৎপন্ন হবে। কোন বস্তুকে কারণ তখনই বলা যাবে যখন তার মধ্যে কারণতৃ ধর্ম থাকবে। কতক ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় (যেমন ন্যায় দর্শন সম্প্রদায়) কার্যকারণবাদকে ব্যাখ্যা করতে নিমিত্ত কারণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে কার্যকারণ নিয়ম পরিচালনার জন্য কোন নিমিত্ত কারণ স্বীকৃত নয়।[২৪] এই যুক্তির দ্বারাই তাঁরা ঈশ্বরের অস্তিতৃকেও অস্বীকার করেছেন। এমনকি বৌদ্ধমতে জাগতিক দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের আরাধনার কোন প্রয়োজন নেই। বৌদ্ধ মতে অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনের সাহায্যে জীব আপন কর্মবলেই অবিদ্যার নাশের মাধ্যমে নির্বাণ লাভ করতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনের এই নাস্তিকতা একদিকে কর্মকে স্বয়ংক্রিয় নিয়মরূপে স্বীকৃতি দেয়, অপরদিকে ব্যক্তিকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রদান করে। কর্মনিয়ম নৈর্ব্যক্তিক ও অলঙ্ঘনীয়। এই নৈতিক নিয়ম আপন শক্তির প্রভাবেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সেই সক্রিয়তা দেবতা বা অন্য কোন সত্তার ওপর নির্ভরশীল নয়।[২৫] কর্মবাদের এইরূপ ব্যাখ্যার পরিণামে প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তগুলি হ'ল ব্যক্তি পরিপূর্ণভাবে একজন নৈতিক কর্তা, যিনি তাঁর বাক্য, চিন্তা ও ক্রিয়া সমস্ত কিছুর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এবং প্রতিটি ক্রিয়াই তার আপাতদৃশ্য ফলের অতিরিক্ত সম্ভাব্য শক্তি উৎপন্ন করে যা ভবিষ্যতে উপযুক্ত সময়ে ফলপ্রদান করে।[২৬] সুতরাং বৌদ্ধদর্শনে ব্যক্তিকে তার নিজের ভাগ্যের নিয়ন্ত্রা রূপে অতিরিক্ত মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে যা অন্যান্য ভারতীয় দর্শন অপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে।

আত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বৌদ্ধদর্শনে পুনরায় মধ্যমপন্থারই আশ্রয় নেওয়া হয়। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব থেকে অনিবার্যভাবে অনিত্যবাদ নিঃসৃত হয়। আবার অনিত্যবাদ তাঁদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ যা নৈরাত্ম্যবাদ নামে খ্যাত তার জনক। প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব অনুসারে জগতের সমস্ত কিছুই শর্তাধীন হওয়ায় কোন কিছু স্থায়ী নয়, অর্থাৎ জগতের সবকিছুই অস্থায়ী বা অনিত্য। পরিবর্তনই জাগতিক সত্য।[২৭] অতএব আত্মাও স্থায়ী বা স্থির নয়। সাধারণ অর্থে আত্মা বলতে 'চেতন দ্রব্য'কে বোঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে 'আত্মা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে 'স্থায়ী দ্রব্য' অর্থে ব্যবহার করা হয়। বৌদ্ধ অনাত্মবাদের মূল বক্তব্য হ'ল – বাহ্য জগতে স্থায়ী দ্রব্য (অর্থাৎ আত্মা) বলে কিছু নেই এবং মনোজগতেও স্থায়ী দ্রব্য (অর্থাৎ আত্মা) বলে কিছু নেই।[২৮] অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায় যে অর্থে আত্মার স্বরূপ স্বীকার করে বৌদ্ধদর্শনে সেই অর্থে আত্মা স্বীকার করা হয়নি বলেই তাদের আত্মা সম্পর্কিত মতবাদ বিশেষভাবে আলোচনার অপেক্ষা রাখে। আত্মার স্বরূপ সংক্রান্ত সমস্যাবলি দর্শনের যে

শাখায় বিবেচিত হয় তা আত্মতত্ত্ব নামে পরিচিত। প্রশ্ন হতে পারে আত্মতত্ত্বের আলোচনার যৌক্তিকতা কি আদৌ আছে? উত্তরে বলা যায় যে আত্মতত্ত্ব স্বীকৃতি ব্যতিরেকে দর্শন নিরর্থক বা অবান্তর হয়ে পড়ে। আত্মার মুক্তিই ভারতীয় দর্শনের লক্ষ্য। আত্মার অবিদ্যার জন্যই জীব জগতের দুঃখ ভোগ করে, সুতরাং দুঃখকে অতিক্রম করতে হলে আত্মার স্বরূপ জানা অত্যাবশ্যক। সেইকারণেই আস্তিক ও নাস্তিক নির্বিশেষ সমস্ত ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ই আত্মতত্ত্ব স্বীকার করেছেন।

আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনে দুই পরস্পর বিপরীতমুখী চরমপন্থী মতবাদ প্রসিদ্ধ। অদ্বৈতবাদী পরস্পর বিরুদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক সম্প্রদায়ের মতে, দেহই সর্বস্ব; দেহের অতিরিক্ত কিছু নেই; সুতরাং দেহাবসানে পরলোকে যাবার জন্যও কিছু থাকে না। জড়বাদী দর্শন সম্প্রদায় চার্বাকগণ এই মত পোষণ করেন।[২৯] অন্য বিপরীতমুখী চরমপন্থী দর্শন সম্প্রদায়ের মতে, আত্মাই সর্বস্ব; দেহের অবসান ঘটলেও আত্মার বিনাশ হয় না; সে পরলোকে গমন করে। ছান্দোগ্যোপনিষদে বলা হয়েছে চৈতন্যই সত্য বস্তু, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্';[৩০] দেহ তার অধ্যাস মাত্র। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম, শুক্তিকায় যেমন রজতভ্রম হয়, তেমনি চৈতন্যে দেহের ভ্রম হয় মাত্র। সুতরাং দেহের বিনাশ হলেও চৈতন্যময় আত্মার বিনাশ হয় না; আত্মা – অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য, নিত্য, সর্বগত, স্থানু, অচল ও সনাতন।[৩১] অদ্বৈত বেদান্ত মতে আত্মা শুদ্ধ চৈতন্য, নিত্য, সচ্চিদানন্দস্বরূপ। চিৎ অংশে জীব ও পরমব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ নেই। ছান্দোগ্যোপনিষদে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম ও জীবের তাদাত্ম্য প্রতিপাদিত হয়।[৩২] অদ্বৈত বেদান্ত মতে জীবাত্মা ও ব্রহ্মাত্মা চৈতন্য অংশে অভিন্ন যা নিত্য ও অবিনাশী। এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের মতকে লক্ষ্য করেই কঠোপনিষদে ঋষি নচিকেতা বলেছেন – "যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে,"[৩৩] – অর্থাৎ কেউ বলেন মানুষ মারা গেলেও আত্মার অস্তিত্ব থাকে; আবার কেউবা বলেন দেহাতিরিক্ত আত্মা বলে কিছু নেই- দেহই আত্মা। এই সংশয় প্রসিদ্ধ।

জড়বাদী চার্বাকদের মতে চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা।[৩৪] মানুষের দেহ ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ- এই চারটি ভূত পদার্থের সংযোগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই চারটি ভূতপদার্থে পৃথকভাবে কোনটিতেই চৈতন্য প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এই ভূতপদার্থ সমূহের সংমিশ্রণে দেহে চৈতন্যগুণের আবির্ভাব হয়। যেমন চুন কিংবা খয়ের কোনটিই পৃথকভাবে লাল না হলেও দুটিকে মেশালে লালবর্ণের উৎপত্তি হয়। ঠিক সেইরকম ভূতচতুষ্টয়ের স্বভাববশতঃ সংমিশ্রণ হলে তাতে চৈতন্য গুণের আবির্ভাব হয়। আত্মা চৈতন্য বিশিষ্ট দেহ ভিন্ন কিছু নয়। চার্বাকদের আত্মা সম্পর্কিত এই মতবাদ দেহাত্মবাদ নামে

১৫. তদেব
১৬. ধর্ম – বৌদ্ধ দর্শনে 'ধর্ম', 'পদার্থ', 'দ্রব্য', 'বস্তু', 'কার্য' প্রভৃতি একই অর্থের বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।
১৭. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮২, পৃঃ ১১১
১৮. তদেব, পৃঃ ১১২
১৯. তদেব
২০. তদেব
২১. তদেব, পৃঃ ১১৩
২২. এম্. হিরিয়ানা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩০
২৩. তদেব, পৃঃ ১৪৪
২৪. তদেব, পৃঃ ১৪২
২৫. মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৮ পৃঃ ২৮০
২৬. তদেব, পৃঃ ২৮১
২৭. এম্. হিরিয়ানা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৪৬
২৮. তদেব, পৃঃ ১৪৫
২৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮২, পৃঃ ১২৩
৩০. ছান্দোগ্যোপনিষদ্ , ৬ / ২ / ১
৩১. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮২, পৃঃ ১২৩
৩২. ছান্দোগ্যোপনিষদ্ , ৬ / ৮ / ৭
৩৩. কঠোপনিষদ ১ / ১ / ২০
৩৪. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮২, পৃঃ ১২৪.
৩৫. তদেব
৩৬. এম্. হিরিয়ানা, ১৯৯৩, পৃঃ ১৩৯
৩৭. তদেব
৩৮. তদেব
৩৯. তদেব
৪০. তদেব, পৃঃ ১৪৬
৪১. তদেব, পৃঃ ১৩৯
৪২. মধুমিতা চট্টোপাধ্যায়, ১৯৯৮ পৃঃ ২৬৬
৪৩. অঙ্গুত্তরনিকায় ৩ – ৬৫ – ১৪, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮২, প্রিঃ ১৭০

৪৪. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, ১৯৮২, পৃঃ ১৭০

গ্রন্থপঞ্জী

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, ১ম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, সপ্তম সংস্করণ, ৩৬তম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : ২০১২। (৩৩)

উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী, স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত, ২য় ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, পঞ্চম সংস্করণ, ২০তম পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা : ২০১৩। (৪, ৫, ৩০, ৩২)

গার্ড, রিচার্ড এ. সম্পাদিত, বুদ্ধিজম্, প্রেনটিস্ হল ইন্টারন্যাশানাল, লণ্ডন : ১৯৬১, জর্জ ব্রাজিলার ইঙ্ক, নিউ ইয়র্ক : ১৯৬১।

চট্টোপাধ্যায়, উমা 'পুরুষার্থ : একটি সমীক্ষা', ইন্দ্রাণী সান্যাল ও রত্না দত্ত শর্মা সম্পাদিত, ধর্মনীতি ও শ্রুতি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগে মহাবোধি বুক এজেন্সী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : ২০০৯। (৬)

চট্টোপাধ্যায়, তারা, 'পরম পুরুষার্থ মোক্ষ', অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাদিত, ভারতীয় ধর্মনীতি, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : ১৯৯৮। (১, ৭)

চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, 'বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র', অমিতা চ্যাটার্জী সম্পাদিত, ভারতীয় ধর্মনীতি, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড সহযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : ১৯৯৮। (৮, ৯, ১৩, ২৫, ২৬, ৪২)

ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, বেদান্তপরিভাষা, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল অনুদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা : ২০০৪।

ভট্টাচার্য্য, করুণা, ন্যায়-বৈদেষিক দর্শন (পদার্থ তত্ত্ব), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ্, কলকাতা : ১৯৮৪।

ম্যাক্‌গভার্ন, উইলিয়াম মন্টগোমেরী, এ ম্যানুয়াল অফ্ বুদ্ধিস্ট্ ফিলসফি, নাগ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, লণ্ডন : ১৮৭২, পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী : ১৯৭৯।

রাইজ্ ডেভিডস্, টি.ডবলিউ, দি হিস্ট্রী এ্যাণ্ড লিটারেচর অফ্ বুদ্ধিজ্ম্, সুশীল গুপ্তা (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা : ১৯৫২। (১২)

রাধাকৃষ্ণণ, এস., ইণ্ডিয়াল ফলসফি, খণ্ড I এবং II , দি ম্যাক্‌মিলান কোম্পানী, নিউ ইয়র্ক : ১৯২৩, জর্জ অ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন লিমিটেড, লণ্ডন : ১৯২৩, সপ্তম পুনর্মুদ্রণ, ১৯৬২।

রাধাকৃষ্ণণ, এস., ইষ্ট এ্যাণ্ড ওয়েস্ট রিলিজিয়ন, নীরদচন্দ্র চক্রবর্তী অনুদিত, ধর্মে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা : ১৩৭৪। (২, ৩)

শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, চার্বাক দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্যদ্, প্রথম পর্ষদ্ সংস্করণ, কলকাতা : ১৯৮২। (১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৪৩, ৪৪)

হিরিয়ানা, এম্, আউটলাইন্স্ অফ্ ইণ্ডিয়ান ফিলসফি, মোতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স প্রাইভেট্ লিমিটেড, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, দিল্লী : ১৯৯৩, পুনর্মুদ্রণ, ২00৫। (১০, ১১, ১৪, ১৫, ২২, ২৩, ২৪, ২৭, ২৮, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১)

....

বৌদ্ধদর্শনে শ্রদ্ধাবাদ

ড. স্বপ্না বসু

হিমালয়ের পাদদেশে নেপালের দক্ষিণভাগে কোশলরাজ্যের অধীনে একটি ছোট্ট জনপদ কপিলাবস্তু। হিমগিরির শৃঙ্গ যেখানে অনন্ত আকাশে মিশেছে, একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী রোহিণী ঐ শৃঙ্গেরই পাদদেশ বিধৌত করে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে, সেখানে সত্যসুন্দর প্রেম যেন অপরিমিতভাবে অপক্ষপাতে জগতের উর্ধ্বে নিম্নে চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়েছে। পৃথিবীর অমলিন স্থল এটি। এখানে প্রাচীনকাল থেকেই শাক্যবংশীয় কৃষিজীবী গোষ্ঠীর বাস। রাজা শুদ্ধোদন তাদের দলনেতা। রাজ্যটি শস্যসমৃদ্ধ। শান্তি সেখানে বিরাজ করত, আনন্দোৎসব সবই ছিল। এরকমই স্নিগ্ধ পরিবেশে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন লুম্বিনী উদ্যানের শালবৃক্ষের তলে পূর্ণ প্রজ্ঞার মহৎ প্রকাশ হ'ল। ক্রন্দনময়ী ধরণী জ্ঞানসূর্য্যের উদয়ে উজ্জ্বল হ'ল –

"চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ তুমি অমৃতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালসবায়ু
হোক প্রাণবান।" – বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শাক্যবংশীয়রা সূর্যবংশীয় আর্য। বুদ্ধদেবের দেহের অপূর্ব সুধাকান্তির সঙ্গে ছিল রাজোচিত লক্ষণ। কিন্তু শিশুকে দেখেই ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি কালদেব জানতে পারলেন 'এ শিশু নিশ্চয়ই বুদ্ধ হইবে।' - বোধের জাগরণ অবস্থাই বুদ্ধ (Enlightened)। শিশুর দিব্যকান্তি দিনদিন পরিবর্ধিত হতে থাকল। মহাসমারোহে নামকরণ হ'ল সিদ্ধার্থ – তপস্যায় 'সিদ্ধ – অর্থ নিশ্চিত' 'নিত্য' 'যথার্থ'। এই অনন্ত পৃথিবীর সকল জীব তাঁর কাছে নিত্য নিশ্চিত আশ্রয় পেয়েছিল। সিদ্ধার্থের বুদ্ধ হওয়ার বীজ নিহিত ছিল তাঁর বাল্য, কৈশোর এবং কুমারজীবনের কিছু বৃত্তান্তে – যেমন শরাঘাতে যন্ত্রণাকাতর মরালের অধিকারী প্রাণরক্ষক সিদ্ধার্থ প্রাণঘাতক দেবদত্ত নয় – একথা বালক সিদ্ধার্থের বুঝিয়ে দেওয়া। রোহিণী নদীর জলবণ্টন নিয়ে শাক্য ও কোলীয়দের বিবাদ মীমাংসা – জীবনের মূল্য যুদ্ধের থেকে বড়, অতএব যুদ্ধ নয় জলের সুসম বণ্টন করে চাষের কাজে মনোনিবেশ প্রয়োজন – কুমারের একথা বুঝিয়ে দেওয়া, বৃক্ষতলে উপবেশনকালে হলকর্ষণ দেখে ক্ষুদ্রতম কীটেরও প্রাণহনন নয় – এই ব্যথা উপলব্ধি করা – সবই তাঁর জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাকেই ব্যক্ত করে। নগরের কৃত্রিম সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে না। রাজসংসারে তাঁর মন নেই, ভোগবিলাসে তাঁর প্রবৃত্তি নেই, বিজন কান্তারের বৃক্ষের কৃষ্ণছায়া তাঁর পছন্দ। তিনি সংসার থেকে ক্রমেই বিচ্ছিন্ন

হয়ে পড়েছিলেন। এইসময়ই চারটি সামান্য দৃশ্য তাঁকে গৃহত্যাগী করেছিল। একটি বার্দ্ধক্যভারে পীড়িত এক বৃদ্ধ – ক্ষীণেন্দ্রিয়, বলবীর্য্যহীন জরাক্রান্ত ঐ বৃদ্ধ তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিল জরা প্রত্যেক জীবের যৌবনকান্তি হরণ করে। তারপর এক ব্যাধিক্লিষ্ট মানুষ – তিনি বুঝলেন ব্যাধি মানুষকে ভীত, অসহায় করে, তৃতীয় দৃশ্যটি একটি মৃতব্যক্তির অন্তিম যাত্রা – তিনি বুঝলেন মৃত্যু জীবনকে অনিত্য করেছে। শেষে কাষায় বস্ত্র পরিহিত বিনয় নম্রতার আধার এক দীপ্ত ভিক্ষু – যিনি সংসারের সকল বাসনা পরিত্যাগ করে শুদ্ধতার রূপ পরিগ্রহ করেছেন – এই মহান জীবনের প্রতি তিনি শ্রদ্ধাবান হলেন। তিনি ভাবলেন জাগতিক অনিত্যতার মধ্যে নিশ্চয়ই নিত্য কিছু আছে যা প্রাপ্ত হলে শান্তিলাভ করা যায়। দুঃখের নির্ব্বাণ হয়। জীবনকে উৎসর্গ না করলে সেই মহাজীবন পাওয়া যাবে না। তার জন্য প্রয়োজন মনকে শাসন। তিনি হলেন মানুষের মনের শাসক।

বৈদিকযুগের যাগযজ্ঞের কর্মমার্গ বিধিনিষেধের ভারে যখন জর্জরিত, উচ্চনীচের তীব্র ভেদাভেদে মনুষ্যত্ব যখন অপমানিত, অহংকারী ব্রাহ্মণদের দুর্ভেদ্য শৃঙ্খলে সমাজ যখন নিপীড়িত, ঠিক তখনই সমাজ এক অপূর্ব মৈত্রীভাবনার (মেত্তিভাবনা) বাণী শুনল। অবক্ষয়প্রাপ্ত বৈদিক যুগে এ এক অপূর্ব দর্শন, যে দর্শনে মানুষই শ্রেষ্ঠ, যার কর্মক্ষেত্র মানবহৃদয় –

> "নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহশ্রুতিজাতং
> সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতং
> কেশবধৃত বুদ্ধ শরীর –
> জয়জগদীশ হরে।" গীতগোবিন্দ – দশাবতার স্তোত্র ৯

কবি জয়দেব যদিও বুদ্ধকে অবতাররূপে কল্পনা করেছেন আমরা তাঁকে অবতাররূপে না দেখে যদি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবরূপে দেখি তবেই তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন হবে। এই পৃথিবীতে তিনি এসেছিলেন, পুত্রের পিতা হয়েছিলেন, তিনি অসুস্থ হয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু হয়েছিল, তাঁর নশ্বর দেহ দাহ হয়েছিল। মহান এই ভিক্ষু মানুষের দুঃখ নিবৃত্তি করেছিলেন, চেয়েছিলেন সকলের অহংকার ভিক্ষা, বিস্তার করেছিলেন প্রেমপদ্মের সৌরভ। তাঁর জীবপ্রীতি জীবশ্রদ্ধাই 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' এই তত্ত্বের জন্ম দেয়।

'শ্রদ্ধা' ভারতীয় সর্বদর্শনের মূল ভাবনা। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে –

> 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্'। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্ ,
> শ্রিয়া দেয়ম্ হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্ । ১।১১।৩

যেদানে অহংকার নেই, অশ্রদ্ধা নেই, অকল্যাণ নেই – এই দানই প্রকৃত দান। "শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব। যেখানে এই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নেই সেখানে আদান

প্রদানের সম্পর্ক কলুষিত হয়ে ওঠে" – (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। শ্রদ্ধা শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শ্রী + ভতি - শ্রত্ + ধা + অঙ্ + স্ত্রী টাপ্ যার অর্থ বুদ্ধি, আদর, শুদ্ধি ও বিশ্বাসের সমন্বয়। (A Trilingual Dictionary – G. Mukherjee and G. Bhattacharya) বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ (4th Century A.C.) শ্রদ্ধার তিনটি অর্থে গুরুত্ব আরোপ করেছেন –

১) কোনও বিষয়ের আস্তিক্য সম্বন্ধে দৃঢ় এবং পূর্ণ বিশ্বাস (Full and firm conviction that the thing is)

২) বিশেষগুণাবলী যা শুদ্ধ আনন্দদায়ক (Good qualities and serene joy)

৩) প্রবল ইচ্ছাশক্তি (aspiration) – যে ইচ্ছাশক্তি বলে মহাভারতের পিতামহ ভীষ্ম আপন মৃত্যুকাল স্বায়ত্তে এনেছিলেন। যে দুর্জ্জয় ইচ্ছাশক্তিতে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। 'শ্রদ্ধাবল' (power) পঞ্চবলের প্রথমটি যাকে বৌদ্ধদর্শনে 'বিশ্বাসবল' বলে। বাকি চারটি – উৎসাহ, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় (Five faculties) এর একটি শ্রদ্ধাবোধাঙ্গ (Seven limbs of Enlightenment) বৌদ্ধ দর্শনের এই ভাবনা শ্রীমদ্‌ভাগবদ্‌গীতার জ্ঞানযোগের 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্' – (৩৯ – চতুর্থোঽধ্যায়) উপদেশটিরই দ্যোতনা।

এই শক্তি মনকে একাগ্র করে, যথার্থ বুদ্ধির অধিকারী করে, সন্দিগ্ধতা চঞ্চলতা, ইন্দ্রিয়জ কামনা থেকে সরিয়ে এনে মনকে শুদ্ধ করে। শ্রদ্ধারূপে আত্মশুদ্ধি ছাড়া ধর্মাচরণ করা যায় না। পালিভাষায় শব্দটি শদ্ধা – একে 'শদ্ধাধন' বলা হয়েছে। সংস্কৃত শব্দ 'শ্রদ্ধা' – এটি মানুষের মনে সুপ্ত অবস্থায় থাকে (dormant) একে অনুশীলন করে লাভ করতে হয় – (cultivate)। বুদ্ধ – এই 'শ্রদ্ধা'র অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি বৈশালী নগরের বারাঙ্গনা অম্বপালির শ্রদ্ধার নিমন্ত্রণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করেন, ঐ নগরের কোনও এক গ্রামে চণ্ডপ্রদত্ত অন্ন, পিষ্টক ও শুষ্ক শূকরের মাংস গ্রহণ করেন অন্য ভিক্ষুদের না দিয়ে নিজে ভক্ষণ করে চণ্ডের সুকৃতি সঞ্চিত করেন। অনশন ভঙ্গ করে মধ্যপন্থা (মজ্ঝিম্ পন্থা) নিয়ে সুজাতার পরমান্ন শ্রদ্ধায় আহার করে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। এরকমই ছিল তাঁর অকলুষ শ্রদ্ধাভাবনা। মানবতাকে রক্ষা করতে হলে মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে – তাঁর এই ভাবনাই নানা জাতি, নানা ধর্ম, ধনী, নির্ধন, পাপী পুণ্যবান, নরনারী সকলকে মিলিয়ে দিয়ে মানুষের মাঝে ভৌগোলিক সীমা ভেঙ্গে দিয়ে গিরি সমুদ্র অতিক্রম করে অমেয় মৈত্রী ভাবনায় (মেত্তিভাবনা) পর্যবসিত হয়। ব্যক্তিভাবনা (Individuality) থেকে বেরিয়ে আসাই মৈত্রীভাবনা। 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' – এই ভাবনা। 'সব্বেসুখিতো হোন্তু' – বুদ্ধের

এই বাণীই 'নাল্পে সুখম্ ভূমৈব সুখম্ - ছান্দোগ্যোপনিষদের মন্ত্রকেই দ্যোতিত করে। এই শ্রদ্ধাভাবনাই চণ্ডাশোককে ধর্মাশোকে পরিণত করে, দস্যু অঙ্গুমালকে সাধু করে, পিতৃহন্তা অজাতশত্রুকে বুদ্ধচরণে সমর্পণ করিয়ে শান্তি দেয়। নৃপতি বিম্বিসার, বিম্বিসার পত্নী ক্ষেমা, কোটিপতিমহিলা উপালী, বণিকশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডদ, কোশলাধিপতি প্রসেনজিৎ, বৈদ্যরাজ জীবক সকলেই তাঁর শ্রদ্ধাভাবনায় আপ্লুত হয়ে বুদ্ধচরণে আশ্রয় নেন।

বোধিসত্ত্ব হলেন মানুষের শিক্ষক (সাত্তা), তিনি সাধারণ মানুষের বোধগম্য পালিভাষায় তাঁর নীতি শিক্ষা দেন। তিনি বলেছেন – 'বিশ্বাস আমার বীজ, মানব হৃদয় আমার ক্ষেত্র, সৎকার্যরূপ বৃষ্টিজল সেক্ষেত্র উর্ব্বর করে, জ্ঞান আমার হল, বিনয় তাহার ফসল, এবং মন তাহার পরিচালক সূত্র। আমি ধর্ম্মরূপ লাঙ্গল মুষ্টি ধরিয়া আছি, উৎসাহ ও উদ্যম আমার তাড়ন দণ্ড এবং কর্ম্মিষ্ঠতা আমার বলদ। এইরূপে মোহরূপ কণ্টক বিনষ্ট হয়ে আমার কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়' – (সার কুমার স্বামী প্রণীত সূত্রনিপাতের ভরদ্বাজসূত্রের অনুবাদ)। তিনি বলেছেন মিথ্যাদৃষ্টি দিয়ে সত্যকে যাচাই নয়। যেমনভাবে স্বর্ণকে অগ্নিতে পুড়িয়ে পরীক্ষা করা হয় তেমনভাবে তাঁকে শিষ্যগণ যাচাই করে নিক। এরজন্য প্রয়োজন সম্যক্ দৃষ্টি (Right view), সম্যক্ সংকল্প (Right thought), সম্যক্ বাক্ (Right speech), সম্যক্ সদ্ব্যবহার (Right conduct), সম্যক্ উপজীবিকা আহরণ (Right livelihood), সম্যক্ ব্যায়াম (Right effort), সম্যক্ স্মৃতি (Right mindfulness), সম্যক্ সমাধি (Right meditation) – অষ্টাঙ্গিকমার্গ অনুসরণ। তিনি হলেন 'অনুপম বৈদ্যরাজ' দুঃখপীড়িত মানবের নির্ব্বাণ তার লক্ষ্য। তৃষ্ণা হ'ল ব্যাধি পঞ্চশীল সেবন ঐ ব্যাধির ওষধি। শীলগুলি মানুষকে সাধু করে। এগুলি হ'ল – প্রাণী হত্যা নয় (পাণং ন হানে) মিথ্যা ভাষণ নয় (মুসা ন ভাসে) যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ নয় (চা দিন্ন মাদিয়ে) চিত্তশুদ্ধি রক্ষার্থে মাদকদ্রব্য সেবন নয় (ন চ মজ্জপোসিয়া), ব্রহ্মচারিয়ঞ্চমঙ্গলমুত্তম্ (কামেচ্ছাকে দমন) (goodness is above all) শীল সেবন করলেই মানুষের আত্মশুদ্ধি হবে। মানুষের প্রতি তাঁর ছিল এরকমই বিশ্বাস। তিনি বলেছেন – 'অওনো অওনো নাথ অওনো অওনো গতি' – মানুষই মানুষের প্রভু মানুষই মানুষের গতি'। সংসারী মানুষকে সংসারে শ্রদ্ধাবান হয়ে স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করতে হবে, মাতাপিতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, বন্ধুত্বে শ্রদ্ধা থাকবে, প্রভু-ভৃত্যকে ক্ষমতানুযায়ী কার্য দেবে, ন্যায্য বেতন দেবে ভৃত্যের প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করে শিল্পশিক্ষা লাভ করে বিনয়ী হয়ে সুশিক্ষিত হওয়ার কথাও তিনি বলেছেন – তাঁর এইসব নীতি মানবসমাজকে কল্যাণের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্যই। এতে জীবকুল নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাবে। অক্রোধে ক্ষমায় জীবকুল রক্ষা পাবে।

বৌদ্ধদর্শনে শ্রদ্ধা ভাবনা সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত। স্বামী বিবেকানন্দ এই জীবশ্রদ্ধারই

পূজারী ছিলেন। ১৮৯৯ সালে মার্চে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্বোধন পত্রিকায় বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বলেছেন – "Buddhism has shaken the throne of all oblation eating gods and brought them down from their throne". বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তথাগতের শ্রদ্ধাভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর রচিত নাটক – 'বিসর্জন', 'নটীর পূজা', 'রাজা', 'মালিনী' প্রভৃতিতে বুদ্ধ অবদান শতকের কবিতাবলী বৌদ্ধদর্শনের শ্রদ্ধা, প্রেম, মৈত্রী ভাবনাকেই প্রকাশ করেছে। তৃষিত শ্রান্ত, তাপিত বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ চণ্ডালিকার শ্রদ্ধাদানপূর্বক জলকে তীর্থবারি মনে করে জলপান করে তৃপ্ত হয়েছেন – 'যে মানব আমি সেই মানব তুমি কন্যা' – (চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) 'বোধিসত্ত্ব'-এর ভাবনা লৌকিক জগৎ নিয়ে। এর বাইরে কিছু নেই। একসময় ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র এই ধর্ম বিস্তারিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর এর প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে। তার কারণ বৌদ্ধভিক্ষুদের নীতিবহির্ভূত কাজকর্ম, হিন্দুধর্মের কর্মফলবাদ, পাপপুণ্যের ব্যাখ্যা বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করা, সহজিয়া সম্প্রদায় নামে এক গোষ্ঠীর উদয়ে জ্ঞান উন্মেষের পথে না গিয়ে যোগসাধনাকে প্রাধান্য দেওয়া, শৈবধর্মের উত্থান এবং কিছু হিন্দুদের বৌদ্ধবিরোধী মনোভাব। আজও খণ্ডিত মানবতার প্রকাশ আমরা দেখি। সেসবই স্বার্থপর কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থচিন্তার ফল। এরা সত্যকে জানতে চায়না।

"যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।

সর্বভূতেষু চাত্মানং ততোন বিজুগুপ্সতে।। - ঈশোপোনিষদ - ৬

অখণ্ড আনন্দানুভবের এই বাণী আজও নীরবে কাঁদে। তবুও বলা যায় সেদিনের সেই বোধিদ্রুমতলে যে প্রজ্ঞার আলোর স্পর্শ ভারতবাসী পেয়েছিল সেই আলোই বর্তমান পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা হয়ে অজ্ঞান অন্ধকারকে দূর করবে। যে ত্রিশরণ মন্ত্র মানবহৃদয়তন্ত্রীতে সেদিন রণিত হয়েছিল আজও তা ধ্বনিত হোক –

'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।'

ওঁ মণিপদ্মে হুম্!
ওঁ মণিপদ্মে হুম্!
ওঁ মণিপদ্মে হুম্!

গ্রন্থপঞ্জী

১। ইতিহাসের আলোয় গৌতমবুদ্ধ – সাধনকমল চৌধুরী, প্রকাশক – শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

২। ঈশোপনিষৎ - ছান্দোগ্যোপনিষৎ, তৈত্তীরীয় উপনিষৎ - গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর।

৩। গীতগোবিন্দম্ - কবি জয়দেব।

৪। বুদ্ধদেব – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর – বিশ্বভারতী 'চণ্ডালিকা' – সঞ্চয়িতা – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৫। 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম' – স্বামী বিবেকানন্দ – উদ্বোধন পত্রিকা ১৯৯৯

৬। বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ – কৃষ্ণকুমার মিত্র, করুণা প্রকাশনী।

৭। ভারতীয় দর্শন – দীপককুমার বাগচী – নারায়ণ প্রিন্টিং

৮। A Trilingual Dictionary – গোবিন্দগোপাল মুখার্জী এবং গোপীমোহন ভট্টাচার্য্য SANSKRIT COLLEGE 1966

৯। 'SAMBHASA' - Mohabodhi Centenary Commemorative volume: 1 - 1991

১০। Buddhacharita – E.H. Johnston, অশ্বঘোষকৃত মূল ও ইংরেজী অনুবাদ, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় – ১৯৩৫.

…………..

প্রাচীন ভারতীয় বৌদ্ধ শিক্ষাদর্শন

সঙ্ঘমিত্রা কর্মকার

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষদের মাধ্যমে। প্রাক্-বৈদিক যুগের শিক্ষা সম্পর্কে তেমনভাবে জানা যায় না তথ্যের অভাবে। ভাষার জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চার দিক থেকে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে সংস্কৃত ভাষার চর্চাই লক্ষ করা যায়। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে বৌদ্ধ সংঘ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকেন্দ্রগুলি ছোট বড় শিক্ষায়তন রূপে গড়ে উঠেছিল। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা নীহাররঞ্জন রায়-এর তথ্য অনুযায়ী সপ্তম শতকে য়ুয়ান চোয়াঙ বঙ্গদেশ ভ্রমণে এসে পুণ্ড্রবর্ধন, কামরূপ, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি অঞ্চলের বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাদীক্ষার প্রসারতার বর্ণনা করেছেন। এই অঞ্চলের জনপদের লোকদের জ্ঞানস্পৃহা ও জ্ঞানচর্চার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সময়কে 'হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ' বলে বর্ণনা করেছেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাল।

সমসাময়িক চৈনিক পরিব্রাজকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় বৌদ্ধ বিহার সংঘগুলি ছিল বৌদ্ধ জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র। এই কেন্দ্র গুলিতে শুধু বৌদ্ধধর্মের চর্চা ও বৌদ্ধ শাস্ত্রই পাঠ হত তা নয়। ব্যাকরণ, শব্দবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, চতুর্বেদ, সাংখ্য, সংগীত ও চিত্রকলা, মহামানশাস্ত্র, যোগশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিভিন্ন দিক বৌদ্ধ শ্রমণদের অধিতব্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানের নানাদিক সম্বন্ধে অনুশীলনের তথ্য সপ্তম শতকে পাওয়া যায় যা যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছিল। মূলত পালবংশ ও পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বাংলাদেশে সংস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চা উৎসাহের সঙ্গে শুরু হয়েছিল। তবে পাল-চন্দ্রপর্বে বাংলাদেশের গৌরব ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যতটা তার তুলনায় বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য সংস্কৃতিতে তার তুলনায় অনেক বেশি সাফল্য লাভ করেছিল। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা বিভিন্ন পন্থী হওয়ায় সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত হত বহুগ্রন্থ। বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের উদ্দেশ্য ছিল তাঁদের ধর্মের তত্ত্বকথা লোকায়ত ভাষায় জনসাধারণের চিত্তে পৌঁছে দেওয়া। এরপর পাল যুগের উদার হাওয়ায় ব্রাহ্মণ দেবতাদের সঙ্গে বৌদ্ধ দেবতারাও ঠাঁই করে নিয়েছে লোকসমাজে।

অষ্টম শতকে পালরাজাদের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসারের রূপ ধরা পড়ে। বৌদ্ধ ধর্মের উৎকর্ষতার জন্য ইতিহাসে এই সময়কাল সুবর্ণযুগ নামে পরিচিত। বাংলা ও

বিহারকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধর্ম উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেতে থাকে। বাংলাদেশে প্রচুর বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল সেখানে প্রচুর ভিক্ষুশ্রমণ বাস করত বিভিন্ন গোষ্ঠীর। সপ্তম শতকে এই বিহারগুলি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৌদ্ধশিক্ষা হত সংঘবদ্ধভাবে। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে সমাজের নিচুশ্রেণির মানুষ বৌদ্ধশিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। লক্ষণীয় এই যে, এই পর্বের জ্ঞানবিজ্ঞান সাধনা ছিল একান্তভাবেই শিক্ষিত উচ্চ বর্ণস্তরে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষায় দ্বিজবর্ণ ও উচ্চতর বর্ণস্তরের শিক্ষার্থী ছাড়া এ সুযোগ সাধারণের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ছিল একক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক। গুরুগৃহে গিয়ে শিক্ষালাভ হত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিল ক্রিয়া-কাণ্ড, যাগ যজ্ঞাদি, বর্ণভেদ, বিভিন্ন সংস্কারে মানুষ জর্জরিত হয়ে বিকল্প হিসেবে বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব ত্বরান্বিত করেছিল। এর ফলে অবহেলিত নিচুশ্রেণির মানুষরা এই ধর্মে ধর্মান্তরিত ও সবরকম শিক্ষা-সংস্কৃতিতে সুযোগ লাভ করেছিল। যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সন্ন্যাস নিতেন তাঁদের মঠ, বিহার-এ থেকে শিক্ষা নিতে হত। এই বিহারগুলিতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি বিদেশ থেকেও প্রচুরছাত্র অধ্যয়ন করতে আসত। ভিক্ষুশ্রমণদের জীবনযাত্রা ছিল যথেষ্ট উন্নত। পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত ওদন্তপুরী, সোমপুরী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল প্রভৃতি বিহারগুলি ধর্ম, দর্শন ও বিদ্যাচর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বোধিভদ্র। শন্তরক্ষিত, ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, শান্তিগর্ভ, পদ্মসম্ভব, কমলশীল এবং অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

বৌদ্ধ শিক্ষার মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য ছিল জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি বা পরিনির্বাণ লাভ করা। অজ্ঞতা দূর হলে মানুষের দুঃখ দূর হবে এবং তবেই সে নির্বাণলাভ করতে পারবে। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ শাস্ত্রে অষ্টাঙ্গিক মার্গ-এর কথা বলা হয়েছে। এই নীতি শিক্ষার ফলে চিত্তের উৎকর্ষতা ও পরমজ্ঞান লাভ হয় ফলে জন্মমৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি ঘটে। এই শিক্ষা মানুষকে নীতি-পরায়ণ হতে শেখায় এবং যেকোনো অসৎ ও অন্যায় আচরণ থেকে দূরে থাকাই এই শিক্ষার উদ্দেশ্য।

বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে তাদের সৎ জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করা। এই নীতি অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেওয়া বৌদ্ধ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। বৌদ্ধশিক্ষা সংঘের নিয়ম আয়ত্ত ও অভ্যস্থ করে মনের অজ্ঞতা দূর করতে শেখায়। প্রধান শিক্ষণীয় গ্রন্থ ছিল ত্রিপিটক। ত্রিপিটককে তিনটি অংশে ভাগ করা হয় যথা – ১) সূত্রপিটক ২) বিনয়পিটক ৩) অভিধর্মপিটক। প্রথমটিতে গৌতমবুদ্ধের উপদেশ ও বাণী, দ্বিতীয়টিতে বৌদ্ধ শ্রমণ, ভিক্ষু, ভিক্ষুণীদের পালনীয় কর্তব্য এবং তৃতীয়টিতে আছে বৌদ্ধদর্শন ও তত্ত্বের পর্যালোচনা। আচার্য ত্রিপিটক থেকে সময়ের উপযোগী শিক্ষণীয় বিষয়

পাঠ করতেন এবং ব্যাখ্যা করতেন যা পরবর্তীকালে মহাযান মতাবলম্বীদের দ্বারা লোকায়ত শিক্ষা বিস্তার লাভ করে। এরপর বৃত্তিমূলক শিক্ষা, শিল্প, ভাস্কর্য, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি পাঠ্য তালিকায় স্থান লাভ করে। এছাড়া বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গুলিতে হিন্দু ও জৈনদর্শন, বেদ্-বেদান্ত, উপনিষদ, সাংখ্য ব্যাকরণ, তর্কবিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি পাঠক্রমে স্থান লাভ করে। বৌদ্ধ-শিক্ষায় শিক্ষাদান করা হত মাতৃভাষার মাধ্যমে। তবে সংস্কৃত, পালি, আঞ্চলিক যে কোনো ভাষাতেই ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত।

বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষাদান পদ্ধতি ছিল মূলত মৌখিক। শিষ্যরা ধর্মকথা শুনে শুনে শিখত। শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল গল্পের ছলে বাস্তবের দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষাদান। এর জন্য আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্কসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকত। তবে বৌদ্ধযুগে লিপির প্রচলন ছিল কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার হত কম। মুখস্থ করা ও আবৃত্তি করা এই দুটিই ছিল শিক্ষার প্রধান উপায়। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জীবন ছিল সুনিয়ন্ত্রিত কর্তব্যবাঁধনে বাঁধা। বিহারগুলিতে জীবনযাত্রা ছিল সুনির্ধারিত। মঠবাসী শিক্ষার্থীকে কঠোরভাবে মঠের নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হত। ভিক্ষায় যাওয়া ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু ভিক্ষু সম্বন্ধেও বিস্তারিত নিয়ম কানুন এবং সুনির্দিষ্ট আচরণ বিধি ছিল। কোনো ভিক্ষু যদি অপরাধ করত তাতে দশজন প্রধান ভিক্ষু মিলে অপরাধীর শাস্তি বিধান করতেন। গুরুতর অপরাধ করলে তাকে সংঘচ্যুত করা হত। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক ছিল পিতা-পুত্রের মতো মধুর। গুরু যেমন শিষ্যদের ধর্মীয় ও নৈতিক জীবন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন অন্যদিকে শিষ্যরাও গুরুর আদেশ মেনে চলাকে একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করত। পরস্পরের উন্নতি, সুখ সুবিধার জন্য পরস্পরই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। তেমনি শিষ্যরাও গুরুর আদেশ মেনে চলাকে একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করত। পরস্পরের উন্নতি, সুখ সুবিধার জন্য পরস্পরই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। শিষ্যরা নানাভাবে গুরুসেবা করত। শ্রমণ প্রতিদিন উপাধ্যায়ের মুখধোয়ার জল, দাঁতন ইত্যাদি প্রস্তুত রাখত। শিষ্য যেমন গুরুর সেবা করত তেমনি গুরুও শিষ্যের রোগে শোকে সমব্যথী হতেন।

বৌদ্ধ বিহারে গুরু এবং শিষ্যের জীবন কঠোর নিয়ম কানুনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা করলে শাস্তিদানের ব্যবস্থা ছিল। গুরু সংঘজীবনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে শিষ্য তার প্রতিবাদ করত। আবার শিষ্য অপরাধ করলে গুরু শাস্তিদানের ব্যবস্থা করতেন। বৌদ্ধশিক্ষার সময়কে তিনভাগে ভাগ করা হত, যথা- প্রব্রজ্যা, শ্রমণ ও উপসম্পদা। বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সংঘজীবনে প্রবেশ করত সেই অনুষ্ঠানকেই প্রব্রজ্যা বলা হত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শিক্ষার্থী মাথা মুড়িয়ে হলুদ

রঙের পোশাক পরে ভিক্ষুর চরণে প্রণাম করত। এরপর মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে শ্রমণে পরিণত হত। শিক্ষার্থী আটবছর বয়সে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পর বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করত।

শিক্ষার্থী যখন বৌদ্ধসংঘে প্রবেশ করত তখন তাকে পঞ্চশীল সম্পর্কে উপদেশ দেওয়া হত। প্রব্রজ্যার কাল ছিল বারো বছর ব্যাপী। প্রব্রজ্যা নেওয়া শিক্ষার্থীদের বলা হত শ্রমণ বা সামনের। শ্রমণের শিক্ষার কাল ছিল বারো বছর ব্যাপী। শ্রমণকে গুরুর অধীনে থাকতে হত। শ্রমণকে ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত। কুড়ি বছর বয়স হওয়ার পর যদি উপযুক্ত বিবেচিত হলে শ্রমণকে উপসম্পদা দেওয়া হত। উপসম্পদা হতে হলে দশজনের এক ভিক্ষু সংঘের অনুমোদনের প্রয়োজন হত। ভিক্ষুদের প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারলেই তাকে উপসম্পদা দেওয়া হত। দশবছর উপসম্পদা জীবন অতবাহিত করলে সে উপাধ্যায় হতে পারত।

নারীশিক্ষার ভূমিকা সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে গৌতম বুদ্ধ প্রথমদিকে নারীদের বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু পরে গৌতমী ও প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধে তিনি বৌদ্ধ সংঘে নারীদের গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সংঘে ভিক্ষুনীরা থাকলেও ভিক্ষুদের প্রাধান্য মেনে চলতে হত। ভিক্ষুনীদের বাধানিষেধ ছিল কঠোর। ভিক্ষুনীদের শিক্ষার জন্য একজন ভিক্ষুকে মনোনীত করা হত। তিনি অন্য এক ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুনীদের শিক্ষা দিতেন। ভিক্ষুসংঘের সাধারণ অনুশাসন ছাড়াও এদের আরো বারোটি বিশেষ-নিয়ম মানতে হত। পুরুষদের সাথে একঘরে থাকা, পুরুষ স্পর্শ, নদী পারাপার, বিয়েতে ঘটকের কাজ, গুরুতর পাপ গোপন করা ভিক্ষুনীদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্যা থেরি ধর্মদিনা যিনি বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। প্রথম অবস্থায় সংঘগুলিতে শিক্ষা ভিক্ষু, ভিক্ষুনীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসারের ফলে বৌদ্ধ বিহারগুলিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা প্রবেশ করতে পারত।

বৌদ্ধধর্ম গণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে ধর্মচর্চা, জ্ঞান চর্চার সুযোগ সবাই লাভ করেছিল। সংঘগুলির চেষ্টায় জনশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল। জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ শিক্ষা প্রসারের জন্য বৌদ্ধভিক্ষুরা নানাভাবে চেষ্টা করেছেন। বর্তমান ভারতেও এই জনশিক্ষার প্রসার ঘটাতে একের পর এক প্রকল্প রূপায়ণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। শিক্ষার আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার সকলের প্রথম বৌদ্ধ শিক্ষকমণ্ডলীর মাধ্যমে অনুভূত হয়। পরবর্তী কালে শিক্ষার প্রসারতা সর্বস্তরের মধ্যে প্রকাশ ঘটার গণ অবদান বৌদ্ধধর্মের ফলেই। বৌদ্ধ শিক্ষার সময়ে বিহারগুলিই ছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহারের পাশাপাশি রাজানুকূল্যে গড়ে ওঠা বৃহৎ বিহার গুলিই ছিল বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিল নালন্দা, বিক্রমশীলা। অন্যদিকে বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র- বল্লভী, ওদন্তপুরী, জগদ্দল, সারনাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছিল।

বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম দিক জাতি, ধর্ম, বর্ণ নিরপেক্ষতা। শিক্ষার অধিকার সবার – এই পন্থায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং সকলের জন্য অবারিত দ্বার যা প্রাচীন কালের সমসাময়িক ইতিহাস থেকে জানা যায়। এটি সাহসী পদক্ষেপের পরিচায়ক। বৌদ্ধধর্ম গণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে গণশিক্ষার প্রসার লাভ করেছিল। ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বৌদ্ধদেরই অবদান। বৌদ্ধ মহাবিহার গুলিতে বৌদ্ধধর্ম, দর্শন ইত্যাদি অধ্যয়নের সুযোগ থাকায় চিন, তিব্বত, নেপাল, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ থেকে বহু শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করতে আসতেন। এর ফলে মহাবিহার গুলি আর্ন্তজাতিক সাংস্কৃতিক বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধশিক্ষায় পাঠ্যবিষয়গুলিও ছিল বৈচিত্র্যময়। বৃত্তিমূলক শিক্ষা, ভাস্কর্য, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, সংগীত প্রভৃতি বিষয় ছিল পাঠ্য। উল্লেখ্য যে বৌদ্ধ শিক্ষা পাঠ করানো হত সম্পূর্ণ মাতৃভাষায় ফলত বুদ্ধদেবের বাণী ও ধর্মমত প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলে গুরুত্ব পায়। বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ভীষণ মধুর অর্থাৎ পিতা পুত্রের মতো। তবে সংঘের মাধ্যমে শিক্ষাদানের যে প্রক্রিয়া তা সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুসংবদ্ধ কর্তব্যে বাঁধা ছিল। এই শিক্ষার লক্ষণীয় দিক ছিল মানবসেবা। সুস্থ মানবতাবোধের প্রতীক রূপে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় গুলির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ভারতের সঙ্গে পূর্বএশিয়ার দেশগুলির সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বাড়তে থাকে। শিক্ষার মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া লক্ষ করা যায়। শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় মৌখিক পদ্ধতি হলেও গল্পের ছলে, আলোচনা পদ্ধতি ও উপকথার মাধ্যমে বাস্তবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষা দেওয়া হত। বর্তমানে শিক্ষার পদ্ধতিরূপে হাতেকলমে বাস্তবের দৃষ্টান্ত দিয়ে আকর্ষণীয় করে ছাত্র-ছাত্রীর কাছে তুলে ধরার যে রীতি তা বৌদ্ধ শিক্ষার বহমান ধারারই বিবর্তিত রূপ।

প্রাচীন ভারতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল গুরুকুল, পরিষদ, তপোবন আশ্রম, টোল বা চতুষ্পাঠী। এই সমস্ত কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষাদান হত। বৈদিক যুগে তপোবন আশ্রম ছিল আদি বিদ্যালয় যেখানে ঋষিরা আদি গুরুকুল। তপোবনের স্নিগ্ধ ও নির্জন পরিবেশে আচার্যের আশ্রমে পিতা-পুত্রের মতো নিবিড় স্নেহে বসবাস ও বিদ্যাচর্চা লাভ করতেন শিক্ষার্থী। এই সময়ের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানরূপে নৈমিষারণ্যে কুলপতি সনকের আশ্রমের দশহাজার ছাত্রের শিক্ষালাভের তথ্য পাওয়া যায় যা বৈদিক যুগে প্রথম। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠান গুরুকুল যেখানে গুরু গৃহে বাস করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভ হত। গুরুকুলের শিক্ষাশেষ হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করানো হত। প্রাচীন ভারতে হিন্দু শিক্ষার ক্ষেত্রে টোল ও পাঠশালা ছিল প্রাথমিক

শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। উল্লেখ্য যে পাঠশালা গুলিতে কোনো ধর্মশিক্ষা দেওয়া হত না। শিক্ষার্থীদের গণিত ও প্রাথমিক হিসাব নিকাশ শেখানো হত। টোলের পাঠ্য বিষয় ছিল সংস্কৃত, দর্শন, ভূগোল, জ্যোতিষবিদ্যা ইত্যাদি প্রাচীন ভারতে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল- তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্রমশীলা মহাবিহার। এই প্রতিষ্ঠান গুলিতে যত্ন সহকারে উন্নত ধরনের শিক্ষা দান হত শিক্ষার্থীদের। শিক্ষকমণ্ডলীরা ছিলেন জ্ঞানী ও পণ্ডিত তাঁদের সমস্ত বিষয়ে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য ছিল। তবে পণ্ডিতেরা শুধু ধর্ম, দর্শন, সংস্কৃত বা সাহিত্য নয়, বৃত্তিমূলক শিক্ষাতেও গভীর জ্ঞানী ছিল।

প্রাচীন ভারতের প্রাচীনতম শিক্ষাকেন্দ্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়। তক্ষশিলা ব্রাহ্মণ্যযুগে নির্মিত হলেও বৌদ্ধ যুগ পর্যন্ত এর কার্যধারা চালু ছিল। সমস্ত জ্ঞানী পণ্ডিতদের সহযোগিতায় এই প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। সমস্ত কাজে শিক্ষকমণ্ডলীই ছিলেন সর্বেসর্বা। ভারতবর্ষ ছাড়া বাইরের দেশ থেকেও অসংখ্য ছাত্র বিদ্যালাভের জন্য সমবেত হত। একজন অধ্যাপকের কাছে ৫০০ জন শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। অধ্যাপক মণ্ডলীর সুনামে আকৃষ্ট হয়ে শিক্ষার্থীরা আসতেন, এখানে ব্যক্তিগত ভাবেও শিক্ষক শিক্ষা দিতেন। তক্ষশিলার বহু শিক্ষার্থীর মধ্যে মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তীতে যেমন সংস্কৃত বৈয়াকরণিক পাণিনি, অর্থশাস্ত্র রচয়িতা কৌটিল্য, বুদ্ধের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ষোলোবছর বয়সে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হত তক্ষশিলাতে। ছাত্ররা নিজেরা বেতন দিয়ে পড়াশুনো করত। এখানে ছাত্রাবাসেরও সুব্যবস্থা ছিল। শিক্ষাদানের মৌখিক প্রক্রিয়ার সাথে ছাত্রদের উপলব্ধি দিয়ে বিচার করার উপরে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত। ব্যবহারিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হাতে কলমের পাশাপাশি বাস্তব বুদ্ধির কৌশল প্রয়োগে জোর দেওয়া হত। ব্যক্তিগত ও শ্রেণিগত শিক্ষা ছিল ওই শিক্ষাপদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি ছিল বিরাট ও ব্যাপক। বেদ, বেদান্ত, বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্র এছাড়াও সমরবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, পশুপালন, হিসাবরক্ষণ ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। চর্তুবেদ, পুরাণ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্র, ধাতুবিদ্যা, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বিষয় এই প্রতিষ্ঠানের অর্ন্তভূক্ত ছিল। অন্যদিকে ভ্রমণকে শিক্ষার বিশেষ অঙ্গরূপে গ্রহণ করা হত। চিত্রাঙ্কন, ভাস্কর্য, স্থাপত্য শিল্প অভিনয় প্রভৃতিতেও শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

একজন শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব নির্ধারণ হত সহজ সরল মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। এছাড়া বিতর্কসভায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন হত তক্ষশিলাতে। সেই সময়ের প্রখ্যাত চিকিৎসক তক্ষশিলার ছাত্র জীবক যিনি চিকিৎসাবিদ্যা ও অস্ত্রোপচারে গৌরব অর্জন করেন। তিনি তক্ষশিলার চারিদিকে বন্যগাছপালা পরীক্ষা করে ভেষজগুণ আবিষ্কার

করেছিলেন। তক্ষশিলার কৃতি ছাত্রদের নাম পাওয়া গেলেও কৃতি অধ্যাপকদের নাম জানা যায় না। অধ্যাপকরা গুরু, আচার্য, উপাধ্যায় প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করা হত। গুরুপুত্র ও উন্নত পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকতায় গুরুকে সাহায্য করতেন যা পরবর্তী কালে 'সর্দার পড়ো' ব্যবস্থার পূর্বরূপ। তক্ষশিলাতে শিক্ষা পদ্ধতি আবৃত্তির ওপর জোর দিলেও গুরু কঠিন অংশের ব্যাখ্যা করতেন। সে সময় লিপির ব্যবহার ছিল। মৌখিক পদ্ধতির সাথে এখানে পুথির ব্যবহারও হত। মুখস্থ করতে গিয়ে কোনো অংশ বাদ পড়ে গেলে পুথি দেখে সে অংশ ঠিক করে নেওয়া হত। ছাত্ররা তক্ষশিলাতে বেতন দিয়ে পড়াশুনো করত। বিত্তবান শিক্ষার্থী শিক্ষাব্যয়ের জন্য সহস্র স্বর্ণমুদ্রা গুরুকে দিয়ে পড়াশুনো করত। এগুলি শিক্ষার্থীর খাওয়া বেশ-বাস প্রভৃতির জন্য খরচ করা হত। যাদের অর্থ ছিল না তারাও নিরাশ হতো না। দিনেরবেলা গুরুর সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম সেরে রাতের অবসর সময়ে গুরুর কাছে পাঠ গ্রহণ করত। তক্ষশিলার ব্যবহারিক শিক্ষা দেশে বিদেশে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল যা শিক্ষার ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায়।

শিক্ষার ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে দেখা যায় প্রাচীন ভারতে সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষালাভ হত বৌদ্ধযুগে। যেহেতু এই শিক্ষা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই গ্রহণ করতে পারত তাই বৌদ্ধ শিক্ষা শুধু ভারতে নয় ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শনই শুধু নয় প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল নালন্দা। নালন্দা বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে সবচেয়ে উচ্চস্থানে। বিহারের রাজগির থেকে সাত মাইল উত্তরে-বড়গাঁ নামক স্থানে আজও এর ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। নালন্দার চারপাশে ছোট বড় পাহাড় যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম ও জ্ঞানচর্চার পক্ষে অতি উত্তম পরিবেশ, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। নালন্দার খ্যাতি সুদূর তিব্বত, চিন, কোরিয়া, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। মহাযান মত প্রভাবিত বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ ও তাদের যাবতীয় প্রশ্ন ও সংশয়ের নিরসন ঘটাতে শিক্ষার্থীরা নালন্দাতে সমবেত হত। দ্বাদশ শতকে বখতিয়ার খলজি এই মহাবিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করার পূর্ব পর্যন্ত নালন্দা আর্ন্তজাতিক খ্যাতির সুনাম অটুট রেখেছিল।

শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায় যে নালন্দায় কোনো জাতিভেদ প্রথা ছিল না তবে সাধারণ মেধার ছাত্রদের প্রবেশ প্রায় অসাধ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে প্রার্থীকে দ্বার পণ্ডিতের কাছে নিজের বিদ্যা-বুদ্ধির পরীক্ষা দিয়ে তবে নালন্দায় ভর্তি হওয়ার অধিকার মিলত। নালন্দার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যে থেকে দ্বার পণ্ডিত নিয়োগ করা হত। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সংঘশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন অধ্যাপকমণ্ডলী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধানকে বলা হত 'অধ্যক্ষ' বা 'প্রধানাচার্য'। তিনি বিভাগীয় প্রধানদের নিয়ে সুষ্ঠ পরিচালনের ব্যবস্থা

অধ্যাপক দ্বার পণ্ডিতের কাজ করতেন।

প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় মূলত বৌদ্ধশিক্ষার শিক্ষাদানের আনুষ্ঠানিক অস্তিত্ব না থাকলেও শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল মৌখিক। বৌদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষার পদ্ধতি গুলি শিক্ষকের নির্দেশে সংশোধন ও পরিমার্জন করা যেত। প্রাচীন শিক্ষায় শিক্ষকের শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক না হলেও সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আগামী দিনের শিক্ষকদের তৈরী করতেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতেন। পরবর্তীকালে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে এই রীতি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। বৌদ্ধশিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে প্রাচীনধারা বজায় না রাখলেও যুগের বিবর্তনে আজও সেই ভাবধারা বহন করে চলেছে শিক্ষার নিরন্তন পরিবর্তনের মধ্যে।

....

বৌদ্ধভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে জাতক

গৌরী সাঁফুই

এক একজন মহাপুরুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্ভাসমান প্রতিভার আলোকে তৎকালীন মানবের আত্মদর্শন ঘটে; আর সেই আলোকাকীর্ণ জীবনবোধের পরিপ্রেক্ষিতে এক একটি ঐতিহ্যবাহী ভাষা ও সাহিত্য বিকশিত হয়। অনুরূপভাবে বলা যায়, রবীন্দ্রদৃষ্টিতে যিনি 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব'[1] অর্থাৎ যখন গৌতমবুদ্ধের বা বুদ্ধদেবের অমিয় জ্যোতিতে ভারতমানস উদ্ভাসমান, তখন শ্রমণেরা সাধনার ঐতিহ্য ও সৃষ্টির প্রাচুর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধদেবের 'শিক্ষাপদ'[2] একদিন বিশ্বের একটি বৃহত্তর অংশকে সংহত ও ঐক্যবদ্ধ করে শান্তজীবনবোধের পটভূমিতে সাম্য, মৈত্রী, অহিংসা ও করুণার বাণী বিস্তারী ভানায় বিশাল বৌদ্ধভারত রচনা করে। ফলে ভারত, সিংহল, জাপান, চীন প্রভৃতি বৌদ্ধ-অধ্যুষিত দেশগুলি রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষায়, স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলায়, সাহিত্য-দর্শনে, অর্থ-সামর্থে একদিন অপরিমেয় উন্নতিলাভ করে।

বর্তমানে আলোচ্য বিষয় হল, বৌদ্ধভাষা, সাহিত্য ও দর্শনে জাতকের অবস্থানভূমি সম্পর্কে আলোচনা। অবশ্য তার পূর্বে 'জাতক' শব্দটির অর্থ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। 'জাতক' শব্দটির অভিধানগত অর্থসমূহ হল – 'জাতবালক,', 'জাত বালকের শুভাশুভ নির্ণায়ক গ্রন্থ', 'কোষ্ঠী', 'জাতকর্ম', 'সংস্কার' প্রভৃতি। ব্যুৎপত্তি হল জাত + কন্ স্বার্থে, হিতার্থে। বি; ক্লী। কিন্তু 'জাতক' শব্দটি বৌদ্ধসাহিত্যে বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ পালি ভাষায় লিখিত বুদ্ধদেবের পূর্বজন্ম কাহিনি বা অতীত জন্মবৃত্তান্ত। "বৌদ্ধরা বলেন, শুদ্ধ একজন্মের কর্মফলে কেহই গৌতম প্রভৃতির ন্যায় অপার বিভূতিসম্পন্ন সম্যক্‌সম্বুদ্ধ হইতে পারেন না, যিনি বুদ্ধ হইবেন, তাঁহাকে বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধাঙ্কুর বেশে কোটি কল্পকাল নানা যোনিতে জন্মজন্মান্তর পরিগ্রহপূর্ব্বক দান শীলাদি পারমিতার অনুষ্ঠান দ্বারা উত্তরোত্তর চরিত্রের উৎকর্ষসাধন করিতে হয়। পরিশেষে, তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞা লাভ করিয়া অভিসম্বুদ্ধ হন। অভিসম্বুদ্ধ অবস্থায় তাঁহার 'পূর্ব্বানিবাসজ্ঞান' জন্মে অর্থাৎ তিনি স্বকীয় ও পরকীয় অতীত জন্মবৃত্তান্তসমূহ নখদর্পণে দেখিতে পান। 'পূর্ব্বনিবাসজ্ঞান' কেবল অভিসম্বুদ্ধ লক্ষণ নহে; যাঁহারা অর্হত্ব লাভ করেন, তাঁহাদের ও এই ক্ষমতা আছে।

গৌতম বুদ্ধের ও এই অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়াছিল। তিনি শিষ্যদিগের অধিকারভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্নভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন এবং অনেক সময়ে

অধ্যাপিকা, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন্।

ভবান্তর-প্রতিচ্ছন্ন উপদেশমূলক অতীতকথা শুনাইয়া তাহাদিগকে নির্ব্বাণসমুদ্রের অভিমুখে লইয়া যাইতেন। গৌতমপ্রোক্ত জাতকগুলি বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রের নবাঙ্গের এক অঙ্গ এবং ত্রিপিটকের সূত্তপিটকান্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের শাখা।"[৩]

'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক' নামক গ্রন্থে জাতকে উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয়, "বুদ্ধদেব তাঁহার বহুশিষ্যের অধিকার-ভেদ বিবেচনাপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্নভাবে ধর্ম্মদেশন করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে চিত্তরঞ্জক অথচ সদুপদেশমূলক গল্প করিতে হইত; লোকে তাহা শুনিয়া ধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিত ও সন্নীতি-পরায়ণ হইয়া ঐহিক ও পারত্রিক সুখলাভ করিত।"[৪]

বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণও এই উপায় অবলম্বন করতেন এবং গাথাগুলিকে বর্ণনাত্মক গদ্যের সঙ্গে ইচ্ছামত সাজিয়ে মনোহর গল্পের সৃষ্টি করতেন। গল্পের সাহায্য ব্যতিরেকে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করে অভিধর্ম্ম ব্যাখ্যা করতে গেলে বৌদ্ধেরা এত কৃতকার্য হতেন না।

জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য পারমিতাসমূহের মহিমা কীর্তন। বোধিসত্ত্ব কোন জন্মে দান, কোন জন্মে শী্ কোন জন্মে প্রজ্ঞা, কোন জন্মে সত্য, কোন জন্মে মৈত্রী ইত্যাদি পারমিতার অনুষ্ঠান করে এবং সেই সঞ্চিত পুণ্যবলে অন্তিমকালে অভিসম্বুদ্ধ হয়ে পরিনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। উপাসকেরাও স্ব স্ব সাধ্যানুসারে এই সমস্ত পারমিতার অনুষ্ঠান করলে তাঁরা ও জন্ম-জন্মান্তরে উন্নতি লাভ করে শেষে নির্ব্বাণ লাভ করেন – সরল ভাষায় এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করাই জাতকের উদ্দেশ্য।

মূল জাতকগুলির প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। অধ্যাপক ফৌসবোল পালি ভাষায় লিখিত 'জাতকত্থবণ্ণনা' নামক যে গ্রন্থ সম্পাদন করেন তাতে ৫৪৭টি জাতক আছে, কিন্তু দেখা যায়, একই জাতক কোথাও ভিন্ন ভিন্ন নামে, কোথাও একই নামে পুনরুক্ত হয়। ফলে প্রকৃত জাতকের সংখ্যা অর্থাৎ যে সকল আখ্যায়িকায় বোধিসত্ত্বের এক এক জন্মের কথা আছে, সেগুলি গণনা করলেও জাতকের প্রকৃত সংখ্যা পাওয়া অসম্ভব অর্থাৎ 'জাতকত্থবণ্ণনা'র জাতকসংখ্যা ৫৪৭ অপেক্ষা কম হবে। 'জাতকত্থবণ্ণনা'র জাতকগুলিই সমগ্র জাতক নয়। মহাগোবিন্দ জাতক প্রভৃতি দুই একটি জাতকের নাম 'জাতকত্থবণ্ণনা'য় থাকলেও তাদের আখ্যায়িকাগুলি স্থান পায়নি। সুত্তপিটক এবং শ্যাম ও তিব্বত দেশেও কয়েকটি স্বতন্ত্র জাতক প্রচলিত। ফলে 'জাতক' নামে অভিহিত আখ্যানগুলির কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। অনেকে সুবিধা মতো প্রচলিত কোন আখ্যানকে বৌদ্ধবেশে সাজিয়ে এবং বোধিসত্ত্বকে তার নায়কের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে জাতক নামে চালিয়ে গিয়েছেন।

'জাতকত্থবণ্ণনা' পালি ভাষায় রচিত। পালি বৌদ্ধ ভাষা। বৌদ্ধভাষার পরম্পরায়

সৃষ্টি হয় বৌদ্ধ সাহিত্য এবং জাতক বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি অন্যতম সৃজনশীল ধারা।

ধর্মদেশনার ভাষার বিষয়ে বুদ্ধদেবের অভিমত একটা দৃষ্টান্তের মধ্যদিয়ে তুলে ধরা যায়, যেমন, যমেল ও উতেকুল নামে দুই ব্রাহ্মণ ভিক্ষু হন এবং তাঁরা একদিন বুদ্ধদেবের কাছে নিবেদন করেন, "ভগবন, সম্প্রতি ভিন্নভিন্ন নাম গোত্র ও জাতিকুলের প্রব্রজিতগণ নিজের নিজের ভাষায় বুদ্ধবচনকে দূষিত করছে। আমরা তা ছন্দে (= বেদ ভাষায় = সংস্কৃত ভাষায়) আরোপিত করতে চাই।" এই কথা শুনে বুদ্ধ তাদের পুরস্কৃত না করে তিরস্কার করেন –

"ন ভিক্খবে বুদ্ধবচনং ছন্দসে আরোপেতব্বং
যে আরোপেয্য আপত্তি দুক্কস্সা তি।
অনুজানামি ভিক্খবে, সকায় নিরুত্তিয়া
বুদ্ধবচনং পরিয়াপুনি তুন্তি।।"[৫]

অর্থাৎ 'ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে ছন্দে আরোপিত করতে হবে না। যে করবে তার দুষ্কৃত নামক অপরাধ হবে। হে ভিক্ষুগণ, বুদ্ধবচনকে নিজ নিজ ভাষাতেই গ্রহণ করার জন্য আমি এই অনুজ্ঞা করছি'।

বুদ্ধদেবের স্পষ্ট অভিপ্রায়ানুসারে তখন থেকেই আপন আপন ভাষাতেই ('সকায় নিরুত্তিয়া') বৌদ্ধধর্ম প্রচারে আগ্রহ দেখা দেয়। এরই পরিণতিরূপে পরবর্তীকালে পালিভাষার উদ্ভব। পালির ভাষাতাত্ত্বিক রূপ বিচার করলে দেখা যায়, পালির সঙ্গে সংস্কৃত অপেক্ষা বৈদিক ভাষার ঘনিষ্ঠতা অধিক। কারণ, পাণিনির পূর্ব থেকেই বৈদিক ভাষাভিত্তিক মধ্যভারতীয় আর্যভাষার সূত্রপাত। অর্থাৎ "Pāli however cannot be directly derived from Sanskrit, for it shows a number of characteristic features which suggest its closer relation to Vedic"[৬] ফলে দেখা যায়, মধ্যভারতীয় আর্যভাষার প্রাথমিক স্তরে যখন পশ্চিম-মধ্য-পূর্ব দেশ-ভিত্তিত আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষাগুলি আপন আপন স্বরূপে উপনীত হতে পারেনি, তখন বুদ্ধদেবের অভিপ্রায়-অনুসারে সর্বসাধারণের কাছে সুবোধ্য করার জন্য, সাধারণের মুখের ভাষায় মূল্যবান বুদ্ধবাণীর প্রচারকার্য শুরু হয়; এরই পরিণতিরূপে পালি ভাষা আত্মপ্রকাশ করে।

বুদ্ধদেবের সমকালে ভারতের ভাষাচিত্র হল – ১। বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাসীরা সংস্কৃত বা শিষ্ট ভাষা ব্যবহার করেন। ২। বুদ্ধের সমকালে মহাবীর পার্শ্বনাথ জৈনধর্মের প্রচার মগধ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে প্রাকৃত ভাষায় করেন। ৩। বুদ্ধের যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যান সমকালীন মগধ, কোশল ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মদেশনার জন্য বুদ্ধ যে ভাষার আশ্রয় নেন, যা তৎকালীন সাধারণ মানুষের বোধগম্য হলেও সংস্কৃত থেকে

ভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর এই ভাষা যখন বুদ্ধবচনের ভাষা তথা বোউদ্ধসাহিত্যের ভাষা হিসাবে বিকাশ লাভ করে, তা পালি নামে অভিহিত হয়।

সংমিশ্রিত, সৌকর্যমণ্ডিত, ধর্মীয় ভাষা হিসাবে পালি ভাষার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন, "This Western dialect into which Buddha's teaching were translated came to be known as 'Pali', which simply means 'texts' and its grammar amply shows that at its basis it is a midland speech. Pali became a sort of a seered language for some Buddhists".[৭] বুদ্ধদেব নিজে কোন গ্রন্থরচনা করেননি। তাঁর মহাপরিনির্ব্বাণের পর তাঁর দেশনা সংগ্রহ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে কয়েকটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্ব্বাণের অব্যবহিত পরে আবার কারও মতে আনুমানিক ১০০ বৎসর পরে রাজগৃহে (বর্তমান রাজগীরে) বৈভাব পর্বতে সপ্তপর্ণী নামক গুহায় পাঁচশত বৌদ্ধ অর্হতের প্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করা হয় স্থবির মহাকস্সপের সভাপতিত্বে। এই সমিতিতে পালিভাষায় বুদ্ধদেবের বাণী সংগ্রহ ও রক্ষার প্রথম প্রয়াস দেখা যায়।

বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য আনন্দ যে সমস্ত সূত্র বিবৃত করেন, তাকে **'সুত্তপিটক'** আখ্যা দেওয়া হয়। সুত্তপিটকে বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র, ধ্যান-ধারণা-ভাবনা, দর্শন, ধর্মের ক্রমবিকাশ ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে। উপালির বিবৃতি 'বিনয়পিটক' নামে রূপ লাভ করে। বিনয়পিটকে যে বিধিনিয়মগুলি আছে, সেগুলি বিশেষভাবে কায়-বাক-চিত্তকে বিনীত করে বলে সেগুলির নাম বিনয়। মহাকস্সপ (মহাকাশ্যপ) স্বয়ং **'অভিধর্ম্মে'র মূলকথাগুলি** বলেন। শীল বিষয়ক শিক্ষা বিনয়পিটকে, চিত্ত বিষয়ক শিক্ষা সুত্তপিটকে এবং **প্রজ্ঞাবিষয়ক** শিক্ষা অভিধর্ম্মপিটকে আছে। 'জাতক' বা (অট্‌ঠকথা) সুত্তপিটকের খুদ্দক নিকায় বা সংকলনের অন্তর্গত।

অধ্যাপক অটো ফ্রাঙ্ক বলেন যে, এক সময়ে ভারতবর্ষে ও লঙ্কাদ্বীপে পালিই আর্যদিগের সাধারণ ভাষা ছিল। তবে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির পূর্বে এই ভাষায় রচিত গ্রন্থের নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু গৌতমবুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্যগণের যত্নে শেষে এই ভাষা নানারত্নের প্রসূতি হয়। কারও কারও মতে 'জাতক' বা 'জাতকত্থবণ্ণনা' বুদ্ধঘোষের লেখনী প্রসূত। 'জাতকত্থবণ্ণনা'য় প্রত্যেক জাতকের তিনটি অংশ। প্রথম অংশের নাম প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বা বর্তমান কথা। গৌতমবুদ্ধ কি উপলক্ষে বা কোন্ প্রসঙ্গে আখ্যায়িকাটি বলেন, এই অংশের উদ্দেশ্য তা বুঝিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয় অংশটি প্রকৃত জাতক, অর্থাৎ মূল আখ্যায়িকা; এর নাম অতীত বস্তু, কারণ এ গৌতমবুদ্ধের অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। পরিশেষে সমবধান অর্থাৎ অতীতবস্তু বর্ণিত পাত্রদের সঙ্গে বর্তমান বস্তু-বর্ণিত ব্যক্তিদের অভেদ প্রদর্শন।

'সঞ্জীবজাতক'-এর আখ্যায়িকায় জাতকের তিন অংশই দেখা যায়।

উপরিউক্ত অংশবিভাগ হতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 'বর্তমানবস্তু' মূল জাতকের অঙ্গ নয়, ব্যাখ্যা মাত্র। সমবধানগুলি বৌদ্ধদের জন্মান্তরবাদের সমার্থক। যাঁরা আত্মা মানেন না, কিন্তু তাঁরা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন, এ কিছু বিচিত্র নয় কি? বৌদ্ধমতে জীবগণ রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান – এই পঞ্চস্কন্ধের সমষ্টি; মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই স্কন্ধগুলির ধ্বংস হয়, কিন্তু জীবের কর্ম তৎনই নূতন স্কন্ধ উৎপাদিত করে লোকান্তরে নবজীবন লাভ করে। কর্মকেই আত্মা না বলার উত্তর হল বৌদ্ধমতে, নামে কিছু যায় আসে না; কিন্তু আত্মাবাদীরা আত্মা নামে যে নিত্য পদার্থ স্বীকার করেন, কর্ম তা নয়; স্কন্ধ অপেক্ষা কর্মের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হলেও কর্ম নশ্বর – বহু 'সংসার' ভ্রমণের পর, বহু সাধনা ও ধ্যানধারণার পর কর্মের লয় হয়; তখন আর পুনর্জন্ম ঘটে না, এরই নাম 'নির্ব্বাণ'।

জাতকগুলির অতীতবস্তু গদ্যপদ্য মিশ্রিত। পদ্যাংশের কবিতাগুলির নাম, গাথা। গাথাগুলি আখ্যায়িকার বীজস্বরূপ। এর ভাষা অতি প্রাচীন। প্রাচীন সময়ে আখ্যাগুলি লিপিবদ্ধ হবার পূর্বে তাদের সারাংশ সচরাচর গাথাকারেই লোকের মুখে মুখে চলে আসে; গাথা শুনে লোকে হয় সমস্ত আখ্যানটি, নয় তার উপদেশ বুঝে নিত।

জাতকের প্রাচীনত্ব : সমস্ত জাতকই যে গৌতম বুদ্ধকর্তৃক রচিত, প্রাচীন সাহিত্য অনুসন্ধানে তা প্রমাণিত হয় না। আখ্যায়িকাগুলির রচনার পার্থক্য, পুনরুক্তিদোষ এবং গাথাসমূহের ভাষাগত ও কবিত্বগত বিভেদ প্রমাণ করে যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারাই জাতকগুলি রচিত।

জাতকে শুদ্ধ ধর্মনীতি ছাড়া তর্কশাস্ত্র এবং রাজনীতি ও আখ্যায়িকার মনোমোহিনী শক্তি অপরিজ্ঞাত ছিল না। অন্ধ-গোলাঙ্গুল-ন্যায়, লাজাবন্ধন-ন্যায়, অর্দ্ধজরতী ন্যায়, অন্ধহস্তিন্যায়, পিঙ্গনার আখ্যায়িকা প্রভৃতি দৃষ্টান্তে তর্কশাস্ত্রের ও দর্শনশাস্ত্রের কথার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। একপর্ণজাতকে, রাজাববাদজাতক, বর্দ্ধকিশূকরজাতক প্রভৃতিতে রাজনীতিমূলক কথার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনকালে অনেক সময় গাথার সংখ্যা অল্প হলে গদ্যে গল্প রচনা করে তার সঙ্গে গাথাগুলি সংযোজিত হত। এরূপেই জাতকত্থবণ্ণনার উৎপত্তি হয়। ভার্হুত ও সাঁচীর স্তূপে কোন কোন জাতকের নাম ও গদ্যময় অংশের ঘটনা প্রস্তরে উৎকীর্ণ হয়। ফলে স্বীকার করতেই হয় যে, গদ্যপদ্যাত্মক জাতকের রচনা খ্রিস্টের অন্তত ২৫০ বৎসর পূর্বে সম্পাদিত হয়।

তবে জাতকাখ্য সমস্ত কথার প্রথম রচক না হলেও বৌদ্ধেরাই এদেশে 'জাতকত্থের প্রকৃষ্ট সঙ্কলনে অগ্রণী। সুত্তপিটকের দীঘনিকায়, মজ্‌ঝিমনিকায় ও সংযুক্তনিকায় জাতকগুলির কথা

বলা হয়। নানা প্রমাণের মাধ্যমে দেখানো হয় যে, জাতকসমূহের সঙ্কলনকার্য খ্রিস্টের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হয়, তুলনায় বৃহৎকথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর একেবারে নবীন।

জাতক বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র, ফলে ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে অনেক জাতক দেশীয় ভাষায় অনূদিত হয় এবং ধর্মীয় পিপাসা চরিতার্থ করে। বকজাতক বা ভীমসেনজাতক বা কটাহ জাতক শ্রবণে শিশুমুখে হাস্য দেখা দেয় এবং বিশ্বন্তরজাতক বা শিবিজাতক শ্রবণে বৃদ্ধের চক্ষু প্রেমাশ্রুপ্লাবিত হয়।

বৌদ্ধপ্রভাবিত সময়ে ভারতের আপামর সাধারণ সকলেই জাতককথা জানত। ভার্হুট, সাঁচী ও সারনাথের বৌদ্ধবিহারগুলিতে অনেকগুলি জাতকের চিত্র শিলাখণ্ডে উৎকীর্ণ হয়। অর্থাৎ ঐসকল বিহার নির্মাণকালে (খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে) অনেক জাতক লোকসমাজে সুবিদিত ছিল। ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতকগুলির বৌদ্ধভাব ও ক্রমশ বিলুপ্ত হয়, অনেক জাতক নূতন আকারে হিন্দুদের গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়, অনেকগুলি এদেশ হতে একেবারে তিরোহিত হয়।

ভারতবর্ষীয় সাহিত্যেও জাতকের প্রভাব দেখা যায় – যেমন রামায়ণ ও মহাভারতে জাতক কথা দৃষ্ট হয়। বাণের হর্ষচরিতে, দণ্ডির কাব্যাদর্শে, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীতে এবং সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে জাতকের প্রভাব দৃষ্ট হয়। এছাড়া খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ পঞ্চতন্ত্র প্রণীত হয়। এর কোন কোন কথা বৌদ্ধজাতক হতে গৃহীত। পঞ্চতন্ত্রের লেখক বৌদ্ধ জাতকের নিকট ঋণের কথা স্বীকার করেন। তাঁর রচনা কৌশলে বকজাতক, বানরেন্দ্রজাতক, কূটবাণিজজাতক, সঞ্জয়জাতক প্রভৃতি বৌদ্ধকথা চিত্তরঞ্জক হয়।

সংস্কৃত ভাষায় সিংহাসনদ্বাত্রিংশতিকা, শুকসপ্ততি, জৈনদের কথাকোষ প্রভৃতি আখ্যায়িকায় অংশবিশেষে বৌদ্ধজাতকের প্রভাব দৃষ্ট হয়। উদীচ্য বৌদ্ধসাহিত্য 'অবদান' নামে অভিহিত গ্রন্থগুলি প্রধান কথা-ভাণ্ডার। অবদানসমূহ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। 'জাতক' বললে বুদ্ধের অতীত জন্মসমূহের ইতিহাস বোঝায়; 'অবদান' বললে অন্যান্য মহাপুরুষদের চরিত্র বোঝায়। উদীচ্য বৌদ্ধদের অবদানগুলি জাতকের অনুকরণেই রচিত। তাদের যেগুলি বোধিসত্ত্বের নামে প্রচলিত, সেগুলি জাতকস্থানীয়।

বিদেশের সাহিত্যে ও জাতকের প্রভাব দেখা যায়। বিদেশের সাহিত্যে জাতকের প্রভাব প্রসঙ্গে গ্রিক সাহিত্যের কথা বলতে হয়। গ্রিস দেশের ঈষপ-নামধেয় ব্যক্তির নামে প্রচলিত ঈষপের গল্প অনেকগুলি জাতকের রূপান্তর, অনেকগুলি অপরের রচনা। ঈষপের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় হেরোডোটাসের গ্রন্থে (খ্রিস্টের প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে)। অর্থাৎ

ঈষপের কথাকার গৌতমবুদ্ধের জন্মসময়ে জীবিত ছিলেন। এ্যারিস্টটল ও তাঁর অলঙ্কার সংক্রান্ত গ্রন্থে রাজনীতিক বক্তৃতায় 'কথা'র উপযোগিতা প্রদর্শন করতে গিয়ে দুটি 'কথা' উদ্ধৃত করেন, তার মধ্যে শৃগাল ও শল্লকি কথা উল্লেখযোগ্য। এতে বোঝা যায়, অতি প্রাচীন সময়েই প্রাচ্য খণ্ড হতে প্রতীচ্য খণ্ডে কথার বিস্তার হয়।

জাতকের উপযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যে সকল কথা সাহিত্যে ও লোকমুখে চলে আসছে, আদিম অবস্থায় তাদের রূপ কেমন ছিল, কি উদ্দেশ্যে রচিত হয়, কি কারণে দেশভেদে তাদের পরিবর্তন ঘটে ইত্যাদি নির্ণয়ের জন্য জাতক পাঠ প্রয়োজন, এই উপযোগিতা দেখে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জাতক অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সমগ্র পালি জাতকথবণ্ণনা ইংরেজি অক্ষরে মুদ্রিত হয় এবং আরও নানাভাষায় এর অনুবাদ হয়। জাতকের উপযোগিতার বিষয়গুলি হল –

প্রথমত – জাতকের সমস্ত কথাই উপদেশাত্মক, এদের সবগুলো না হলেও অধিকাংশ মহাপুরুষবাক্য। ফলে আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলেই নির্মল আনন্দের সঙ্গে উপদেশ লাভ করে। কথাচ্ছলে ও বচনমাধুর্যে অতি দুরূহ ধর্ম্মতত্ত্ব জাতক সর্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করায়।

দ্বিতীয়ত – জাতকপাঠে সৃষ্টির একত্ব উপলব্ধি হয়, সর্বজীবে প্রীতি জন্মে। খ্রিস্টধর্মে বলে, মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃভাবে দেখ, বৌদ্ধধর্ম বলে, জীবমাত্রকেই আত্মবৎ বিবেচনা কর। যিনি এ যুগে বুদ্ধ তিনি অতীতে মৃগ, মর্কট, মৎস্য বা কূর্ম্ম ছিলেন, যে এযুগে মৃগ বা মর্কট, সেও ভবিষ্যদ্ যুগে পূর্ণেন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়ে দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করবে। "অতএব অদ্য হউক, আর কল্পান্তেই হউক; সমস্ত জীবই এক- স্কন্ধ সমষ্টিমাত্র – এবং কর্ম্মক্ষয়ন্তে সকলেই নির্ব্বাণ লাভ করিবে।" – জাতকমঞ্জরী, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, উপক্রমণিকা।

তৃতীয়ত – জাতকের অনেক আখ্যায়িকায়, বিশেষতঃ প্রত্যুৎপন্ন বস্তুতে পুরাকালের রীতিনীতি ও আচারব্যবহার – সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। কথা কল্পনা সম্ভবা, কিন্তু সত্যগর্ভা, কথাকার অসম্ভবকে সম্ভবপর বলে বর্ণনা করবেন – নানা প্রসঙ্গে সমসাময়িক বিধিব্যবস্থা রাজনীতি ও সমাজনীতি হয় স্পষ্টভাবে, নয় ধ্বনিদ্বারা বলে যান, না হলে তাঁর কথার উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়। জাতকে ভারতের সমাজের নিঁখুত চিত্র পাওয়া যায় কিন্তু পরে ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি দৃষ্ট হয়। প্রব্রাজকরা কামিনী ও কাঞ্চনকে ভয় করতেন এবং ভিক্ষুদের মনে নারী সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা জাগানোর জন্য নারীদের প্রতি ঘোর অবিশ্বাসের চিত্র কোন কোন জাতকে চিত্রিত হয়। কিন্তু উৎপলবর্ণা, বিশাখা, অম্রপালী ইতিবৃত্তে ধর্মচর্চায় নারীকে পুরুষের সমতুল্য দেখানো হয়।

চতুর্থত – জাতকের প্রত্যুৎপন্নবস্তুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের বিশেষতঃ কোশল, বৈশালী ও মগধরাজ্যের অনেক ইতিবৃত্ত আছে। অনেকে বলেন, প্রত্যুৎপন্ন অংশ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী

সময়ে রচিত, তাই ঐতিহাসিক বিবরণ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু ভিন্‌সেন্ট্‌ স্মিথ্‌ প্রভৃতি পুরাবৃত্তকারেরা জাতককে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম ভাণ্ডার বলেই নির্দেশ করেন।

পঞ্চমত – গ্রিক শিল্পে হোমার ও হেসিয়ডের, হিন্দুশিল্পে বাল্মীকি ও ব্যাসের এবং বৌদ্ধ শিল্পে জাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। সাচী, ভাহ্‌রুট, বরবুদোরো প্রভৃতি স্থানের ধ্বংসাবশেষে পুরাতন বৌদ্ধ তক্ষকগণের অদ্ভুত প্রতিভার নিদর্শনকে বুঝতে হলে জাতককে জানা প্রয়োজন।

ষষ্ঠত – জাতপ-পাঠে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি অতি বিশদভাবে হৃদয়ঙ্গম হয়। বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের বিরোধী নয়, এতে জন্মান্তরবাদ, পরলোক, স্বর্গ, নরক ও কর্মফল আছে, ইন্দ্রাদিদেবতা, বৃক্ষদেবতা, যক্ষরাক্ষসাদি অপদেবতা আছেন। ক্ষণিকত্ববাদ ও শূন্যবাদ এবং পরিনির্ব্বাণ আছে। তবে ধর্মের বহিরঙ্গ আড়ম্বর, নিষ্ঠা বা কর্মশুদ্ধিহীনতার বিরোধী বৌদ্ধেরা, অর্থাৎ হিন্দুধর্মের কুসংস্কার সাধন করে বৌদ্ধধর্ম।

সপ্তমত – জাতকপাঠে জানা যায় বৌদ্ধদের কুসংস্কারের বিরোধিতার রূপ। তাঁরা সুবিধা পেলেই ফলিত জ্যোতিষ, শকুনবিদ্যা প্রভৃতির অসারতা বুঝিয়ে দিতেন। মানবের মনকে ভ্রমপাশ হতে মুক্ত করা, শাস্ত্র অপেক্ষা যুক্তির প্রাধান্য ঘোষণা করা বৌদ্ধদের প্রধান কাজ। এর নিদর্শন মঙ্গলজাতকের (৩২ পৃ.) ও নক্‌খত্ত জাতকের (৩৫ পৃ.) গাথাগুলিতে পাওয়া যায়। তবে কোন কোন লোকাচার যুক্তিবিরুদ্ধ হলেও বৌদ্ধেরা তা পদদলিত করতেন না। গগ্‌গ-জাতকে (১৫৫) তার নিদর্শন আছে।

অষ্টমত – বাংলা ভাষার নিত্যব্যবহৃত অনেক শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করতে হলে পালি সাহিত্যের বিশেষতঃ জাতকের আলোচনা আবশ্যক।

উপসংহারে বলা যায় যে বৌদ্ধ ভাষা অর্থাৎ পালিভাষা, বৌদ্ধসাহিত্য অর্থাৎ পালিসাহিত্য এবং বৌদ্ধদর্শনে জাতকের কথাগুলি অর্থাৎ 'জাতকথবণ্ণনা'র আখ্যানগুলি অপরিহার্য রূপ নিয়ে বৌদ্ধধর্ম দর্শন, ও সাহিত্যকে সারা বিশ্বে সর্বকালীন রূপ নিয়ে রূপান্তরের মধ্যদিয়ে ছড়িয়ে দেয় এবং এরফলে বৌদ্ধভাবনা অতিবিস্তারী রূপ লাভ করে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ), ১১শ খণ্ড, পৃঃ ৪৬৯, বুদ্ধদেব প্রবন্ধ।
২. শিক্ষপদ : চরথ ভিক্‌খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়
লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় চ দেবমনুস্‌সানং মহাবগ্‌গ।

৩. জাতকমঞ্জরী – ঈশানচন্দ্র ঘোষ, উপক্রমণিকা
৪. জাতক (২য় খণ্ড) ঈশানচন্দ্র ঘোষ, ভূমিকা
৫. বিনয়পিটক – চুল্লবগ্‌গ – ৩.৩৩
৬. Pali Literature and Language – Wilhelm Geiger, P.I. ("Pali however cannot be directly derived from Sanskrit, for it shows a number of characteristic features which suggest its closer relation to Vedic.")
৭. 'The Origin and Development of Bengali Language – by Dr. Suniti Kumar Chatterjee, p – 57.

সহায়ক গ্রন্থসমূহ : -
১। রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ) ১১শ খণ্ড, বিশ্বভারতী।
২। ঈশানচন্দ্র ঘোষ, জাতকমঞ্জরী, কলিকাতা।
৩। ঈশানচন্দ্র ঘোষ – জাতক (২য় খণ্ড), কলিকাতা।
৪। চারুচন্দ্র বসু (অনুবাদক ও প্রকাশক) – ধর্মপদ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা ১৯০৪।
৫। বিধুশেখর শাস্ত্রী – পালিপ্রকাশ, কলিকাতা ১৯১১।
৬। Suniti Kumar Chatterjee – The Origin and Development of Bengali Language, C. U. Press, 1926.
৭। Geiger, Wilhelm – Pali Literature and language, Translate into English by Bata Krishna Ghosh, C. U. 1956.

....

তান্ত্রিক বৌদ্ধদর্শন : বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে

ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম

১

'তুমহে হি কিচ্চং আতপ্পং অক্খাতারো তথাগতা।
পটিপন্না পমোকখন্তি ঝয়িনো মারবন্ধনা।' (ধম্মপদ)

হ্যাঁ, গৌতম বুদ্ধই জীব-উদ্ধারের এক সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন। পরম জীবনের পথ প্রদর্শনই বুদ্ধের আমৃত্যু প্রয়াস। সে পথ কখনো মসৃন নয়; চড়াই-উৎরাই, উৎরোল-কলরোলের মধ্যদিয়েই তথাগত বুদ্ধ সর্বমানবের হিতসাধনা করেছেন। তাই তিনি ঈশ্বর তুল্য। তবে তিনি ঈশ্বর রূপে যতটা না, তার চাইতে বেশি পূজ্য সত্যের পথপ্রদর্শক রূপে। এই সত্য পথের পাথেয় হল – সকল পাপ কাজ থেকে বিরতি, কুশল কর্মের অনুষ্ঠান ও আপন চিত্তশুদ্ধি।

'সব্বপাপস্স অকরণং কুসলস্স উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপং এতং বুদ্ধানুশাসন।'

এক বৈপ্লবিক সংঘাতের পরিণতিই – সেই সত্য পথ। কী সেই সংঘাত? সামাজিক না রাষ্ট্রিক? না, দু-ই। দেখে নিতে হয় শুরুতে।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে আর্যদের ভারতে আগমন। তাঁরা ছিলেন অভিজাত সংস্কৃতির বাহক। সাহিত্য পিপাসু। আর্যদের নানাবিধ ইতিবাচক দিকের পাশাপাশি কতগুলো নেতিবাচক মনোভঙ্গির ফলে এক সামাজিক উপপ্লব তরান্বিত হয়েছিল সেদিন। আর্য-প্রবর্তিত বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতি এক সময় সারা ভারতে প্রসার লাভ করেছিল। তাদের আচার-প্রথা-রীতি-নীতির ফলে ভারতে শূদ্র শ্রেণির উত্থান। এরই পাশাপাশি যাক্যজ্ঞের সুষ্ঠ নির্বাহের প্রেক্ষিতে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির উদ্ভব – ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ও শূদ্রদের অসহায়ত্বের এক সমান্তরাল বিন্যাস – সেদিন জনমানসে বিপুল ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল।

আর্যদের আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল সারা ভারত জুড়ে। তাই ভারতের বিভিন্ন অংশে অচিরেই এক সামাজিক সংঘাত ঘনিয়ে আসে। উত্তর ভারতে দশটি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রবল বিরুদ্ধাচারণে তৎপর হয়। তাদের মতে, হিন্দুধর্ম ভোগবাদী। তাই ব্রাহ্মণ্য সমাজের এই ভোগবাদিতার বিরুদ্ধাচারণের প্রতিকল্পে কৃচ্ছ সাধনার পন্থাকেই বেছে নিলেন তারা। সারা ভারতে শেষাবধি দু'টি সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপ্রতীপে গিয়ে টিকে রইল। একটি মহাবীর বা নিগ্রহ সম্প্রদায়, অপরটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদ বা আর্যধর্মের প্রতিবাদী ধর্ম হিসাবেই বৌদ্ধধর্মের আত্মপ্রকাশ। বৌদ্ধধর্মের

সামাজিকতা ও নৈতিকতা সেই যুগের প্রেক্ষিতে একপ্রকার নবজাগরণই বলা যায়। ব্যক্তি চরিত্র নির্মাণ ও আত্মশুদ্ধির নিরিখে বৌদ্ধধর্ম সর্বব্যাপকতা লাভ করে অচিরেই।

২

প্রথমেই বৌদ্ধ সাহিত্যের উৎস সন্ধানে রত হই। পালি ভাষায় রচিত 'ত্রিপিটক'ই বৌদ্ধতত্ত্ব ও দর্শনের এক নির্ভেজাল আকর গ্রন্থ। 'ত্রিপিটক' – তিনটি 'পিটক'-এর সমাহার। 'পিটক' অর্থ – "ঝাঁপি' (Basket)। তিনটি 'পিটক' – বিনয় পিটক, সূত্ত পিটক ও অভিধম্ম পিটক। ক) বিনয় (=আচার) পিটকে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচার-আচরণ সম্পর্কিত নানান বিধি লিপিবদ্ধ। খ) সূত্ত (=সংক্ষিপ্ত বচন) পিটকে ভগবান বুদ্ধের উপদেশাবলি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত। এর পাঁচটি 'নিকায়' (বিভাগ) আছে। দীঘনিকায় - সূত্র সংখ্যা ৩৪, মঝঝিম নিকায় – ১৫২টি সূত্র, সংযুক্ত নিকায় – ৫টি বর্গ ও ১১টি গুচ্ছে বিভক্ত। অঙ্গুত্তর নিকায় – ২৩০টি সূত্র, খুদ্দক নিকায় – নির্বাণের প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক আলোচনা আছে। এই নিকায়েরই অন্তর্ভুক্ত হল 'ধম্মপদ'।

উপনিষদের মধ্যেই কী ত্রিপিটকের বীজ নিহিত? – এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। M. Hariyanna তাঁর 'Outlines of Indian Philosophy' গ্রন্থে লিখেছেন: 'Upanisadic speculation may in a sense be regarded as having prepared the way for the peculiar teaching of Buddhism'. (p.135) হ্যাঁ, বুদ্ধ যেমন ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন, উপনিষদেও তেমনি সগুণ ঈশ্বর স্বীকৃত হয়নি। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'আত্মা' নির্গুণ, তেমনি বুদ্ধও দ্রব্য আত্মাকে অস্বীকার করেছেন। উপনিষদের মতই বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদের ভূমিকা প্রাধান্য লাভ করেছে। তাই উপনিষদের গর্ভেই ত্রিপিটকের ভ্রূণ।

বৌদ্ধদর্শনের মৌল উপজীব্য – মানবজীবনের দুঃখ-শোক-জরা-ব্যাধি থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তিলাভ। বুদ্ধদেবের চারটি মহান সত্য – 'চত্বারি আর্য সত্যানি' – চতুরার্য সত্য – (Four noble truth) হল :

১. দুঃখ – জীবন দুঃখময়।
২. দুঃখ সমুদয় – দুঃখের কারণ আছে।
৩. দুঃখ নিরোধ – দুঃখ নিবৃত্তি বা নির্বাণ সম্ভব।
৪. দুঃখ নিরোধ-মার্গ – দুঃখ নিবৃত্তির উপায় বা মার্গ আছে।

হ্যাঁ, জীবনে দুঃখ আছে তেমনি দুঃখ মুক্তির উপায়ও আছে। যাকে বলা যেতে পারে – 'ill and the ending of ill'। দুঃখের মৌল কারণ অনুসন্ধান করে সেগুলি রোধ করতে পারলে জরা মরণের কবল থেকে মানুষ মুক্ত হতে পারে। বুদ্ধ বলেছেন, পূর্ব জীবন বর্তমান জীবনের কারণ, আবার বর্তমান জীবন পুনর্জীবনের কারণ। মানবজীবন পূর্ব থেকে বর্তমান

এবং বর্তমান থেকে পরজীবনের দিকেই আবর্তিত। 'দুঃখ' থেকে 'অবিদ্যা' পর্যন্ত কার্যকারণ শৃঙ্খলকে বৌদ্ধদর্শনে বলা হয় 'দ্বাদশ নিদান'। এর মধ্যদিয়েই মানবজীবন অগ্রসরমান। কার্যকারণ পরম্পরায় দুঃখের কারণকে এভাবেই দেখিয়েছেন বুদ্ধ:

ক. পূর্বজন্ম – অবিদ্যা, সংস্কার।

খ. বর্তমান জন্ম – বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান।

গ. ভবিষ্যৎ জন্ম – ভব, জাতি, জরামরণ।

শেষাবধি তিনি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' এর মধ্যদিয়েই দুঃখ মুক্তির পরম পথের সন্ধান দিয়েছেন।

৩

গৌতম বুদ্ধের মত ও পথ নতুন করে উগ্‌রানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বলবার এই যে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর মতাদর্শগত বিরোধে বৌদ্ধ সংঘে ফাটল – ব্যক্তির নিজস্ব কল্যাণ এবং সার্বিক মঙ্গলের নিরিখে হীনযান-মহাযান, রক্ষণশীল – প্রতিক্রিয়াশীল, থেরবাদী – মহাসাংঘিক – ইত্যাকার বিভাজনের ফলে তন্ত্র-মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল, হটযোগ-গুহ্যযোগের আবির্ভাব এবং মন্ত্রযানের উদ্ভব। ফলশ্রুতিতে বাংলার প্রথম ফলিত সাহিত্য সমূহ (চর্যাপদ, ডাকার্ণব, দোহাকোষ) এবং পরবর্তী ধর্মীয় সাহিত্যে তন্ত্র-মন্ত্রের গুপ্ত প্রবাহ।

কালগত দিক থেকে মহাযান বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রমণ্ডিত হয়ে পড়ে অষ্টম ও নবম শতকে। এবং দশম শতক থেকেই বৌদ্ধধর্মে গুহ্য সাধনা ও তন্ত্র প্রসার লাভ করে। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা আনয়নের উৎস নির্ণয়ে নানা মুনির নানা মত। ক. যোগাচার মতের প্রবর্তক অসঙ্গই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা আনয়ন করেন। ভারতের বিশাল কৌম্য সমাজকে বৌদ্ধসীমার মধ্যে অঙ্গীভূত করতে আসঙ্গই নাকি ভুত-প্রেত, যক্ষ-রক্ষ, যোগিনী-ডাকিনী, পিশাচ, গুহ্য, মন্ত্র, যন্ত্র, ধারণী (গুঢ়ার্থ অক্ষর) – প্রভৃতি মহাযান ধর্মে স্থান দিয়েছিলেন। (নীহাররঞ্জন রায় : বঙ্গালীর ইতিহাস : ৫২৫)। খ. মাধ্যমিক মতবাদের প্রবর্তক নাগার্জুন এবং গ. তৃতীয় মতটি হল : গৌতম বুদ্ধ নিজেই বৌদ্ধধর্মে সাধারণীকরণের জন্য তন্ত্র-মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল, ঝাঁড়-ফুঁক, জাদুবিদ্যাকে স্থান দিয়েছিলেন। যাঁরা শেষোক্ত মতের পরিপোষক তাঁরা বুদ্ধের চার 'ঋদ্ধি'তে (সাধকের অলৌকিক শক্তি) বিশ্বাস এবং 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে (বুদ্ধের মৃত্যুর চোদ্দ'শ বছর পর রচিত) তন্ত্র-মন্ত্র ব্যবহারে বুদ্ধের অনুমতির সাপেক্ষে তাদের যুক্তি প্রদর্শন করেন (শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা; অনুবাদক – গোপীমোহন সিংহ রায় : ভারবি : ১৯৯৬ : ২২)। তবে এই মত খুব জোরালো যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কেননা, 'বুদ্ধের সময়েও তান্ত্রিক আচারের, এমনকি মৈথুন সাধনপ্রণালীর প্রচলন থাকলেও যে বুদ্ধ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, তিনি যে শুধু নিজের ধর্মকে সহজ সাধ্য করার জন্য তান্ত্রিকতা প্রবর্তন করেছিলেন, সে কথা শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয় না।' (শশিভূষণ : ঐ : ২২)।

তবে এটুকু নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, আদিম কৌম্য সমাজের জাদুবিশ্বাস থেকেই উদ্ভূত হয়েছে বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতা – গুহ্য, মন্ত্র, মণ্ডল, ধারণী, বীজ – ইত্যাকার বিষয়। (নীহারঞ্জন রায় : ঐ : ৫২৫)। সেই সঙ্গে বিচিত্র ধর্মবিশ্বাসের বিমিশ্রণও। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত এ প্রসঙ্গে সর্বৈব সত্য কথা বলেছেন : 'বিচিত্র ধর্ম বিশ্বাসের বিভিন্নমুখী প্রবাহ, অসংখ্য দেবতা-উপদেবতা, যক্ষ-রক্ষ, ভূত-প্রেত, হঠযোগ, রাজযোগ-লয়যোগ-মন্ত্রযোগ – প্রভৃতি ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের উন্মুক্ত দ্বারপ্রান্তে প্রবেশ করে এবং এইভাবেই বিনয়-ধ্যানপ্রধান ভিক্ষুধর্ম ক্রমে বিমিশ্র তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে রূপান্তরিত হয়ে গেল'। (শশিভূষণ : ঐ : ২২ / ২৩)।

ব্যাপারটা তাহলে এই রকম দাঁড়ালো : খ্রিস্ট্রীয় অষ্টম ও নবম শতকে তন্ত্রবাদের প্রাধান্যের ফলে মন্ত্র-তন্ত্র, মুদ্রা-মণ্ডল-ইত্যাকার তান্ত্রিক ক্রিয়াকর্ম মহাযানী বৌদ্ধধর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়। এই মন্ত্রশক্তি (শব্দশক্তি), মুদ্রাশক্তি (স্পর্শশক্তি), মণ্ডলশক্তি (চক্রশক্তি) এবং গুহ্যশক্তি (নারী-পুরুষের অদ্বয় শক্তি) সম্পৃক্ত ধর্মই মন্ত্রযান হিসাবে পরিণতি পায়। এই শ্রেণির বৌদ্ধ আচার্যের কাছে 'মন্ত্রই হইল ... মূল প্রেরণা এবং মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ধারণী ও বীজ। ইঁহাদের রচিত নয়ই – মন্ত্র নয়, ইঁহাদের প্রদর্শিত যান বা পথই মন্ত্রযান। এই মন্ত্রযানই মহাযানের বিবর্তনের প্রথম স্তর। (নীহাররঞ্জন রায় : ঐ : ৫২৬)। এই স্তরে মন্ত্র-মুদ্রা-মণ্ডল-অভিষেকের পাশাপাশি গুহ্যযোগের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ গুহ্যযোগই হয়ে ওঠে মহাসুখ লাভের পরম পন্থা। এর ফলেই তন্ত্রসাধনা – বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান – তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বজ্রযান পূর্ববঙ্গে, সহজযান রাঢ়বঙ্গে এবং কালচক্রযান নেপাল-তিব্বতে প্রসার লাভ করে। এই তিন যানেরই মৌল অবলম্বন যোগ সাধনা এবং এর মৌল ভিত্তি যোগাচার ও মাধ্যমিক দর্শন। এই ত্রি-যানপন্থী বাঙালি সিদ্ধাচার্যদের হাতেই রচিত হয় তন্ত্রপ্রধান বাংলার প্রাথমিক সাহিত্যসমূহ।

৪

এবার যোগসাধনা ও তন্ত্রসাধনার বিবর্তনের দিকে মোড় ফেরাই। তন্ত্র-মন্ত্রের ধারাবাহিক বিবর্তনের সুগঠিত ইতিহাস আজও অধরা। তবে 'তন্ত্রশাস্ত্র' যে অতিপ্রাচীন, সে কথা বলাই বাহুল্য। 'বেদ'ই তার প্রমাণ। 'সায়ন ভাষ্যে' তন্ত্রের শ্লোক আছে। শঙ্করাচার্যের 'প্রপঞ্চসার তন্ত্র', 'আনন্দলহরী' – ইত্যাকার গ্রন্থের 'স্তব' অংশে তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকৃত।

শ্রুতির দ্বি-বিধ রূপ আমরা দেখি – বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। শ্রীকৃষ্ণ যে চৌষট্টিখান

অদ্বৈততন্ত্র ঋষি দুর্বাশার নিকট অধ্যয়ন করেছিলেন, হরিবংশে সে কথার উল্লেখ আছে। আর দুর্বাশাই যে কলিযুগে অদ্বৈততন্ত্রের প্রকাশক – একথা সুপ্রসিদ্ধ। এ প্রসঙ্গে 'তন্ত্ররশ্মি' গ্রন্থে আশুতোষ চৌধুরী লিখছেন : "বিখ্যাত ঋষিদের মধ্যে কেহ কেহ তান্ত্রিক মার্গের উপাসক, আবার কেহ কেহ তান্ত্রিক উপাসনার প্রবর্তক ছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মযামলে এবং জয়দ্রথ যামলে দধীচি, সনৎকুমার, দুর্বাশা, সনক, কশ্যপ, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক, ভৃগু প্রভৃতি ঋষি অগস্ত্য এবং তদীয় ধর্মপত্নী লোপামুদ্রা উচ্চকোটির বৈদিক ঋষি ছিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অগস্ত্য মেরুস্থিত শ্রীমাতার দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। পরে দেবীমাহাত্ম্য শ্রবণ পূর্বক শাক্তদীক্ষা গ্রহণের পর উভয়ে অতি উচ্চপর্যায়ের সিদ্ধিলাভ করেন।" (আশুতোষ চৌধুরী : তন্ত্ররশ্মি : যোগমায়া অশ্রম : লাবান : শিলং : ১৩৯৩ : ২)। অর্থাৎ তান্ত্রিকী দীক্ষাই মাতাদর্শনের মৌল চাবিকাঠি।

ভারতে বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে তান্ত্রিক সংস্কৃতির সমান্তরাল বিন্যাস চোখে পড়ে। তন্ত্রের দ্বি-বিধ মতাদর্শ – 'কাদি' ও 'হাদি' – বিশ্বের সর্বত্র প্রসার লাভ করে। বিশ্বব্যাপী তান্ত্রিক সংস্কৃতির আদান-প্রদান – সংস্কৃতি সমন্বয়ে ফলে তন্ত্র-মন্ত্র 'Time' ও 'Space' অতিক্রম করে বৈশ্বিক রূপ লাভ করেছে। আর এই তন্ত্রসংস্কৃতির উপজীব্য – মানবাত্মার মুক্তি – 'তনু' কে 'ত্রাণ' = তন্ত্র। তার জন্য প্রয়োজন সুপ্ত আত্মার জাগরণ। প্রত্যেক ধর্মেই তো এই জাগরণ – 'চরৈবেতি'র কথা বলে। তাই শৈব, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, নাথ – প্রত্যেক ধর্মেই একে একে তন্ত্রের আগম ঘটে। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের মিলনে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের মিশ্রণে বৈষ্ণব-তান্ত্রিক – সহজিয়া বৈষ্ণব, বাউল – ধর্মকে আপামর বাঙালি মেনে নিল শেষাবধি। উঠে এল এক নতুন দর্শন – কায়াসাধনাই আত্মমুক্তির পথ এবং যোগপন্থাই সেই পথের হদিশ।

এই যোগাচারের উপর ভিত্তি করেই বাংলাব নানান ধর্মমতের উদ্ভব। সকল ধর্মের ভিত্তিমূলে যোগধর্মই বর্তমান। কেননা, যোগই এক চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। সেই সত্যের মূল কথা – চিত্তবৃত্তির নিরোধ – চিত্তচাঞ্চল্যকে বিনাশ ও নিবারণ করে দেহ ও মনের সুস্থিরতা দান। দেহ ও আত্মাকে শান্ত সমাহিত করে চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত করার মধ্যেই নিহিত থাকে মানবের মুক্তি। 'যোগপন্থা' সেই পথের সন্ধান দেয় মানুষকে। যোগশাস্ত্রের দু'টি মৌল উপাদান 'দেহ' ও 'মন'। আটটি উপাদানের সমন্বয়ে তা গড়ে ওঠে

১. দেহঘটিত উপাদান পাঁচটি – যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার।
এগুলি অনুশীলন সাপেক্ষ।

২. মনঘটিত উপাদান তিনটি – ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

সাধক একাগ্রচিত্তে 'সমাধি' স্তরেই উন্নীত হতে চায়। এই স্তরে পৌঁছালেই সাধক

অধ্যাত্মমার্গে উন্নীত হবে। তখন দূরীভূত হবে জাগতিক বন্ধন।

সাধনা আসলে মনোরসায়নগত পদ্ধতি (psycho-chemical process) ছাড়া আর কিছুই নয়। আর যোগের বীজকথন হল – রসসমীক্ষণ। কায়াসাধনা ছাড়া রসসমীক্ষণ কখনই সম্ভব নয়। তাই তন্ত্রে কায়ারই প্রাধান্য স্বীকৃত।

ভারতবর্ষে কায়াসাধনার ইতিহাস অতি প্রাচীন। প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষে যে এই যোগসাধনা বিদ্যমান ছিল, তার ভূরিভূরি প্রমাণ পাওয়া গেছে। খ্রিস্টপূর্ব মহেঞ্জোদারোতে যোগীর শীল ও মূর্তি পাওয়া গেছে। আবার ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণ ও সংহিতাতে অস্ফুটভাবে যোগের প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ আছে (রমণ শাস্ত্রী)। পঞ্চানন মণ্ডল মনে করেন, অথর্ববেদ, উপনিষদ – সর্বত্রই যোগসাধনা বিদ্যমান ছিল। এমনকি রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতেও যোগের প্রসঙ্গ দুর্লক্ষ্য নয়। মহাভারতে ব্যাসদেব যোগবলে সমস্ত সন্তানকে ধৃতরাষ্ট্রের সামনে হাজির করেছিলেন। এছাড়া সনৎকুমার, নারদের ঘটনা এবং বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনাবলী প্রমাণ করে যে, তখন যোগধর্ম বিদ্যমান ছিল। 'গীতা'তেও শ্রীকৃষ্ণ যোগবলেই বলীয়ান।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজাণ্ডার ভারতে এসে বিসদৃশ অদ্ভুদ যোগী দেখেছিলেন। মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে সে কথা স্বীকৃত। আবার হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে ছাইমাখা সন্ন্যাসী, ব্রাহ্মণযোগী ও শমন যোগীর প্রসঙ্গ আছে। শ্রদ্ধেয় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাই স্বীকার করেন : ভারতবর্ষের মূল শিকড় যোগাচারের মধ্যেই প্রোথিত (দ্র : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, ১ম পর্ব)।

যোগাচার সম্পর্কিত দ্বি-বিধ মত প্রতিষ্ঠিত। ক. বেদের মত, খ. লৌকিক মত। শিবের তাই দু'ই মূর্তিই আমরা দেখি – আর্যদেবতা শিব ও অনার্য দেবতা শিব। ভারতের শৈব, তন্ত্র, গুহ্য, নাথ, শাক্ত – প্রভৃতি মতের ভিত্তিভূমি বৈদিক ও লৌকিক যোগাচারই। এরই মধ্যে নিহিত আছে –

১. হিন্দুধর্মের – শৈব ও সৃষ্টিতত্ত্ব।

২. বৌদ্ধধর্মের – প্রজ্ঞাতত্ত্ব ও উপায়তত্ত্ব।

তাই শিব ও বুদ্ধ একাকার হয়ে যায় যেন। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন যথার্থই বলেন : শিব পরিবর্তিত হল বুদ্ধে এবং বুদ্ধ পরিবর্তিত হল শিবে।

আবার খ্রিস্টধর্মকেও শৈবধর্মের সঙ্গে একীভূত করার চেষ্টা দেখা গেছে। স্বামী অভেদানন্দ 'অজানা যীশু' (The unknown life of Jesus') গ্রন্থে যীশুকে শিবের পুত্র হিসাবেই দেখেছেন। লিখছেন, শিবের পুত্র যীশু এবং মা মেরী হলেন একজন শৈব সিদ্ধাচার্য। যীশুর পিতা কোনো শৈব যোগীর সন্তান। খ্রিস্টধর্মের মূলে তাই শৈবধর্ম

নাম দেওয়া হয়েছে।
অনুভূতির দিক দিয়ে প্রথমানন্দ, পরমানন্দ, বিরমানন্দ ও সহজানন্দ নাম দেওয়া হয়েছে। সে ক্রমশঃ চঞ্চল

নৈরাত্মা দেবীর সঙ্গে বজ্রচিত্তের মিলনে বোধিচিত্তের জন্ম হয়। সে ক্রমশ নির্মাণকায়ে নেমে আসে এবং জাগতিক ও অস্থির হয়ে ওঠে। সহজকায় থেকে সে ক্রমশ নির্মাণকায়ে নেমে আসে এবং জাগতিক বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। সহজকায় থেকে ধর্মকায়ে নামলে পঞ্চাকার বন্ধন, ধর্মকায় থেকে সম্ভোগকায়ে গেলে বিংশত্যাকার বন্ধন এবং সম্ভোগকায় থেকে নির্মাণকায়ে নামলে মায়াজাল বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। এটাকে বলা হয় উৎপত্তি ক্রম বা সংসার গতি। সাধকের অভীষ্ট সংসার গতি থেকে সহজগতিতে উত্তীর্ণ হওয়া। অর্থাৎ উৎপন্ন ক্রমেই বোধিচিত্তের উর্ধ্বায়ন ঘটানো। তখনই জাগতিক বন্ধন একে একে দূরীভূত হবে। চর্যাপদের ৩৩ নং গানে এ হেন পদ্ধতিতে সহজ মহাসুখ লাভের পন্থা দ্ব্যর্থক ভাষায় প্রকাশিত –

'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশি
হাঁড়িত ভাত নাই নিতি আবেশি।'

শুধু চর্যাপদে নয়; নাথ সাহিত্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্যও ইসলামী কেন্দ্র সাহিত্যে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রভাব অবিসংবাদিত। সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের সাধনতত্ত্ব, পরমতত্ত্বের সঙ্গে নাথধর্মের সাজুয্য চোখে পড়ে। সহজিয়াদের অভীষ্ট নিরঞ্জন তত্ত্বে পৌঁছানো, নাথযোগীদেরও তাই। নাথরাও বৌদ্ধদের মতো গুরুবাদী। নাথ শাস্ত্রে আছে – 'গুরুপদিষ্ট মার্গেণ যোগমেব সমভ্যসেৎ'। নাথযোগী মীননাথের পতনের মূল কারণ 'ভুলিলা গুরুর বাক্য কামে হইল ভুলা'। তাই গোর্খনাথ গুরুর চৈতন্য সম্পাদনে গুরুবাক্যেরই আশ্রয় নেন :

'মীনের কানে কহিলেক গুরুর বচন
ভ্রম দূর হইয়া মীন হইল চেতন।'

ড. সুকুমার সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতরা ধর্মঠাকুরের কল্পনার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অবশেষকে খুঁজে পান। সুকুমার সেন তো ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ দেবতাই বলেছেন। চর্যাপদের গানের সঙ্গে নাথসাহিত্যের অনিলপুরাণের ছড়ার কোথাও কোথাও হবহু সাদৃশ্য চোখে পড়ে :

'দুলি দুহি পিঠা ধারণ ন যাঅ
রুখেরে তিন্তিলি কুম্ভিরে খাঅ' (চর্যাপদ – ২ নং গান)

তেমনি :

'পুতুকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায়
তালগাছে শোলের পোনা শিয়াল ধরিয়া খায়।' (অনিল পুরাণ)

গাছের তেঁতুল কুমিরে খাওয়া এবং শোলমাছের বাচ্চা কর্তৃক শিয়াল ভক্ষণের মধ্যেই দ্বৈত অর্থে সাধকের সহজ মহাসুখ লাভের কথাই বলা হয়েছে। আবার, 'ধর্মপূজাবিধান' এ

ধর্মঠাকুরকে রূপ-দেহ-কায়হীন 'নিরঞ্জন' বলা হয়েছে –

'নাস্তি রূপং নাস্তি দেহং নাস্তি কায়ো নিদানং
নাস্তি জন্ম নাস্তি মূর্তিস্তস্মৈ শ্রী ধর্মায় নমঃ' (ধর্মপূজাবিধান)

অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মে সর্বশূন্যতত্ত্বের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের মিল সহজেই লক্ষ্যণীয়।

একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে, বাংলার বৈষ্ণবধর্ম সহজিয়া বৌদ্ধধর্মেরই উত্তরাধিকার। আগেই বলা হয়েছে তান্ত্রিক বৌদ্ধরা বুদ্ধের চারটি 'কায়'-এর কল্পনা করেছেন – নির্মাণকায়, সম্ভোগকায়, ধর্মকায়, সহজকায়। তেমনি বৈষ্ণবরাও 'সহজ মানুষ' এর তিনটি দেহকে স্বীকার করেন। ক. সহজ মানুষ – কৃষ্ণ, খ. অযোনি মানুষ – ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব প্রমুখ দেবতা এবং গ. সংস্কারা মানুষ – মর্ত্যের মানব। বৌদ্ধদের 'সহজ' তত্ত্বের মতোই বৈষ্ণবদেরও পরমতত্ত্ব – 'সহজমানুষ'। বৌদ্ধদের মতে এটি যেমন প্রজ্ঞা-উপায় ও শূন্যতা-করুণার যোগফল, তেমনি বৈষ্ণবদের মতে এটি রাধা ও কৃষ্ণের যুগলদ্ধ ফল।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে ইসলামধর্মের যোগ ছিল সুদূর অতীতেই। মুসলিম সাহিত্য চেতনায় বৌদ্ধধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাবও অস্বীকার করার নয়। ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. তারাচাঁদ প্রমুখ পণ্ডিতরা একথা স্বীকারও করেছেন। বিশেষত চট্টগ্রামের আরাকান রাজসভার কবিরা বৌদ্ধতত্ত্বে কিছুটা পুষ্ট ছিলেন, একথা বলাই যায়। তুর্কী আক্রমণোত্তর বিপর্যস্ত বাংলায় যে সংস্কৃতি সমন্বয় হয়েছিল তাতেই অনেক বৌদ্ধ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। আর আরাকানের রোসাঙ রাজারা যে বুদ্ধাচারে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেকথা দৌলত কাজীর লেখনীতে ধরা পড়ে

'তাহাতে মগধ বংশ ক্রমে বুদ্ধাচার
নাম শ্রী সুধর্ম রাজা ধর্ম অবতার।'

এখানকার 'চাটিগঙ' যেমন 'পীরের মোকাম', তেমনি একদা বৌদ্ধধর্মচর্চার কেন্দ্রও ছিল। আর জলজঙ্গল অধ্যুষিত এই জঙ্গলের দরিয়ার পাঁচ পীরের অন্যতম পীর 'বদর' – নামের সঙ্গে বৌদ্ধ 'বজ্র'-এর মিল সহজেই চোখে পড়ে। বজ্র > বজর > বদর – এই ধ্বনি রূপান্তরও এড়িয়ে যাওয়ার নয়।

মহাযান বৌদ্ধদের শূন্যতত্ত্ব কল্পনার সঙ্গে ইসলামধর্মের নিরাকার ঈশ্বরকল্পনার সহজ সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়। 'আল্লাহ' নিঃসন্দেহে 'নিরাকার', 'নিরঞ্জন'। দৌলত কাজী লিখছেন :

'অনুপম নীরূপ নীরেখ নিরাকার
ত্রিভুবনে নাহি কেহ সমান তাহার।' (লোরচন্দ্রানী)

'তত্ত্বরত্নাবলী'তে বলা হয়েছে –

'নিস্প্রপঞ্চো নিরাভাসো ধর্মকায়ো মহামুনেঃ।

রূপ কায়ৌ তদুদ্ভূতৌ পৃষ্ঠে মায়েব নিষ্ঠতে।।' (অদ্বয় সংগ্রহ)

এই চেতনা অবশ্যই ইসলামপ্রসূত।

সহজিয়া বৌদ্ধদের শূন্যতত্ত্ব, গুরুবাদ ও কায়াসাধনা বাঙালি মুসলমান কবিদের কাব্যেও প্রতিফলিত :

'নামশূন্য কামশূন্য শূন্য যার স্থিতি।
সে শূন্যের সঙ্গে করে ফকীর পিরীতি।।' (আলী রাজা : জ্ঞানসাগর)

আর বাউল ধর্ম তো বৌদ্ধসহজিয়াদেরই এক সম্প্রসারণ। 'মনের মানুষ' এর অন্বেষণের জন্য কোনো জাত লাগে না। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-শাক্ত-বৈষ্ণব- যারা 'প্রাণের সহজ ধর্ম' কে স্বীকার করেন, তারাই বাউল। বাউলরা 'বায়ুগ্রস্ত' 'পাগল'– পরমতত্ত্বের 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ' এর জন্যই তাদের ব্যাকুলতা, উদাসীনতা। বৌদ্ধদের মতই বাউলরা কায়াসাধক – 'সকল জীবের ঘটে আছে মানুষ বস্তু একজনা'। সাংকেতিক ভাষায় বাউলরা তাদের সাধনপন্থাকে তুলে ধরেন এভাবে :

'গাই বিয়ালো মধ্যগাঙে কুমীর বিয়ালো চরে।
দাঁরকার পোনামাছ সেই কুমীরে ধরে।'

গাছের তেঁতুল কুমিরে খাওয়া, শোলমাছের শিয়ালভক্ষণ এবং পোনামাছের কুমির ভক্ষণ – এহেন বিপ্রতীপ ধারণার অনুবন্ধে কায়াসাধনার কথাই ব্যক্ত হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে, নাভিতে বোধিচিত্ত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সাধকের কাজ হলো বোধিচিত্তকে জাগানো। এবং ক্রমশঃ তাকে উষ্ণীষে উন্নীত করা। এর জন্য ঈড়া ও পিঙ্গলাকে একমুখী করতে হয় – যা বোধিচিত্তকে ক্রমাগত আঘাত করবে। সেখান থেকেই মধু বা অমৃতরস বোধিচক্রে পড়বে। সাধক তখনই বাহ্যিক জগৎকে ভুলে যাবে এবং এক ব্রহ্ম-আস্বাদ লাভ করবে। তান্ত্রিকমতে যা প্রকৃত দেবীর আস্বাদ, নাথ মতে তা অমৃতের আস্বাদ, বাউল মতে তা অচিন পাখির বেড়িবন্ধন। এসবই তো বৌদ্ধ সাধনপ্রণালীর বিমিশ্র রূপ।

এই বৌদ্ধসাধনার সঙ্গে হিন্দু-সাধনার সাদৃশ্য সহজেই অনুভব করা যায়। ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত যথার্থই বলেছেন : "বৌদ্ধতন্ত্রের প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলিত সাধনা হিন্দুতন্ত্রে শিব-শক্তির মিলিত সাধনার অনুরূপ। তন্ত্রানুযায়ী মানবের দেহেই ব্রহ্মাণ্ডের সকল সত্য নিহিত – এ তত্ত্ব তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্ঞা ও উপায় মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে দুইটি প্রধান নাড়ীর সঙ্গে অভিন্ন বলে কল্পিত হয়। হিন্দু তন্ত্রের এই দু'টি নাড়ী ইড়া-পিঙ্গলা নামে প্রসিদ্ধ, বৌদ্ধতন্ত্রে এরা প্রজ্ঞা-উপায়, আলি-কালি, গঙ্গা-যমুনা, চন্দ্র-সূর্য, বাম-দক্ষিণ, স্বর-ব্যঞ্জন, এ-কার ও বং কার, চমন-ধমন প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। হিন্দুতন্ত্রের

সুষুম্না নামক মধ্যবর্তী নাড়ী বৌদ্ধতন্ত্রে অবধূতিকা নামে অভিহিত। অবধূতিকার মধ্যদিয়ে বোধিচিত্ত নাভিপদ্মে অবস্থিত নির্মাণচক্র (নির্মাণকায়) থেকে হৃদয়স্থিত ধর্মচক্র (ধর্মকায়), সেখান থেকে কণ্ঠোস্থিত সম্ভোগচক্রে (সম্ভোগকায়), তৎপরে মস্তকস্থিত উষ্ণীষকমল বা মহাসুখ চক্রে গমন করে মহাসুখ দান করে।" (শশিভূষণ : ঐ : ২৪)। এসব তো চিত্তশুদ্ধতারই এক পন্থা। বৌদ্ধধর্মে এই চিত্তশুদ্ধতাই সর্বাধিক প্রাধান্য পেয়েছে। বৌদ্ধদর্শনে আধ্যাত্মিক অগ্রগতির তিনটি পর্যায় কল্পনা করা হয়েছে – শীল (চারিত্রিক শুদ্ধতা), সমাধি (মনঃসংযোগ) এবং প্রজ্ঞা (তত্ত্বজ্ঞান)। এই তিনটিই সম্পৃক্ত বন্ধনে আবদ্ধ। কেননা, চারিত্রিক শুদ্ধতার মধ্যদিয়েই আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সূচনা এবং সমাধি পর্যায়ের মধ্যদিয়ে যাত্রা করে প্রজ্ঞাতেই এই অগ্রগতির শুভ পরিসমাপ্তি ঘটে। তখনই সাধক অধ্যাত্ম সাধনার কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করে। বৌদ্ধধর্ম তাই 'শীলভিত্তিক' ধর্ম।

হিন্দুধর্মের প্রবল প্রতিবাদী হিসাবেই বৌদ্ধধর্মের উত্থান হলেও হিন্দুধর্মের কতিপয় মৌল ধারণা ও সাধনপন্থা বৌদ্ধধর্মে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তীকালে শাক্ত-বৈষ্ণব-নাথ-বাউল প্রত্যেক ধর্ম ও ধর্মসম্পৃক্ত সাহিত্যে বৌদ্ধদর্শন-তন্ত্র-যোগের অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এককথায় বাঙালি জীবন ও সাহিত্য তন্ত্রবাদ ও যোগাচারের মিশ্রণেই সমৃদ্ধ। আজও তা বহমান।

গ্রন্থঋণ :

১. ড. শশিভূষণ দাশগুপ্ত : বাংলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা। বাংলা সাহিত্যে গুহ্য সাধনার ধারা। মর্মানুবাদ – গোপীমোহন সিংহ রায়। ভারবি : কলকাতা : ১৯৯৬।।
২. ড. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস। আদিপর্ব। দে'জ্ কলকাতা। সপ্তম সংস্করণ : ১৪১৬।
৩. আশুতোষ চৌধুরী : তন্ত্ররশ্মি। যোগমায়া আশ্রম : লাবান : শিলং। ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।
৪. ড. সমরেন্দ্র ভট্টাচার্য : ভারতীয় দর্শন। বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা। তৃতীয় সংস্করণ : : ২০০৯।
৫. দীপক কুমার বাগচী : ভারতীয় দর্শন। প্রগতিশীল প্রকাশক : কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ : ২০০৫।
৬. হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় : গৌতম বুদ্ধের দার্শনিক চিন্তা। ধম্মপদ : দ্বিতীয় সংস্করণ। হরফ : ১৯৮৮।
৭. অমিতা চ্যাটার্জী (সম্পাদিত): ভারতীয় ধর্মনীতি। যাদবপুর দর্শন গ্রন্থমালা : দ্বিতীয় সিরিজ। এলাইড পাবলিকেশন লিমিটেড : যাদবপুর :

কলকাতা।
৮. জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী : চর্যাগীতির ভূমিকা। ডি.এম. লাইব্রেরি : কলকাতা। পুনর্মুদ্রণ : ২০০৫।
৯. বার্টাণ্ড রাসেল : ধর্ম ও বিজ্ঞান। অনুবাদক – সুরেশ কুণ্ডু। র‍্যাডিক্যাল : কলকাতা। তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১২।
১০. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড।
১১. অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : বৌদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম।
১২. শ্রীমন্তকুমার জানা : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড : কলিকাতা। পুনর্মুদ্রণ : জুলাই ২০০৪।

বিশেষ কৃতজ্ঞতা :

১. শম্পা চৌধুরী, অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
২. দীপান্বিতা ঘোষ, অধ্যাপিকা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. আদিত্যকুমার লালা, অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়। (বর্তমানে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন)।

....

বৌদ্ধসাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতি

সুশোভন চ্যাটার্জি

রামায়ণ ও মহাভারতের পর লৌকিক সংস্কৃতে কাব্যের প্রথম উন্মেষ কখন ঘটেছিল-তা সুনিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন। কারোর মতে কালিদাসের লেখনীস্পর্শে কাব্য পুনরায় তার গরিমা ফিরে পায়। প্রাক্-কালিদাসীয় যুগে সংস্কৃত কাব্যের শ্রীবৃদ্ধির তেমন কোনো প্রমাণ না থাকায় অনেকে সেই সময় অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকেন। সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা কখনই অবরুদ্ধ হয়নি। তবে তার গতি যে শ্লথ হয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সংস্কৃত হিন্দু-ধর্মের ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ক্রমাবনতি ঘটলো বুদ্ধের আবির্ভাবে ও বৌদ্ধ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে সংস্কৃত ভাষারও অবনতি ঘটে। এ সময়ে হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের উদার দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শে সর্বস্তরের মানুষ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। নানাভাবে পালি বা প্রাকৃত ভাষায় বুদ্ধের বাণী প্রচারিত হতে থাকে। কেউ কেউ মনে করেন যে এই সময় প্রাকৃত ভাষার রচনাই সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। কিন্তু তা বলে সংস্কৃত সাহিত্যের ধারা কখনই থেমে থাকেনি। পাশ্চাত্য বিদ্বান Buhler প্রমাণ করেছেন যে শিলালেখগুলি উন্নত মানের সংস্কৃত সাহিত্যেরই পরিচায়ক। অপর দিকে রাজপ্রশস্তিমূলক অভিলেখগুলিকে কালিদাসপূর্ব যুগের সংস্কৃত কাব্যধারার ধারক ও বাহক বললে অত্যুক্তি হবে না। আবার সেই সময়কার রচনার মধ্যে তন্ত্রাখ্যায়িকা, ভাসের নাটকসমূহ, জাতক ও অবদান সাহিত্য প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত সাহিত্য কীর্তি। বর্তমানে আমরা অশ্বঘোষ ছাড়া কালিদাসপূর্ব যুগে অন্য কোনো কবির উল্লেখ করতে পারি না, নির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণের অভাববশতঃ। এ প্রসঙ্গে Keith বলেছেন- "It is, therefore, accident only which has preserved Buddhist work like those of Asvaghosa as the earliest specimens of kavya." বুদ্ধের জীবনী ও বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্বগুলি প্রচার করার জন্য যে অশ্বঘোষকে সংস্কৃত ভাষাকে আশ্রয় করে বুদ্ধচরিত ও সৌন্দরনন্দ এই দুটি কাব্য রচনা করতে হয়েছিল, তা সেই সময়ের সংস্কৃত ভাষার প্রচলনেরই উজ্জ্বল নিদর্শন। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে কালিদাসপূর্ব যুগে সমাজে বৌদ্ধসাহিত্যের প্রচার ও প্রসারের এক উন্মেষ দেখা যায়।

কালিদাসের পূর্বে মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা পালি ভাষা নয়। তা অংশত সংস্কৃত মাত্র। Senart এই ভাষাকে Mid-Sanskrit বলেছেন এবং Pischel-এর মতে সেটিই হল Gatha dialect. এই ভাষায় রচিত সাহিত্যকেই আমরা 'বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য' বলতে পারি। হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের অনেক রচনাকেও আমরা এর মধ্যে

গ্রহণ করতে পারি। এই ধরনের গ্রন্থগুলিতে দার্শনিক চিন্তাভাবনার উপস্থিতি বেশি পরিমাণে লক্ষ করা যায়।

এই শ্রেণির সাহিত্যের মধ্যে হীনযানপন্থী বৌদ্ধদের মহাবস্তু সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাদের মধ্যে সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অপর একটি গ্রন্থ হল ললিতবিস্তর। মহাযানপন্থী বৌদ্ধরাও এটিকে অতি পবিত্র গ্রন্থ বলে মনে করেন। অশ্বঘোষ তার বুদ্ধচরিতের অনেক উপাদান এখান থেকেই গ্রহণ করেছেন। বুদ্ধ ও তার শিষ্য শারিপুত্রের কথোপকথনকে অবলম্বন করে লেখা আর্যচন্দ্রের গ্রন্থটি হল মৈত্রেয়ব্যাকরণ বা মৈত্রেয়সমিতি। বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের মাহাত্ম্যা কীর্তন করে সেই সময়ে যে গ্রন্থগুলি লেখা হয়েছিল তার মধ্যে সদ্ধর্মপুণ্ডরীক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটিতে কালোচিত বিভিন্ন উপাদান রক্ষিত আছে। কারণ্ডব্যূহ, সুখাবতীব্যূহ, অক্ষোভ্যব্যূহ প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও একই উদ্দেশ্যে লেখা।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে অনেক মূল্যবান দার্শনিকগ্রন্থ বৌদ্ধরা রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতাগুলি অন্যতম। লঙ্কাবতার, সুবর্ণপ্রভাস, বুদ্ধাবতংসক, দশভূমক প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে নাগার্জুনের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তার মাধ্যমিককারিকা দর্শনশাস্ত্রের এক অমূল্য গ্রন্থ। আর্যদের নামে আর একজন বৌদ্ধ গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে চতুঃশতক নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যোগাচার সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা মৈত্রেয়নাথ অভিসময়ালঙ্কারকারিকা রচনা করেন। মৈত্রেয়নাথ শিষ্য আর্য অসঙ্গ যোগাচারভূমিশাস্ত্র রচনা করেন। বসুবন্ধু অসঙ্গ নামের আর একজন দার্শনিক সাংখ্যদর্শনের মতবাদ খণ্ডনের জন্য অভিধর্মকোষ ও পরমার্থসপ্ততি রচনা করেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে দিঙনাগ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রমাণসমুচ্চয় ও ন্যায়প্রবেশ।

প্রকৃতপক্ষে গৌতম বুদ্ধ কোনো গ্রন্থ রচনা করেননি। তার উপদেশ সমূহই যথাক্রমে বিনয়পিটক, সুত্তপিটক ও অভিধর্মপিটক – তিনটি গ্রন্থে সংকলিত ও বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি গ্রন্থকে একত্রে 'ত্রিপিটক' বলা হয়, যা বৌদ্ধদের কাছে ধর্মগ্রন্থ স্বরূপ এবং যাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বৌদ্ধদর্শন। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে পরবর্তি সময়ে বৌদ্ধসংস্কৃতির যে পল্লবায়িত রূপ আমরা দেখতে পাই তার শুভ সূচনা ঘটে বৌদ্ধদার্শনিকদের এই গ্রন্থগুলির মধ্যে।

কালিদাসের পূর্বে সংস্কৃত সাহিত্যে সর্বাধিক প্রথিতযশা বৌদ্ধ সাহিত্যিক হলেন অশ্বঘোষ। হিন্দুধর্মে জাতিভেদ ও নানারকম কুসংস্কারাচ্ছন্ন রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের উদারনৈতিক ধর্মাদর্শের প্রতি জনসাধারণ যখন প্রবলভাবে আকৃষ্ট, এমনি এক

যুগসন্ধিক্ষণে তাঁর আবির্ভাব। খুব স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সাহিত্যে সে সময়ের চিন্তাধারায় স্পষ্ট প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়। বিচার করে দেখলে অশ্বঘোষের রচনা ত্যাগ ও বৈরাগ্যের আদর্শে ধর্মীয় সাহিত্য প্রচারেরই নামান্তর মাত্র।

কবি সাহিত্যিক অশ্বঘোষ হলেন কুষাণ রাজ কণিষ্কের সমসাময়িক। নাগার্জুন, অশ্বঘোষ ও বসুমিত্র-এই তিন বৌদ্ধ লেখক কণিষ্কের স্মৃতির সাথে জড়িত বলে ভিনসেন্ট স্মিথ মনে করেন। বিভিন্ন কিংবদন্তী থেকে তার জীবনেতিহাস সম্বন্ধে কিছু কথা জানা যায়। তিনি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং পরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী ও বাসস্থান ছিল সাকেত। বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন এবং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। একধারে তিনি সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। প্রথমদিকে বৌদ্ধভিক্ষুরূপে তিনি বৌদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন ও পরবর্তি সময়ে কণিষ্কের রাজসভায় স্থান পান। তিনি 'আচার্য', 'মহাবাদী', 'মহাকবি', 'ভদন্ত' প্রভৃতি নানা উপাধিতে ভূষিত হন। বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ, শারিপুত্রপ্রকরণ, গণ্ডী স্তোত্রগাথা বজ্রসূচী, সূত্রালঙ্কার এবং মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র অশ্বঘোষের উল্লেখযোগ্য রচনা। এগুলির মধ্যে 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরনন্দ' হল মহাকাব্য, 'শারিপুত্র প্রকরণ' হল প্রকরণজাতীয় দৃশ্যকাব্য এবং 'গণ্ডীস্তোত্রগাথা' হল খণ্ডকাব্য বা গীতিকাব্য। অন্যান্য গ্রন্থগুলি যথার্থই অশ্বঘোষের রচনা কিনা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের সন্দেহ বিদ্যমান।

বুদ্ধচরিত – অশ্বঘোষের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির নিদর্শন হল বুদ্ধচরিত নামক মহাকাব্য। ভগবান বুদ্ধের জীবনীই এই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ সিং এর মতে বুদ্ধচরিত ২৮ টি সর্গে সম্পূর্ণ মহাকাব্য। কিন্তু বর্তমানে ১৭ টি সর্গই পাওয়া যায়। তার মধ্যে প্রথম ১৩ টি সর্গ অশ্বঘোষ রচিত মূল রচনা এবং বাকি ৪ টি সর্গ অমৃতানন্দ নামক কোনো এক নেপালী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত দ্বারা সংযোজিত। সিদ্ধার্থের জন্ম থেকে নির্বাণলাভ পর্যন্ত বুদ্ধের ঘটনাবহুল ও মহিমামণ্ডিত জীবনবৃত্তান্ত এই কাব্যের বিষয়বস্তু। পরবর্তী সংযোজনে বুদ্ধের বোধিলাভ, জগতের মুক্তির জন্য বুদ্ধদেবের উত্থান এবং বারাণসী নগরীতে গমনের ঘটনা বর্ণিত। মূলতঃ জগতের যথার্থ কল্যাণ ও সদ্ধর্ম সম্পর্কে পাঠকবর্গকে অবহিত করার জন্যই তার এই প্রয়াস। তাঁর রচিত এই গ্রন্থটি ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ সমুদ্রের দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে পাঠ করা হত।

সৌন্দরনন্দ – অষ্টাদশ সর্গে রচিত সৌন্দরনন্দ কবি অশ্বঘোষের আর এক মহাকাব্য। A. B. Keith-এর মতে সৌন্দরনন্দ কবির প্রথম রচনা। বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা একান্ত অনিচ্ছুক নন্দকে (সুন্দরকে) বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করাই এই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়, যা 'মহাবগ্গ' ও 'নিদানকথা'তেও বর্ণিত হয়েছে। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ও বাস্তব

অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে নন্দ বুদ্ধদেবের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে বুদ্ধের অনুরোধে সংসারী মানুষকে প্রব্রজ্যাদানের ব্রত গ্রহণ করেন। অবশেষে নন্দের পত্নী সুন্দরীও স্বামীর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ অনিচ্ছুক ভোগী অপরিণামদর্শী মানুষ যারা পার্থিব সুখে মগ্ন হয়ে মোক্ষপথের সন্ধানে বিরত হয়, উপদেশের কর্কশ পথে নয়: কান্তাসম্মিত কাব্যিকভাষায় এই কাব্যে কবি তাদেরই ধর্মোন্মুখ করতে চেয়েছেন

"প্রায়েণালোক্য লোকং বিষয়রতিপরং মোক্ষাৎ প্রতিহতং
কাব্যব্যাজেন তত্ত্বং কথিতমিহ ময়া মোক্ষঃ পরমিতি।।" (১৮/৬৪)

এছাড়াও ইন্দ্রিয়বিজয়, বিতর্ক পরিহার, আর্যসত্য ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয় এক-একটি সর্গে পরিকল্পিত উপায়ে সাহিত্যের হাত ধরে পরিবেশিত হয়েছে।

অশ্বঘোষের রচনারূপে প্রচারিত 'বজ্রসূচী' গ্রন্থে বেদ, মহাভারত, মনুস্মৃতি প্রভৃতিকে আশ্রয় করেই লেখক প্রচণ্ডভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আক্রমণ করেছেন এবং জাতি বৈষম্যের অসারতা প্রমাণ করেছেন। তাঁর গভীর প্রজ্ঞা ও গণতান্ত্রিক মনোভাব পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। নবম বা দশম শতাব্দীতে অনূদিত চীনা ত্রিপিটকে চতুর্বেদ প্রত্যাখ্যানকারী বজ্রসূচী ধর্মকীর্তির রচনা বলেই স্বীকৃত হয়েছে।

'মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদ' নামক মহাযান বৌদ্ধমতের শূন্যতা ও বিজ্ঞানবাদের ঐক্য প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থটি অশ্বঘোষের রচনা রূপেই প্রচলিত। মহাযান মার্গে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপন্ন করাই গ্রন্থটির মূল লক্ষ্য। জাপানের বৌদ্ধ মঠগুলিতে আজও শ্রদ্ধার সাথে গ্রন্থটি পাঠ করা হয়।

'সূত্রালঙ্কার' নামের গ্রন্থটিও অশ্বঘোষের রচনা হিসাবে প্রচলিত। কল্পনামণ্ডিতিকা বা কল্পনালংকৃতিকা এই গ্রন্থের নামান্তর। কুমারজীবকৃত চীনা অনুবাদে মূল লেখকরূপে অশ্বঘোষের নাম পাওয়া যায়। Luder মনে করেন এটি কুমারলাটের রচনা এবং তিনি অশ্বঘোষের সমসাময়িক। গ্রন্থটি জাতক ও অবদানের অনুকরণে ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মের উপদেশ প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত।

শুধু মহাকাব্য রচয়িতা রূপে নয়, নাট্যকার রূপেও অশ্বঘোষের প্রসিদ্ধি সমধিক। তাঁর রচিত দৃশ্যকাব্য গুলির মধ্যে 'শারিপুত্র প্রকরণ' নামক প্রকরণ জাতীয় গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আরো দুটি অসম্পূর্ণ নাটকও অশ্বঘোষের কৃতি বলেই অনুমান করা হয়। ন্যায়বিনিশ্চয় গ্রন্থের টীকা থেকে জানা যায় যে 'রাষ্ট্রপাল' নামক অপর একটি নাটকও অশ্বঘোষের রচনা।

শারিপুত্র প্রকরণ – এটি অশ্বঘোষ বিরচিত নয় অংকের একটি সম্পূর্ণ প্রকরণ জাতীয় দৃশ্যকাব্য। এর অপর নাম শারদ্বতীপুত্র প্রকরণ। ব্রাহ্মণ শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ণের

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভের ঘটনাই এর মূল বিষয়বস্তু। শারিপুত্র তার প্রিয়বয়স্য বিদূষকের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে বিদূষক বলেন, তা কি করে সম্ভব? ব্রাহ্মণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের কাছে দীক্ষাগ্রহণ? উত্তরে শারিপুত্র বলেন-নীচ জাতির নিকটও প্রাণদায়ী ঔষধ সেবন করা উচিৎ। তারপর মৌদ্গল্যায়নকে নিয়ে শারিপুত্র বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। এখানে কবির যুগমানসিকতা সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই প্রকরণটিতে শারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ণ প্রভৃতির পাশাপাশি ব্রাহ্মণ, পারিপার্শ্বিক, বিদূষক, শ্রমণ মগধবতী, গণিকা, চেটি প্রভৃতি চরিত্রও চিত্রিত হয়েছে। বিনয়পিটকের মহাবগ্গেও এই বিষয়বস্তুর উল্লেখ পাওয়া যায়।

শারিপুত্র প্রকরণ ভিন্ন যে অপর দুটি অসম্পূর্ণ নাটক পাওয়া যায় তার একটি সামাজিক ও অন্যটি রূপক জাতীয়। প্রথম নাটকটি ধনী বণিকপুত্র সোমদত্ত ও নায়িকা মগধবতীর গল্প। এটিতে চরিত্রগুলির পারস্পরিক সংলাপে নাট্যকলার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। অপরটির মধ্যে কীর্তি, ধৃতি, বুদ্ধি প্রভৃতি মানবিক মনোজগতের বিষয়গুলিকে এক একটি চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে, কেবলমাত্র ভগবান বুদ্ধই একমাত্র মনুষ্যচরিত্র হিসাবে বর্তমান।

অশ্বঘোষ রচিত 'রাষ্ট্রপাল' নামক নাটকের মূল উপজীব্য হল পিতা-মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাষ্ট্রপালের বুদ্ধদেবের কাছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ।

নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্রচিত্রণে কবির নাটকগুলি সজীব ও প্রাণবন্ত। পণ্ডিতদের অনুমান সে যুগে বৌদ্ধদের মধ্যে এ ধরনের ধর্মীয় নাটকগুলির যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল এবং বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্ম প্রচারের কাজে এই নাটকগুলির পঠন-পাঠন ও অভিনয় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

গণ্ডীস্তোত্রগাথা – অশ্বঘোষ রচিত 'গণ্ডী স্তোত্রগাথা' স্রগ্ধরা ছন্দে উনত্রিশটি শ্লোকে নিবদ্ধ একটি গীতিকাব্য। বৌদ্ধমঠে 'গণ্ডী' নামের এক বিশেষ বাদ্যযন্ত্র রাখা হত। তাতে কাষ্ঠখণ্ডদিয়ে আঘাত করলে যে মধুর ধ্বনি সৃষ্টি হত, তা বৌদ্ধদের কাছে খুব পবিত্র বলে বিবেচিত হত। কবি তার কাব্যে সেই পবিত্র ও মধুর ধ্বনির ধর্মসংগত ব্যাখ্যা করেছেন। এর মধ্য দিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ কবির সঙ্গীত সচেতনতাই পাঠকসমাজের কাছে ফুটে উঠেছে।

এছাড়া বৌদ্ধ স্তোত্রসাহিত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রচনা হল – নাগার্জুনের চতুস্তব, মাতৃচেটের চতুঃশতক, সপ্তপঞ্চাশতিকা, ত্রিরত্নস্তোত্র; দিঙনাগের মিশ্রকস্তোত্র; হর্ষবর্ধনের সুপ্রভাতস্তোত্র; কাশ্মীরীয় সর্বজ্ঞমিশ্রের তারাস্তোত্র; বঙ্গীয় বৌদ্ধকবির লোকেশ্বরশতক, ভক্তিশতক প্রভৃতি বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। 'ত্রিদন্তমালা' হল বৌদ্ধধর্মের অপর একটি মাহাত্ম্যপ্রতিপাদক স্তোত্রসংকলন। এগুলি বৌদ্ধ কথাসাহিত্য ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। বৌদ্ধ কথাসাহিত্য জাতক ও অবদান নামে পরিচিত।

জাতক – গৌতমবুদ্ধ প্রতি জন্মে সৎকর্ম আচরণ করে বোধিসত্ত্ব হন, বোধিলাভের এই

কাহিনিগুলিই জাতকের গল্প। গল্পগুলি বুদ্ধের মুখে বর্ণিত, প্রতিটি গল্পেই কোনো না কোনো মহৎ কর্ম ও মহৎ আদর্শ সমন্বিত জীবনকাহিনি মাধ্যমে জনগণকে উপদেশ দিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রমণ ও ধর্মানুরাগীরা সেই জীবনকথাগুলি বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শে রূপান্তরিত করেন। এগুলিই জাতকের মূল উৎস। জাতকের গল্পসমূহে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের চরিত্র উপস্থাপিত। কাহিনিগুলি বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন আদর্শে পরিকল্পিত-সৎকর্ম, সদাচার, প্রজ্ঞা, শীল, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতির উন্নততর আদর্শ মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণীর আচরণ ও অনুশীলনের দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত। আর্যশূর রচিত জাতকমালা বা বোধিসত্ত্বাবদানমালা জাতকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জাতকমালার অনেক ঘটনাই অজন্তার গুহায় প্রাচীরচিত্রে স্থান পেয়েছে।

অবদান – অবদান শব্দের অর্থ মহৎ বা প্রশংসনীয় কর্ম। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সম্পাদিত এবং বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অন্যান্য অনেক প্রকার প্রশংসনীয় কর্মের উপাখ্যান অবদান সাহিত্যে পরিবেশিত। যে অবদানে বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনি বর্ণিত, তাকে জাতকও বলা চলে ; আবার প্রত্যেক জাতককেই অবদান বলা যায়। অবদান সাহিত্যের প্রাচীন গ্রন্থ নন্দীশ্বর সংকলিত 'অবদান শতক'। অবদানের দুটি প্রধান ভাগ প্রত্যুৎপন্ন বস্তু (বর্তমান কাহিনি) ও অতীত বস্তু (প্রাচীন কাহিনি)। অবদানকারেরা গল্পের মধ্যদিয়ে সৎকর্মের সুফল ও অসৎকর্মের কুফল প্রচার করেছেন ; তবে জাতকের মত অবদানে ধর্মের তত্ত্বকথা স্থান পায়নি, বরং বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের উদ্দেশ্যে আচরিত মহৎ কর্মের অবদান রচিত। সর্বাস্তিবাদ নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের 'দিব্যাবদান' ক্ষেমেন্দ্র রচিত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পতা', 'মহাবস্তু-অবদান', 'সুবর্ণবর্ণাবদান' 'অশোকাবদান', 'মণিচূড়াবদান', 'অবদানসারসমুচ্চয়' প্রভৃতি অবদান সাহিত্যের নিদর্শন। এছাড়া 'রত্নাবদানমালা' প্রভৃতি অবদানমালা অভিধায় কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার গ্রন্থ রচিত হয়েছিল।

এ ধরনের জাতক ও অবদান সাহিত্যে তৎকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনেক উপাদান সংরক্ষিত আছে।

সভ্যতা ও সংস্কৃতি দুই-ই পরিবর্তনশীল। আর সময়ই হল এই দুই-এর পরিবর্তনের কারণ। অনেক সভ্যতা ও সংস্কৃতিই কালাবর্তে এমনি ভাবেই বিলীন হয়েছে। সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে হতে কিছু সভ্যতা ক্ষীণপ্রভা হয়ে বর্তমান সময়ে বিদ্যমান। সেই সমস্ত সভ্যতার সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের নির্ভর করতে হয় ঐতিহাসিক তথ্যের উপর আর সেই সময়ে রচিত সাহিত্য সমূহে। বর্তমানের বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতি বিচার করে বৌদ্ধযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অনুমান মাত্রই করতে পারি। আমরা জানি যে সমাজের ও সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে থাকে সেই সময়ে রচিত গ্রন্থসমূহে। তাই বৌদ্ধযুগের সমাজ ও

সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে বৌদ্ধ সাহিত্য ছাড়া গত্যন্তর নেই। ইতিহাস সাক্ষী যে পাটলীপুত্র, নালন্দা, এবং, বৌদ্ধ বিহারগুলি তখনকার সময়ে শিক্ষাচর্চার পীঠস্থান হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সে যুগে শাস্ত্রজ্ঞ বলে বিবেচিত হতেন। অশ্বঘোষ রচিত 'বুদ্ধচরিত' এবং 'বুদ্ধস্তব' প্রভৃতি ভারতবর্ষের ও বিদেশে মালয়, সুমাত্রা জাভার নানান বৌদ্ধমঠে সন্ধ্যায় পাঠ ও গীত হত। আবৃত্ত করা হত বুদ্ধদেবের ভক্তিমূলক স্তোত্র ও কবিতা। বৌদ্ধবিহারগুলির গায়ে শিল্পকলা বৌদ্ধ সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন বহন করে। বৌদ্ধসাহিত্যে সামাজিক চিত্রের মধ্যে রাজতন্ত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি লক্ষণীয়। সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ভোগ আসক্তি পরিহার করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুরূপে বৌদ্ধধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন নৃপতিগণ। বৌদ্ধভিক্ষুরা ধর্মপ্রচারের সাথে শিক্ষা ও সমাজের সকল মানুষের উন্নতিকল্পে ব্রতী ছিলেন।

এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধসাহিত্য সেই সময়কার সমাজ ও সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি –

১) বুদ্ধচরিতম্ (তৃতীয়ঃ সর্গঃ) – ড. জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
২) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।
৩) সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা – ড. বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, বুক ওয়ার্ল্ড।
৪) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ড. দেবকুমার দাস, শ্রী বলরাম প্রকাশনী।
৫) সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ড. সুপর্ণা বসু মিশ্র, করুণা প্রকাশনী।
৬) সংস্কৃত সাহিত্যের ভূমিকা (প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ) – শ্রী সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য।

....

বাংলায় বৌদ্ধচর্চা প্রসঙ্গে

পুলিন দাস

মুসলমান অধিকারের পূর্ববর্তী সময়ে বাংলায় আধিপত্য ছিল বৌদ্ধদের। পালরাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন বৌদ্ধরা। বাংলা মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য দর্শন ও শিল্প ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। রচিত হয় কোষগ্রন্থ অমরকোষ, ভামহকৃত অলঙ্কারশাস্ত্র, বুদ্ধবচন-প্রজ্ঞাপারমিতা, অভিধান-অমরসিংহের নামলিঙ্গানুশাসন, চান্দ্র-ব্যাকরণ, গল্পকথা-জাতক ও অবদান ইত্যাদির মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী। 'বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ' রূপে বর্ণিত ধর্মপূজা ও ধর্মঠাকুরকে নিয়ে লেখা হয় রামাই পণ্ডিতের শূন্যপূরাণ এবং ঘনরাম ও রূপরামের ধর্মমঙ্গলকাব্য। সরহপাদ ও কাহ্নপাদের দোহাকোষও এই পর্বের উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বুদ্ধচর্চার এই ধারাপ্রবাহ ম্রিয়মান হয়ে পড়ে বাংলা সাহিত্যের নব পর্যায়ে এসে। পুনরুজীবন প্রয়াসও অবশ্য চলতে থাকে। বুদ্ধজীবন অবলম্বনে নাটক 'বুদ্ধচরিত' রচনা করেন রামকৃষ্ণভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। নাট্যভাত হলো বুদ্ধদেবের মহাজীবন। অন্যদিকে এই জীবনকে কাব্যগত করে, প্রকাশ করেন নবীনচন্দ্র সেন তাঁর 'অমিতাভ' কাব্যে। উভয়ক্ষেত্রে উপকরণ আহরিত হয়েছিল মহাযান-সংস্কৃত কাব্য ললিতবিস্তর অবলম্বনে লেখা এডুইন আনল্ড-এর 'দ্য লাইট অফ্ এসিয়া' শীর্ষক ইংরেজি কাব্য থেকে। হীনযান-মহাযান শাস্ত্র অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেন 'বুদ্ধদেব' নামধেয় গ্রন্থ। বৌদ্ধধর্মের নানাদিক নিয়ে গবেষণা ও তার প্রকাশে লিপ্ত ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইংরেজিতে লেখা তাঁর 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' প্রকাশ করেন। Brain Houghton Hughson-এর বিপুল সংগ্রহ থেকে অংশ নির্বাচন করে সাজিয়ে তুলেছিলেন তাঁর গ্রন্থটিকে। 'ললিতবিস্তর'ও অনূদিত হয়েছিল রাজেন্দ্রলালের দ্বারা। অশ্বঘোষ-এর 'বুদ্ধচরিত' বাংলায় অনুবাদ করেন বিধুশেখর শাস্ত্রী। 'বুদ্ধদেব' নাম দিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। শাক্যমুনিরচিত নির্বাণতত্ত্ব লেখেন সাধু অঘোরনাথ। মহেশচন্দ্র ঘোষ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন 'প্রবাসী' পত্রিকায়।

বৌদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলাসাহিত্যের আত্মীয়তার যোগ আরো সূক্ষ্ম ও সুন্দরভাবে প্রতিভাত হয়ে ওঠে রবীন্দ্রনাথের মনন কল্পনায় ও তাঁর সৃষ্টির বিচিত্র অঙ্গনে।

মানুষের মধ্যে যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু মহিমান্বিত তার অভিপ্রকাশ যার মধ্যে দেখেছিলেন সেই বুদ্ধদেবকে জগতের শ্রেষ্ঠ মানব বলে অনুভব করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নয় তা ঘোষণা করেছিলেন বুদ্ধদেব। মনুষ্য মহিমার এই অঙ্গীকার আকৃষ্ট করে রবীন্দ্রনাথকে, যোগায় সৃষ্টির প্রেরণা। প্রকাশিত হয় তা তাঁর গানে-কবিতায়, প্রবন্ধে নাটকে, কথায় ও কর্মে।
বুদ্ধপূর্ণিমায় রচিত হলো প্রার্থনাগীতি –

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী–
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘণ, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য........।'

আর এক বৈশাখী পূর্ণিমায় রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধশরণ –

'সকল কলুষতামসহর, জয় হোক তব জয়
অমৃতবারি সিঞ্চন কর নিখিল ভুবনময়
মহাশক্তি, মহাক্ষেম, মহাপুণ্য, মহাপ্রেম ।।
জ্ঞানসূর্য্য-উদয়-ভাতি ধ্বংস করুক তিমিররাতি
দুঃসহ, দুঃস্বপ্ন ঘাতি অপগত কর ভয়।'

এরকম আরো কিছু গানের উল্লেখ করা যেতে পারে যাদের প্রেরণাস্থল সেই মহাজীবন।

'কথা' কাব্যান্তর্গত 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'মস্তকবিক্রয়', 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', 'সামান্য ক্ষতি', 'মূল্যপ্রাপ্তি', প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধপ্রভাবের কথা রবীন্দ্রনাথই জানিয়ে গেছেন। এদের উৎসে আছে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'Sanskrit Buddhistic Literature' এই তথ্য কাব্যভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার ওই গ্রন্থ থেকেই আহরিত তাঁর অনেকগুলো নাটকের উপাদান।

'মালিনী' ও 'রাজা' নাটকদ্বয়ের কাহিনি উৎসে আছে যেমন 'মহাবস্তাবদান' তেমনি 'চণ্ডালিকা'র অবলম্বন 'শার্দূলকর্নাবদান।' বৌদ্ধজাতক কাহিনিজাত 'পরিশোধ' কবিতার রূপান্তর 'শ্যামা' নাটক। 'অচলায়তন' নাট্যভুক্ত পঞ্চক ও মহাপঞ্চক চরিত্রযুগলের উৎস

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The story of Panchaka'। 'পূজারিণী' কবিতার নাট্যরূপান্তর ঘটেছে 'নটীর পূজা'য়। মূল কাহিনি ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ নাটকের প্রয়োজনে ও তাঁর আপন অনুভবের প্রবর্তনায়।

বৈদিক ও বৌদ্ধ-দুই সভ্যতাই লালিত পালিত হয়েছে অরণ্যে। বুদ্ধদেব তাঁর বাণী প্রচার করেছেন আম্রকুঞ্জে বেণুবনে। রবীন্দ্রনাথও গড়ে তুলেছেন তাঁর বিদ্যাশ্রম ওই তপোবনের আদর্শকে সামনে রেখে। বৌদ্ধদর্শনের অন্তর্গত নির্বাণতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতপার্থক্য প্রসঙ্গও স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন-'সর্বশূন্যতার মধ্যে নির্বাপণলাভ করা আসল নির্বাহ নয়। তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ জিনিষ হলো প্রেম। 'প্রেম হচ্ছে স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা, সে কিছুই নেওয়ার অপেক্ষা রাখে না, সে যে কেবলই দেওয়া।' এই প্রেমই তাঁর কাছে ব্রহ্মের স্বরূপ,- বন্ধন নয়,-মুক্তি। অন্তরের উচ্চারণ তাঁর –

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়,
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

বুদ্ধের জ্ঞানবাদ, ত্যাগ ও লোকহিতে অত্মোৎসর্গের আদর্শ-আকৃষ্ট হয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দও।

"ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন।" বুদ্ধদেবের এই মহান কর্মের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গভীর অনুরাগে রবীন্দ্রনাথ সারনাথে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, "আমি যাঁকে অন্তরের শ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি, আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি।"

....

ক্রমবিবর্তনের ধারায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালিবৌদ্ধ

উত্তমকুমার মণ্ডল

বৌদ্ধধর্ম এমন এক উন্নত ধরনের নীতিবোধ যা মানুষকে পরিশুদ্ধ করে মুক্তির পথ দেখায়। মানব ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়ে গেছে। বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন সত্যের বন্যায় জাতিভেদ অস্পৃশ্যতার বন্ধন ছিন্ন করে সমস্ত মানুষকে মানুষ বলে স্বীকার করে নিল। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির একমাত্র পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন, তাঁর বাণীকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের অপমানের যুগে আজ বলবার দিন এসেছে – "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।" বুদ্ধই প্রথম ঘোষণা করলেন – মানুষ দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নয়। তিনিই শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান-শক্তি-উদ্যমকে মহীয়ান করে তুললেন। বুদ্ধদেব কোনো জাতিভেদ বর্ণভেদ মানেন না। পূজা, মন্ত্র, যপ, হোম, যাগযজ্ঞের অবলম্বন থেকে তিনি মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

গৌতম বুদ্ধ মনে করেন পূজা, মন্ত্র, জপ, হোম, যাগযজ্ঞ-এসমস্ত ধর্মের বহিরঙ্গ মাত্র-আসল সত্য নয়। চাণক্য নীতিতে আছে –

"ন দেবো বিদ্যতে কাষ্ঠে, ন পাষাণে, ন মৃন্ময়ে।
দেবো হি বিদ্যতে ভাবে, তস্মাৎ ভাবো হি কারণম্।।"

অর্থাৎ কাঠ, পাষাণ, মাটির মূর্তির মধ্যে দেবতা বিরাজ করে না। দেবতা বিরাজ করেন ভাবের মধ্যে। আর সেই ভাবই আসল কারণ। কিন্তু বুদ্ধদেবের অনুগামীরা বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তোলবার জন্য এই ধর্মকে নতুন করে সাজালেন। বাংলায় বৌদ্ধধর্ম একসময় মূর্তিপূজা, আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন রূপ পেতে শুরু করল। এর ফলে বুদ্ধদেবের সঠিক ধর্মদর্শন বহিরঙ্গের তলায় তলিয়ে গিয়ে তন্ত্রসাধনা, ভক্তিবাদ, শূন্যবাদ, সহজযান, বজ্রযান সাধনা প্রাধান্য পেতে শুরু করল। এরপর ইতিহাসের পথ ধরে বৌদ্ধধর্ম বাঙালি বৌদ্ধদের কাঁধে ভর দিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এগোতে এগোতে একসময় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে পরিণত হল। তবে বাঙালি বৌদ্ধদের কারণে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম একেবারে মুছে গেল না। যারা বুদ্ধের আদর্শকে বুকে আঁকড়ে ধরে রাখল তাদের বেশিরভাগটাই রয়েছে বাংলাদেশে। বাকিরা জীবিকার সন্ধানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

খ্রিস্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর ইতিহাসে অর্থাৎ নন্দ ও মৌর্য রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ আছে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী সময়ে

মগধ ও অন্যান্য অঞ্চল থেকে ব্যবসায়ী, শিক্ষক, আমলা, বৌদ্ধ, জৈন, শ্রমন, সন্ন্যাসী প্রভৃতি নানা শ্রেণির মানুষ প্রাণভয়ে নিজের দেশ ছেড়ে বঙ্গভূমিতে চলে আসে এবং এ দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে সবাই বাঙালি হয়ে যায়। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ এর ভ্রমণবৃত্তান্ত ও বৌদ্ধ 'দিব্যাবদান' গ্রন্থে উল্লেখ আছে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল মৌর্য আমলে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ঋষি নন্দন ও শ্রীমতী ধর্মদত্তা সাঁচীর বিখ্যাত বৌদ্ধস্তূপের বেষ্টনী ও তোরণ তৈরির জন্য প্রভূত অর্থ প্রদান করেছিলেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাম্রলিপ্তিতে থাকাকালীন বহু বৌদ্ধবিহার দেখেছিলেন। এইসময় বৌদ্ধধর্ম পণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্তি, কজঙ্গল সহ সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল। মৌর্য সম্রাট অশোক এইসময় সারা বাংলায় সত্তরটি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত সারা বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তরলাভ করেছিল।

সম্রাট অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় অনুমানিক ৪৮৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর রাজগৃহে বৌদ্ধভিক্ষুরা প্রথম ধর্মীয় মহাসম্মেলন করেন। প্রথম ধর্মীয় মহাসম্মেলন বৌদ্ধভিক্ষুদের অনৈক্য দূর করতে না পারায় ঠিক একশত বৎসর পর খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৩ অব্দে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ ধর্মমহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের পর প্রায় দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুকে বৌদ্ধ ভিক্ষুসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়। এরা মহাসাঙ্ঘিক ভিক্ষুগোষ্ঠী নাম নিয়ে বুদ্ধের নীতি ও আদর্শের নানা পরিবর্তন ঘটালো। আর যারা বুদ্ধের নীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে রইল – তারা হল স্থবিরবাদী। এরপর স্থবিরবাদী গোষ্ঠী থেকে এগারোটি নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হল এবং মহাসাঙ্ঘিক গোষ্ঠী থেকে আরো সাতটি নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব হল। এই ভাবে বৌদ্ধধর্ম আঠারোটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল।

এরপর মৌর্যসম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৪৭ অব্দে পাটলিপুত্র নগরীতে তৃতীয় বৌদ্ধধর্ম-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসম্মেলনের মাধ্যমে স্থবিরবাদী বৌদ্ধ অশোক বিচ্ছিন্ন বৌদ্ধ গোষ্ঠীকে এক ছত্রছায়ায় আনতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মহাসাঙ্ঘিক বৌদ্ধদের উদারনীতি, পূজা, দান, স্বর্গ, প্রভৃতি মতবাদ সাধারণ মানুষকে অত্যধিক আকৃষ্ট করেছিল। একারণে তৃতীয় ধর্ম মহাসম্মেলনের পর স্থবিরবাদী মতাদর্শ ভারতবর্ষ থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিল। এরপর সংখ্যাগরিষ্ঠ মহাসাঙ্ঘিকরা চতুর্থ ধর্ম মহাসম্মেলনে নিজেদেরকে মহাযানী বলে অভিহিত করল। অপরদিকে বুদ্ধের নীতি ও আদর্শ মেনে স্থবিরবাদী বৌদ্ধরা হীনযানী বলে অভিহিত হল। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এর ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আমরা জানতে পারি সম্রাট কনিষ্কের পরবর্তী সময় অর্থাৎ খ্রিস্টীয় প্রথম

শতকের পর বাংলায় মহাযানী ধর্মবিশ্বাসের সূত্রপাত ঘটেছিল। এইসময় সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে বহু মহাযানী বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল। তবে বাংলার স্থানীয় অধিবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা প্রায় সকলেই ছিলেন হীনযানী। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে অবশ্য মহাযানী বৌদ্ধরা বেশি সচেষ্ট ছিল। মহাযানী বৌদ্ধদের উদারনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু নিম্নশ্রেণির মানুষ মহাযানী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে উত্তরাপথ থেকে বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজা নরেন্দ্র গুপ্ত–শশাঙ্ক বাংলায় আসেন। এই সময় বৌদ্ধধর্ম প্রবল ধাক্কা খেলেও সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায় নি। এরপর অল্পকালের মধ্যে মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী খড়্গ-বংশীয় রাজারা বাংলার রাজত্বভার হাতে নিলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম আবার সজীব হয়ে ওঠে। খড়্গবংশীয় রাজা দেব খড়্গের পত্নী প্রভাবতী দেবী বাংলায় একটি সর্বানী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এরপর চন্দ্রবংশের রাজারাও বৌদ্ধঅনুরাগী ছিলেন। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধভক্ত পালরাজারা বাংলার রাজত্বভার গ্রহণ করলেন। রাজা ধর্মপাল বাংলায় পঞ্চাশটি বৌদ্ধধর্ম বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে রাঢ়ের ত্রৈকূটক বিহার, চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার, ত্রিপুরার সন্নগর বিহার, দিনাজপুরের দেবীকোট বিহার, এবং বরেন্দ্রীর জগদ্দল বিহার উল্লেখযোগ্য। এই সময় পালরাজারা কয়েকটি ছোট খাটো বৌদ্ধবিহারও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে কৃষ্ণনগরের সুবর্ণ বিহার, পূর্ববঙ্গের কনকস্তূপ বিহার, বগুড়ার বগুড়াবিহার এবং পাহাড়পুরের পাহাড়পুর বিহার উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত বৌদ্ধবিহার গুলিতে অসংখ্য জ্ঞানী গুণী পণ্ডিত বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন। এদের মধ্যে আচার্য অদ্বয়বজ্র, করুণাশ্রী মিত্র, বিনয়শ্রী মিত্র, আচার্য বোধিভদ্রের নাম স্মরণযোগ্য। আর মহাবিহারগুলিতে ছিলেন বৌদ্ধ পণ্ডিত শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, ধর্মকীর্তি, দীপঙ্কর অতীশ ও কমলা সিলা প্রমুখরা। পালযুগে এই সমস্ত বৌদ্ধ পণ্ডিতরা ভারতবর্ষের বাইরে গিয়েও বৌদ্ধধর্ম প্রচার করতেন। দীপঙ্কর অতীশ তিব্বতে গিয়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এইসময় বাংলার বৌদ্ধপণ্ডিতদের কাছে দর্শনশাস্ত্র শিখতে কাশ্মীর, তিব্বত, চীন, সিংহল প্রভৃতি দেশ থেকে জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতরা বঙ্গভূমিতে ভিড় করতেন।

খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনা পরিব্রাজক হিউ-য়েন-সাঙ যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন সারা দেশে বৌদ্ধধর্ম নিভু নিভু হলেও বাংলায় তখন এই ধর্মের প্রচণ্ড জোয়ার। পাল রাজাদের আমলে বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয়ের ফলে মহাযানী আদর্শের প্রভাবে বুদ্ধের পূজার প্রচলন হয়েছিল। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে নব্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপাসক কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের পতন ঘটাতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রচার শুরু করেন। এইসময় বৌদ্ধধর্মদর্শন তার স্বকীয়তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাছাকাছি চলে আসে।

এই সময়টাই ইতিহাসের পাতায় বৌদ্ধদের কলঙ্কময় অধ্যায় তিব্বতের ঐতিহাসিক তারকনাথ বলেছেন – "পালযুগের শেষে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের দুরবস্থা দেখা দেয়। পালযুগে তৈরী বহু বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধমন্দির ভগ্নপ্রায় ও ভগ্ন অথবা বিধর্মীদের দ্বারা অধ্যুষিত।" পালবংশের পরবর্তী সেন ও বর্মন রাজারা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বর্মন রাজা জাতবর্মা সোমাপুরের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহারটি পুড়িয়ে দেন। পালযুগে যে ধর্মীয় সমন্বয় গড়ে উঠেছিল, সেন ও বর্মন রাজারা তা লণ্ডভণ্ড করে দিলেন। এরপর দ্বাদশ শতকে তুর্কী হানাদার বখতিয়ার খিলজী বিহার প্রদেশে হানা দিয়ে নালন্দা, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধবিহার ধ্বংস করে দেন। তুর্কীরা অগণিত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের হত্যা করে সমস্ত বৌদ্ধধর্মের পুথি পত্র আগুনে পুড়িয়ে দেন। এরপর বলপূর্বক ধর্মান্তরকরণের পালা শুরু হল। হয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো, নয়তো মৃত্যবরণ করো।

বখতিয়ার খিলজীর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের শাসনভার দিল্লীর সুলতানদের হাতে চলে যায়। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত সুলতানদের শাসন চলার পর দিল্লীর মসনদ দখল করল মোঘলরা। দ্বাদশ শতকে তুর্কী হানাদারদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বেশ কিছু সনাতন হিন্দু, বৌদ্ধ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা নিজেদের আবাসস্থল ছেড়ে ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও আসাম অঞ্চলে পালিয়ে যায়। বঙ্গোপসাগর ও কর্ণফুলী নদীর সংযোগস্থলের তীরবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বর্তমান নাম চট্টগ্রাম আর প্রাচীন নাম চট্টল। বর্মার মগ জলদস্যুরা বণিকদের যথাসর্বস্ব লুঠ করে কর্ণফুলী নদীর মোহনার তীরবর্তী অঞ্চলে সুন্দরী গাছের জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিত। কালের আবর্তে এই মগ জলদস্যুরা দস্যুতা ছেড়ে দিয়ে চাষ আবাদে মন দেয়। ডাকাতি করে ধরে আনা মেয়েদের বিয়ে করে মগ জলদস্যুরা চট্টগ্রামে সংসার পেতে আদি অধিবাসী হয়ে উঠল। এই অধিবাসীরা ছিল হীনযানী বৌদ্ধ। চট্টগ্রামে নামজাদা বেশকিছু বৌদ্ধ মন্দির ছিল। আনুমানিক ৮০০ বছর পূর্বে বাংলার হীনযানী বৌদ্ধরা উদ্বাস্তু হয়ে চট্টলে এসে বসবাস শুরু করেছিল। উর্বর ও চাষের উপযোগী জমির অভাব না থাকায় বাংলার বৌদ্ধরা এখানে এসে চাষ-আবাদ শুরু করল। বাঙালি বৌদ্ধদের আগমনের পর চট্টল ধীরে ধীরে সমৃদ্ধশালী উপনগরে পরিণত হল। নাম হল চট্টগ্রাম। চট্টগ্রামের বৌদ্ধ গ্রামগুলি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল – ১) সংগ নদীর দক্ষিণ পারের গ্রাম- কারিয়ানগর, ডেমসা। ২) সংগ নদীর উপকূলের গ্রাম – পাহাড়তলি, রাংগুনিয়া এবং ৩) সংগ নদী ও কর্ণফুলী নদীর মাঝের অঞ্চল – পটিয়া, জোয়ারা, বেয়ারিপাড়া, সাতবাড়িয়া। উপরোক্ত প্রতিটি গ্রামে বৌদ্ধমন্দির ও বৌদ্ধভিক্ষুরা ছিলেন। কিছু কিছু বাঙালি বৌদ্ধ বর্মায় ব্যবসা করতে গিয়ে সেখান থেকে বুদ্ধমূর্তি নিয়ে আসত। অনেকে আবার আসাম ও বর্মায় ব্যবসা করতে গিয়ে যেখানকার মেয়ে বিয়ে করে আনতেন। এইভাবে চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে নানা জাতি এসে মিশল।

পার্বত্য চট্টগ্রামে আরাকান থেকে আগত হীনযান বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমারা বসবাস করত। বাঙালি বৌদ্ধরা চাকমাদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মকথা প্রচার করে, তাদেরকে বৌদ্ধধর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিল। চাকমা রাজা ধরম্‌বক্‌স্ এর পত্নী রানী কালিন্দী একসময় চট্টগ্রামের উত্তর রাংগুনিয়ার রাজনগরে বুদ্ধের মূর্তিস্থাপন করেছিলেন। রানী কালিন্দী সতেরোটি পালি সূত্র সংগ্রহ করে, সেগুলি চাকমা ভাষায় রূপান্তরিত করে "আগরতারা" নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এরপর মহাযানী ও হীনযানী- এই দুই শ্রেণির বৌদ্ধরা আসাম ও ত্রিপুরা গিয়ে সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গেমিশে গিয়ে সেই দেশের লোক হয়ে উঠল। এই সমস্ত বাঙালি বৌদ্ধদের কামরূপের দেবানগিরিতে, তিনসুকিয়ার লেখাপানিতে, জোরহাটের খুরিকাটিয়া, বরহোলা প্রভৃতি অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে তাদের আর বাঙালি বৌদ্ধ বলা যাবে না। তাদের ধর্ম থাকলেও তারা আর বাঙালি রইল না। এইভাবে বাঙালি বৌদ্ধরা হারিয়ে গেল। যারা চট্টগ্রামে রইল তারা মিশ্রজাতিতে পরিণত হল। বাঙালি অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর মানুষ এবং চট্টগ্রামের মঙ্গোলয়েড গোষ্ঠীর মানুষ মিলেমিশে সৃষ্টি হল মঙ্গোঅষ্ট্রিক বাঙালি গোষ্ঠী। মোগলদের আমলে চট্টগ্রাম পূর্ববাংলার বৃহত্তম বাণিজ্যিক সামুদ্রিক বন্দর রূপে পরিগণিত হয়। মোগলদের আমলে চট্টগ্রামে বহু নতুন নতুন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের দেশ থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন পুথিপত্র নিয়ে চট্টগ্রামে আসতে শুরু করেন।

সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে ভারতবর্ষের শাসনভার চলে গেল ইংরেজদের হাতে। এইসময় দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটলে বৌদ্ধরা চট্টগ্রাম ছেড়ে চাকরির সন্ধানে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। চট্টগ্রামের নব্যশিক্ষিত বৌদ্ধদের মধ্যে বেশ কিছু পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধের ধর্ম বিকাশে মন দিলেন। চাকমাদের রানী কালিন্দীর উৎসাহে চট্টগ্রামের নয়াপাড়ার বাসিন্দা ফুলচন্দ্র বড়ুয়া ও বেতাগীর নীলকমল বড়ুয়া ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে "বৌদ্ধরঞ্জিকা" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। বৌদ্ধদার্শনিক ড. রামচন্দ্র বড়ুয়া পালি ভাষায় লেখা অভিধর্ম পিটকের বাংলা অনুবাদ করে নাম দেন – "অভিধর্ম্মার্থ সংগ্রহ"। এরপর কবি সর্বানন্দ "শ্রীশ্রীবুদ্ধচরিতামৃত" কাব্য রচনা করেন। এইসময় প্রকাশিত তিনটি সাময়িক পত্রিকা বৌদ্ধদের মধ্যে যথেষ্ট সমাদার লাভ করে –

১) পাঁচরিয়ার বিপিনচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় "বৌদ্ধপত্রিকা"।

২) সাতবেড়িয়ার কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় "বৌদ্ধ বন্ধু" পত্রিকা।

৩) করলবাসী নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বৈদ্যপাড়ার নিকুঞ্জ চৌধুরীর সম্পাদনায় ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় "বৌদ্ধবাণী" পত্রিকা।

প্রায় একশো বছর ধরে চট্টগ্রামের বাঙালি বৌদ্ধরা এই সমস্ত রচনার মাধ্যমে বাংল সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এদের এই সাহিত্য সৃষ্টি বাংলা সাহিত্যের কতখানি শ্রীবৃদ্ধি করেছিল তা বলা কঠিন। তবে আগামী প্রজন্মকে পথ দেখিয়ে বাংলার বৌদ্ধদে গৌরবান্বিত করেছিল। এর ফলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম নানা ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে, আঁক বাঁকা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে আবার তার সঠিক পং ফিরে পেল।

চট্টগ্রামের উনাইনপুরায় ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দে কৃপাশরণ মহাস্থবির জন্মগ্রহণ করেন। ভিক্ষু গ্রহণ করে তিনি ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় এসে "বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা" প্রতিষ্ঠা করেন। ে সমস্ত বাঙালি বৌদ্ধ চট্টগ্রাম ছেড়ে চাকরির সন্ধানে কলকাতা ও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, মহাস্থবির কৃপাশরণ সেই সমস্ত প্রবাসী চাকরিরত বাঙালি বৌদ্ধদের কাছে গিয়ে আর্থিক সাহায্য নিয়ে, প্রবাসীদের জন্য ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে ও কলকাতায় বে কয়েকটি বৌদ্ধবিহার ও মন্দির স্থাপন করলেন। তবে কৃপাশরণ মহাস্থবিরের কলকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাই সারা ভারতবর্ষে বাঙালি বৌদ্ধদের একমাত্র মুখপত্র হয়ে দাঁড়াল দেশের জ্ঞানী গুণী বাঙালি বৌদ্ধরা কৃপাশরণ মহাস্থবিরের চারিদিকে ভিড় জমালেন মহাস্থবির কলকাতার বৌদ্ধবিহারে নৈশ বিদ্যালয় চালু করলেন। কৃপাশরণের এই প্রচেষ্ট ছিল বেশির ভাগটাই কলকাতা কেন্দ্রিক। গরীব গ্রামাঞ্চলের বৌদ্ধদের অর্থনৈতিক উন্নতি কোনো ব্যবস্থা তিনি করতে পারলেন না। সে কারণে কৃপাশরণ মহাস্থবিরকে পুরোপুরি সমাজসংস্কারক বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে, ধর্মপ্রচারক হিসাবে কৃপাশর বৌদ্ধধর্মকে এক বৃহত্তর পটভূমিকায় স্থাপন করেছিলেন। বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষি মানুষ থাকলেও তারা ছিল সংখ্যায় খুব সামান্য। সমাজের বৃহত্তর অংশ ছিল শিক্ষার আলো বাইরে।

ড. বাবাসাহেব আম্বেদকরের Neo Buddhist বা নব্য বৌদ্ধ গোষ্ঠী সম্বন্ধে সঠিক ধারণ না থাকলে ভারতবর্ষের ঐতিহ্যগত বাঙালি বৌদ্ধদের (Traditional Buddhist) নব্য বৌ ভেবে পাঠক শ্রোতা ভুল করতে পারেন। প্রাচীনকালে মনুসংহিতায় শূদ্রদের নিম্নবর্গের মানু বলা হয়েছে। উচ্চবর্ণের মানুষেরা তাদের হাতে খেত না, এমনকি তাদের স্পর্শ এড়িয়ে চলত। তবে তৎকালীন বৌদ্ধরা এর ব্যতিক্রমী ছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শূদ্রদের তথ নিম্নবর্গের মানুষদের হাতে জল গ্রহণ করতেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যের কথা মনে পড়ে যায়। এই নৃত্যনাট্যে তৃষ্ণায় কাতর এক বৌদ্ধভিক্ষু এক চণ্ডালিনী কন্যার কাছে জল চাইলেন। চণ্ডালকন্যা উচ্চবংশ সম্ভূত বৌদ্ধ ভিক্ষুকে অশুচি জল দিতে আপত্তি জানাল। বৌদ্ধ ভিক্ষু চণ্ডাল কন্যাকে তখন বলেছিলেন- "যে মানব তুমি, সেই মানব আমি, কন্যা / সেই বারি তীর্থ বারি, যাহা তৃপ্ত করে তৃষিতেরে / জল দাও, আমায় জল দাও" বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ ছিল না বলেই চণ্ডাল কন্যার কাছে তিনি জল চেয়েছিলেন। গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ জাতিভেদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল। জাতিভেদের জাঁতাকলে সমাজের সেবক গোষ্ঠীর মানুষেরা অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ ও অশুচি শূদ্র বলে পরিগণিত হল। কর্মের ভিত্তিতে মানুষ নানা ধারায় বিভক্ত হল। কেউ হল ভাঙ্গি, কেউ হল চামার, কেউ হল জোলা, কেউ হল মাঝি,কেউ হল মুচি, কেউ হল ডোম প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গে বেদিয়া, কোটাল, মেথর, নমশূদ্র, রাজবংশী, দামাই, কামি, লোহার প্রভৃতিরা শূদ্র বলে চিহ্নিত হল। এই শ্রেণির মানুষেরা হিন্দুদের কাছে ব্রাত্য হলেও বৌদ্ধ ও মুসলিমদের কাছে ব্রাত্য ছিল না। মহাত্মা গান্ধী শূদ্রদের এই সমস্যা দূর করবার জন্য, আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবার জন্য শিক্ষাদানের কথা বললেন। এই সময় থেকে নানাধারায় বিভক্ত শূদ্র শ্রেণির মানুষদের একত্রে হরিজন বা ঈশ্বরের লোক আখ্যা দেওয়া হল। উচ্চবর্ণের লোকেরা হরিজনদের উপরে নানা অত্যাচার অব্যাহত রাখল।

এইসময় বিখ্যাত হরিজন নেতা ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর হরিজনদের দুর্দশা দূর করবার জন্য, তাদের উন্নতি ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। বর্ণভিত্তিক সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখাতে হলে, সেই সমাজের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়। এইসময় আম্বেদকর হাতিয়ার স্বরূপ ভারতীয় আদর্শে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্মকেই বেছে নিলেন। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণদের অত্যাচার উপেক্ষা করে এদেশে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধদের মধ্যে জাতিভেদ বা বর্ণবিদ্বেষ না থাকায় বৌদ্ধরা খুব সহজেই হরিজনদের আপন করে নিল। এইসময় (সম্ভবত ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে) ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রায় তিন লক্ষ হরিজন সহ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মে যোগ দিলেন। এই ধর্মান্তর পরিগ্রহের পর মুম্বই, অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, বিহার সহ ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের হরিজনরা উচ্চবর্ণের নানা অত্যাচারে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হলেন। এরাই হলেন নব্য বৌদ্ধ বা Neo Buddhist. এরা বৌদ্ধ হল বটে কিন্তু বৌদ্ধদের সমস্ত আদর্শ বা নীতি এরা পুরোপুরি মানল না। নব্যবৌদ্ধরা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েও হরিজন হয়েই রইল। ধর্মীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সামাজিক পরিবর্তন ঘটেনি। হরিজনরা স্বেচ্ছায় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেনি, উচ্চবর্ণের অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছে।

নব্য বৌদ্ধদের (Neo Buddhist) আবির্ভাব ১৯৬০ সাল নাগাদ। আর প্রথাগত বৌদ্ধরা (Traditional Buddhist) রয়েছে যুগ যুগ ধরে। এতদ্‌সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরেও ইসলাম মৌলবাদীরা বাংলার মুষ্টিমেয় বৌদ্ধদের সন্দেহের চোখেই দেখত।

ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষের কারণে বাংলাদেশের ইসলাম কট্টরপন্থী মৌলবাদীরা একথা ভুলে গেল যে, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি"- শহীদুল্লাহ। তথাপি মুষ্টিমেয় কিছু বৌদ্ধরা বাংলাদেশে আজও টিকে আছে। হিন্দু-মুসলমান সবাই বৌদ্ধদের উপর কোনো না কোনো সময় অত্যাচার করেছে। কিন্তু ধর্মের উপর আস্থা রেখে বৌদ্ধরা মুখ বুজে সবকিছু সহ্য করেছে- কোনো প্রতিবাদ করেনি, শুধু ধর্মের উপর আস্থা রেখেছে। আর খুব সম্ভবত সেই কারণেই এদেশের বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাসীরা বাংলাদেশের আর কোনো অঞ্চলে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে না পেরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে শুধুমাত্র চট্টগ্রামে আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখল। স্বীয় প্রচেষ্টায় ধর্মীয় আদর্শে অনুগত থেকে বাংলার বৌদ্ধরা হতোদ্যম না হয়ে, পিছনে না তাকিয়ে যুগের সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে গেছে। আর সেই কারণেই তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। নানা বৃহত্তর জাতির মানুষের ভিড়ের মধ্যে বাংলার বৌদ্ধরা আজও তাদের দীপ্ত প্রতিভার ঔজ্জ্বল্যে মাথা উঁচু করে আছে। এক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় প্রমথ চৌধুরীর উক্তি প্রনিধানযোগ্য – "বাঙালী সভ্যতার বুনিয়াদ যে বৌদ্ধ, হিন্দু স্তরের দুহাত নিচেই যে বাংলার বৌদ্ধস্তর পাওয়া যায়, আজকের দিনে তা প্রমাণ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের মাটি দুহাত খুঁড়লেই আমরা অসংখ্য বৌদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষের সাক্ষাৎ পাই।" চট্টগ্রামে কোণঠাসা মুষ্টিমেয় বাঙালি বৌদ্ধরা আজও বুদ্ধের ধর্মকে ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেয়নি। বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতবর্ষ থেকে মুছে গেলেও তা টিকে রইল একমাত্র চট্টগ্রামে – এই কৃতিত্ব ইতিহাসে বিরল।

সহায়ক গ্রন্থ

১) বৌদ্ধধর্ম – হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
২) ভগবান – ধর্মানন্দ কোসম্বী।
৩) বাঙালীর ইতিহাস – নীহাররঞ্জন রায়।
৪) বাংলার ইতিহাস – রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫) বাংলায় বৌদ্ধধর্ম – ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া।
৬) বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান – ডঃ বি.এম.বড়ুয়া ও অন্যান্য।
৭) রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি – সুধাংশু বিমল বড়ুয়া।

....

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম : প্রভাব ও পরিণতি

তনুশ্রী বিশ্বাস

বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব ক্ষণিকবাদ। এর মূলকথা হল সব-কিছুই সতত পরিবর্তনশীল, তাই স্থায়ী সত্তা বলে কিছু নেই। দুঃখের বিষয় বৌদ্ধধর্ম নিজেই এই ক্ষণিকবাদের স্বীকার। গৌতমবুদ্ধ নতুন কোনো ধর্মের প্রবর্তন করেননি। তাঁর উক্তিতেই পাই – তাঁর আগে বহু বুদ্ধ বর্তমান ছিলেন। তিনি স্বয়ং বুদ্ধ পরম্পরার ফল। বৌদ্ধধর্মের উদ্‌গাতা না হলেও মহাযান ধর্মে গৌতমবুদ্ধকে সর্বোচ্চ দেবতা বলে মনে করা হয় এবং এই মহাযান বৌদ্ধধর্মই পরবর্তীতে বাংলায় প্রসারতা লাভ করে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বিশেষ আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে সহজ প্রাঞ্জল গ্রাম্যভাষা, সময়োপযোগী প্রসঙ্গ, সযৌক্তিক, সুবোধ্য মধুরভাষণকে সম্বল করে গৌতমবুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিশেষ প্রয়াসী হয়ে ওঠেন।

যে কোনো ধর্মের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে রাজানুকূল্য। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও প্রচার ও প্রসারের মূলে রাজশক্তির সহায়তাই স্পষ্ট। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ও খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে উত্তর ভারতে মগধরাজ বিম্বিসার, কোসলরাজ পসেনদি ও বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রুর পৃষ্টপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রভূত প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। এরপর খ্রিঃপূঃ ৪র্থ শতকে শিশুনাগবংশীয় রাজা কালাসোক ও নন্দ বংশীয় রাজাদের সহায়তায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার লাভ ঘটে। এরপর মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রসার যে অব্যহত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মে পরিণত হয়। অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তর-পূর্ব ভারতের পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসে যে ধর্ম বর্হিভারতে জায়গা করে নিচ্ছে তার প্রভাব থেকে বাংলাও যে মুক্ত থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। মনে করা হচ্ছে সম্ভবত সম্রাট অশোকের সময়েই বৌদ্ধধর্ম বাংলায় যথার্থরূপে প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রসার সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে বলে নেওয়া ভালো যে সেইসময় বাংলা মূলত পুণ্ড্র, সমতট, তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে বিভক্ত ছিল।

পুণ্ড্রনগর মৌর্যযুগে ছিল মৌর্যসাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তপ্রদেশ। বর্তমান কালের বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, ও বগুড়া জুড়ে ছিল এই পুণ্ড্রবর্ধন নগর – রাজধানী। পূর্বভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠেছিল এটি। শুঙ্গ ও কুষাণযুগেও এই ধারা ছিল অব্যাহত। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে মগধের সিংহাসনে ব'সে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী গুপ্ত রাজারা রাঢ় ও পুণ্ড্রে প্রাধান্য বিস্তার করলেও বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতির জগতে এর বিশেষ প্রভাব পড়েনি।

এরপরবর্তী কালে সপ্তম শতকে গৌড়ের সিংহাসনে রাজা শশাঙ্কের অধিষ্ঠানে বৌদ্ধধর্মের উপর আঘাত নেমে আসে। তার বৌদ্ধবিদ্বেষের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে প্রাচীন পুণ্ড্রদেশের বর্ধিতরূপ পুণ্ড্রবর্ধনের গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত। শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের কারণ হিসাবে জানা যায় শশাঙ্ক ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্ধনের রাজনৈতিক বিরোধের কথা। বৌদ্ধশ্রমণগণ হর্ষবর্ধনের পক্ষ অবলম্বন করলে শশাঙ্ক পুণ্ড্রসহ মগধ ও রাঢ়েও তাণ্ডব চালান। পাল আমলে পুণ্ড্রদেশে আবার বৌদ্ধধর্ম স্বমহিমায় ফিরে আসে এবং বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাব সুবিস্তৃত হয়। পালরাজারা ছিলেন মহাযান মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায়। পুণ্ড্রবর্ধনে মহাযান মতের সমাদর ছিল খুব বেশি। পুণ্ড্রে বৌদ্ধধর্মের উপর প্রবল আঘাত আসে একাদশ শতকে সেন আমলে। তথাপি বৌদ্ধধর্মাশ্রয়ী সমাজদেহ একেবারে ভেঙে যায়নি, আজও প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের পুণ্ড্রজনগোষ্ঠী প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মঠাকুরের প্রতীকে পূজা করেন মহামতি বুদ্ধকে।

সমতট প্রাচীন বাংলার এক সমৃদ্ধ জনপদ। বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী এবং ভারতের অন্তর্ভুক্ত ত্রিপুরার কিছু অঞ্চল নিয়ে সমতট অঞ্চল গঠিত ছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে সমতট সমুদ্রগুপ্তের করদরাজ্য ছিল। সম্ভবত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে সমতটে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ জৈনধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন।

বঙ্গ-সমতট তথা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ষষ্ঠ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমতটে বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটে। শক্তিশালী বৌদ্ধ খড়্গ রাজবংশ, দেবরাজবংশ ও চন্দ্ররাজ বংশের শাসন আমলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় কুমিল্লার লালমাই-ময়নামতি অঞ্চল বৌদ্ধ সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; গড়ে ওঠে বিহার-স্তূপ। একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সমতটে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মাশ্রয়ী বর্মণ রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের সচেতন প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার সাধন করা। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্মণ রাজবংশের পতন ঘটিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী সেন সম্রাট বিজয় সেন দক্ষিণপূর্ব বাংলার শাসনভার গ্রহন করেন। সেনরাজাদেরও সচেতন প্রচেষ্ঠা ছিল বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিস্তার ঘটানো। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অপসারণে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের পতন শুরু হলো। হিউয়েন সাঙ এর বর্ণনায় পরিস্ফুট হয় যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধধর্মকে ক্রমশ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করেছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলি ক্রমশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় এবং জনসাধারণ নিজেদের গৃহনির্মাণের জন্য ধ্বংসস্তূপ থেকে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে চলে যেতো। ক্রমে গৃহী বৌদ্ধরা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা স্বকীয়তা হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য সমাজের সাথে বিলীন হয়ে গেল, কেউ কেউ বেঁচে থাকার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলো, কেউ বৌদ্ধপ্রধান দেশগুলিতে পালিয়ে বাঁচলো। ফলে পৃষ্ঠপোষকতাহীন পরিবেশে বৃহদায়তন স্থাপনাগুলো অযত্ন-অবহেলা এবং

প্রাকৃতিক বৈরিতার কারণে ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যেতে লাগলো, আর এভাবেই মাটির নীচে চাপা পড়ে গেল বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম সভ্যতা—সমতট সভ্যতা।

তাম্রলিপ্তে সম্রাট অশোক নির্মিত বাইশটি বিহারের কথা জানতে পারা যায়, যেখানে সারা বাংলায় তিনি মোট সত্তরটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। অশোকের সময়ে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। মন্ত্রী পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বৃহদ্রথকে হত্যা করে মৌর্য বংশের অবসান ঘটিয়ে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ১৮৭-১৪৮ খ্রিঃ পূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন চালাতেন। কিন্তু পরবর্তী শুঙ্গ নরপতিরা সেরূপ ছিলেন না। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। শুঙ্গ যুগের বহু পোড়া মাটির নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলার চন্দ্রকেতুগড় ও মহাস্থানগড়ে। এসময়ে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল এবং বৌদ্ধদের অবস্থাও ভালো ছিল। সম্রাট অশোকের পর বৌদ্ধধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট কণিষ্ক। তাঁর রাজত্বকাল ছিল ৭৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর শাসনকালে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হিউয়েন সাঙের বিবরণীতে কণিষ্কের পূর্বভারত জয়ের আভাস পাওয়া যায় এবং পরবর্তীকালে তমলুক, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বাংলাদেশের বগুড়াতেও কণিষ্কের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এজন্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বাংলায় একটি অংশ তার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। গুপ্তযুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজানুগ্রহ না পাওয়ায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমাবনতি শুরু হয়। সে অবস্থার প্রতিফলন বাংলাতেও অনুভূত হয়। তবে গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও নরসিংহ গুপ্ত বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বুধগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত ও বালাদিত্য গুপ্ত প্রমুখ গুপ্ত-নরপতিরাও বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন। গুপ্তযুগে (খ্রিষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৫ম) অধিবাসীদের সিংহভাগ বৌদ্ধধর্মের নীতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন এবং হিন্দু-বৌদ্ধ সহাবস্থান বর্তমান ছিল। তাম্রলিপ্ত ছিল প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ও বৌদ্ধশিক্ষাকেন্দ্র। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন এখানে ৪৪ টি সংঘরাম দেখেছিলেন, আর দেখেছিলেন বহু সংখ্যক ভিক্ষু। তাঁর মতে এটা বৌদ্ধ প্রধান দেশ ছিল। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে আসেন হিউয়েন সাঙ। এসময় উত্তর ভারতের প্রভাবশালী রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন। হিউয়েন সাঙ এসময়ে এখানে দশটি বৌদ্ধবিহার ও একসহস্র ভিক্ষু দেখতে পেয়েছিলেন। এরা সকলে সর্বাস্তিবাদী (মহাযান) ভিক্ষু ছিলেন। হিউয়েন সাঙ-এর ৪৪ বছর পরে আসেন ইৎ-সিঙ। তিনি এখানে এসে মাত্র ৪/৫ টি বৌদ্ধবিহার দেখতে পান। তাঁর ভ্রমণকালে এখানকার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বিহার ছিল 'পো-লো-হো' বা বরাহ বৌদ্ধবিহার। এই তিনজন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তাম্রলিপ্তে ক্রমে বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ ছিল

ব্রাহ্মণ্যধর্মের আক্রমণাত্মক নীতি।

কর্ণসুবর্ণ ছিল বাংলার একটি প্রাচীন নগরী, যেটি একসময় গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের
রাজধানী ছিল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাঢ় অঞ্চলের মধ্যভাগ ও উত্তরবঙ্গ থেকে
গুপ্ত রাজাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায়। এই সুযোগে ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্ক নিজেকে গৌড়
অধিপতি বলে ঘোষণা করেন। সেইসময়ে এ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বৌদ্ধ বাস করতেন।
বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে পরিচিত শশাঙ্ক কিন্তু গৌড়ের বৌদ্ধদের উপর কোনো অত্যাচার চালাননি,
যেটা প্রশাসক হিসাবে তার দক্ষতারই প্রমাণ দেয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তার
উত্তরাধিকারীকে রাজা হর্ষবর্ধন সিংহাসন চ্যুত করেছিলেন। এরপর এ নগরী আস্তে আস্তে
গুরুত্ব হারিয়ে মধ্যযুগে একেবারে অবলুপ্তির পথে ঢলে পড়ে। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে
জানা যায় ভগবান তথাগত এ নগরীর উপকণ্ঠে সাতদিন অবস্থান করে সদ্ধর্ম প্রচার
করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে এখানে বহুতল বিশিষ্ট রক্তমৃত্তিকা
মহাবিহার, অশোক নির্মিত স্তূপ ও দশটি বিহার বর্তমান ছিল।

খ্রিষ্টীয় সপ্তম থেকে দশম শতকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের খ্যাতি, প্রচার, প্রসারতা সবচেয়ে বেশি ছিল, বলা যেতে পারে বাংলায় এই সময়টা ছিল বৌদ্ধধর্মের স্বর্ণযুগ, যা মূলত পালযুগ। একটু অনুসন্ধান করলে জানা যায় এইসময় উত্তরভারতে মৌখরি, সোলাঙ্কি, পার্মার, চান্দেল্য, মারোয়ার, মেবার, রাঠোর শিসোদীয় বংশের কেউই-বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন না। রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব বৌদ্ধধর্মকে পুরোপুরি পূর্বাভিমুখী করে তুলেছিল। পাল আমলেই ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান দীপশিখা বাংলা ও বিহারকে আশ্রয় করে উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে প্রকাশ পায়। পালরাজগণ প্রতিষ্ঠিত ওদন্তপুরী, সোমপুরী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল প্রমুখ বিহার ধর্ম, দর্শন ও বিদ্যাচর্চার বিশিষ্ট-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। পাল আমলেই বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলার বৌদ্ধধর্মকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেন। সে বাংলাদেশ ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের রূপ ও রীতি নির্ধারণ করেছিল, যবদ্বীপ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, সেই বাংলা থেকেই বৌদ্ধধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেল। এই অবলুপ্তির কারণ কী ছিল তা এখন দেখে নেওয়া যাক।

হিউয়েন সাঙ-এর বর্ণনানুযায়ী গৌড়রাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধদের উপর সে নিদারুণ আঘাত হানেন, তাতে বৌদ্ধধর্মের অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হয় এবং বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপী বৌদ্ধধর্ম হীনবল হয়ে পড়ে। বাংলায় পালরাজাগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের শেষ পৃষ্ঠপোষক। তাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের রাজকীয় আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতার অবসান ঘটে; বৌদ্ধধর্মে ঘোর বিপর্যয় নেমে আসে এবং ক্রমশ বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়ে

কালক্রমে তা হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত হয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী সেন রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল, অল্পসংখ্যক বিহার যদিও অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং অনুমান করা যায় যে সেনরাজারা বৌদ্ধদের উৎপীড়ন হয়তো করেননি কিন্তু এটি স্পষ্ট যে তাদের বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল। সেনরাজ্যের পরিমণ্ডল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে অনুকূল ছিল না। সুতরাং রাজানুকূল্যের অভাব বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবনতির একটি অন্যতম কারণ রূপে বিবেচ্য।

ড. অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বৌদ্ধধর্মের মূলসূত্র ঐকান্তিক 'দুঃখবাদ' কে এই ধর্মের বিপর্যয়ের একটি কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। প্রচারের প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্মের নতুন রূপের চমক সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করলেও পরবর্তীতে তত্ত্বমূলক দুঃখবাদ সাধারণ মানুষকে নিরুৎসাহই করেছিল। তাই বৌদ্ধধর্মের দুঃখতত্ত্ব এই ধর্মের বিপর্যয়ের একটি কারণ বিশেষ।

উত্তরভারতে প্রধানত সপ্তম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী - এই পাঁচশো বছরের মধ্যে কুমারিল ভট্ট, শংকরাচার্য, উদয়নাচার্য, রামানুজাচার্য প্রমুখ ধর্মাচার্যগণের দ্বারা হিন্দুধর্ম বহুল প্রচারিত হয়েছিল। ধর্মাচার্যগণের চরিত্রের প্রভাবে ও তাদের প্রচারিত দার্শনিক ধর্মমতের প্রভাবে লোকসাধারণ প্রভাবান্বিত হয়ে নব উদ্যমে হিন্দুসমাজের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়েছিল। ভৌগোলিক নৈকট্যে অবস্থিত পূর্বভারত তথা বাংলাতেও তার প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক।

হিন্দুবৌদ্ধ সহাবস্থান ও বৌদ্ধধর্মের উপর হিন্দুধর্মের প্রভাব বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ। পালরাজগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও অন্যান্য দেশীয় আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই অনুসরণ করতেন। লিখিত উপকরণ ও স্থাপত্যকলার নিদর্শন প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পালযুগে পাশাপাশি মিলেমিশে সহাবস্থান করতো। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী রাজা ধর্মপালদেবের 'খালিমপুর তাম্রপট্টের' উল্লেখ করা যায়, যেখানে ধর্মপালদেবের সঙ্গে তাঁর সুযোগ্য পত্নীর সম্পর্কের বর্ণনাতে তুলনা করা হয়েছে বিভিন্ন দেব-দেবীর সম্পর্কের। দশম-একাদশ-শতাব্দীতে বুদ্ধ বাসুদেবের সহাবস্থান, ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী বৈষ্ণবরাজাদের মহাযান দেবতাদের মন্দিরে মুক্তহস্তে দান এই মতকেই সমর্থন করে। বর্মণ রাজাদের সময়কালেও বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সমাদর লাভ করতো। পরবর্তীকালে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এ বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে বুদ্ধের অবস্থান দেখা যায়। শাক্তরাজাদের সময়কালেও দেখা যায় মহাযান দেবতামণ্ডলীর মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ, অন্যদিকে বুদ্ধও হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে সশ্রদ্ধ মুক্তহস্তে দান এই মতকেই সমর্থন করে। বর্মণ রাজাদের সময়কালেও বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সমাদর লাভ করতো। পরবর্তীকালে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এ বিষ্ণুর

অবতারদের মধ্যে বুদ্ধের অবস্থান দেখা যায়। শাক্তরাজাদের সময়কালেও দেখা যায় মহাযান দেবতামণ্ডলীর মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর অনুপ্রবেশ, অন্যদিকে বুদ্ধও হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে সশ্রদ্ধ স্থান করে নিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যধর্ম বৌদ্ধদেবতাদের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধ 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকসূত্রে' ব্রহ্মা প্রজাপতির উল্লেখ আছে এবং বুদ্ধকে পিতামহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাযান বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের অনেকাংশই গ্রহণ করেছিল, অন্যদিকে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মের মূল অংশগুলিই সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে নিয়েছিল। আধুনিক হিন্দুধর্মের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ বহুলাংশেই অজ্ঞাতসারে সমাহত হয়েছে এবং বুদ্ধ ধীরে ধীরে হয়েছেন – 'a maker of modern Hinduism'

বৌদ্ধধর্মের গুণগত মানের অবনমন বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ডেকে এনেছিল। কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে জলন্ধরে ৪র্থ বৌদ্ধ সংগীতির সময়কালে মহাযান বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে এবং তা মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান প্রভৃতি নানান শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। বস্তুত পালরাজাদের সময়কালে বাংলাদেশে বিভিন্ন যান বা বিভিন্ন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেই প্রচলন দেখা যায়, যেগুলি মূল বৌদ্ধধর্মের অশেষ ক্ষতি সাধন করে ধর্মের মধ্যে বিকৃতি আনয়ন করে। মাহাযান বৌদ্ধধর্ম নিঃসন্দেহে যেমন বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তৃতির জন্য প্রশংসনীয় তেমনই মহাযানই বৌদ্ধধর্মের অধঃপতন ত্বরান্বিত করেছিল।

বৌদ্ধধর্ম সহজ করতে গিয়ে, নির্বাহ সহজ করতে গিয়ে, অদ্বয়বাদ সহজ করতে গিয়ে, সহজযানীরা যে মত প্রচার করলেন, তাতে ব্যভিচার সীমাহীন হয়ে উঠল, ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'নেড়ানেড়ির দলে' গিয়ে দাঁড়াল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায় যে গান লিখতে আরম্ভ করলেন, তার গূঢ়ার্থ অতি ভয়ানক তা মূলত দেহতত্ত্বের গান, চর্যাপদ।

১০৯০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা নাটক 'প্রবোধচন্দ্রদয়' থেকে জানা যায় – বৌদ্ধভিক্ষুরা রেশমের কাপড় পরেন। পুঁথি পড়েন– কিন্তু সে পুঁথির পাটায় সোনালি কাজ করা, যে কাপড়ে পুঁথি বাধা থাকে, তা রেশমের, তার উপর নানারকম কাজ করা। ভিক্ষুরা তখনো খুব বাবু, বিলাসী ও তার উপর ইন্দ্রিয়াসক্ত। এটা অধঃপাতের একটা দিক।

মহাযান ধর্ম খুব উঁচু ধর্ম। কিন্তু মহাযান বুঝতে, আয়ত্ত করতে ও মহাযানের মতো কর্ম করতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করতে হয় – অনেক পড়তে হয় – অনেক ভাবনাচিন্তা, করতে হয়। তাই- মহাযানের আচার্যেরা একটা সহজপথ দেখালেন। তাঁরা বললেন – 'ধারণী মুখস্থ করো- 'ধারণী' জপ করো – ধারণীর পূজা করো।' তাহলেই মহাযানের পাঠ স্বাধ্যায়-যোগ সকলের ফললাভ হবে। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ালে – এক অক্ষর, দু'অক্ষর মন্ত্র তৈরি হতে থাকলো। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো। যে মহাযান ধর্ম চিন্তাশক্তির চরমসীমায় উঠেছিল, মন্ত্রযানে তা

ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহা'য় দাঁড়ালো। মহাযানীদের মধ্যে ধর্মের সরলীকরণ করবার জন্য সাধারণ উপাসক ও ভিক্ষুদিগের মধ্যে প্রভেদ প্রায় তুলে দেওয়া হয়, যার ফলে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি এর সুযোগ গ্রহণ করে এবং সংঘের মান গুণগত দিক থেকে নিম্ন থেকে নিম্নস্তরে নামতে থাকে।

বুদ্ধ দেবতা মানতেন না, তাঁর মৃত্যুর চার পাঁচ শতকের মধ্যেই বৌদ্ধবিহার গুলিতে প্রথমে বুদ্ধের প্রতীক চিহ্ন ও পরে বুদ্ধমূর্তিপূজার প্রচলন হয়। শিষ্যরা শেষে ডাক-ডাকিনী, প্রেত-প্রেতিনী, পিশাচ-পিশাচিনী, ভৈরব-ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করে নিজেরা অধঃপাতে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে দেশটা শুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হলো। লুকিয়ে লুকিয়ে পূজো করবো কাউকে দেখতে দেবোনা : এ পূজোর অর্থ কী? অর্থ এটাই যে, সে সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বের করা যায় না। মূর্তির নাম শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি– তাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈরি হওয়ায় অশ্লীলতার মাত্রা চড়ে গিয়েছিল। সেইসকল মূর্তি যখন বৌদ্ধদের প্রধান উপাস্য হয়ে দাঁড়ালো– তখন আর অধঃপাতের বাকী কী রইলো ? 'গুহ্যসমাজ' বা 'তথাগত-গুহ্যক' নামে বৌদ্ধদের একটি পুঁথি আছে – সেখানে যেমন ক্রিয়াকর্মের উপদেশ দেওয়া তা থেকে ভয়ানক ও ঘৃণিত মত কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। সর্বপ্রকার কামোপভোগের মাধ্যমে সিদ্ধি লাভের চেষ্টায় অধঃপাতের আর বাকী কিছু রইলো না।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পাঁচ-ছয়শ বছর পর থেকে শাক্যমুনি বুদ্ধ বিবাহিত ছিলেন এই যুক্তিতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করতে আরম্ভ করায় একদল গৃহস্থ ভিক্ষুর পরিচয় পাওয়া যায়। 'বৌদ্ধভারত' গ্রন্থে বর্ণিত আছে গৃহস্থ ভিক্ষুদল গঠনের পরমুহূর্ত থেকেই বৌদ্ধধর্মে ঘুণ ধরতে আরম্ভ করে। গৃহস্থ ভিক্ষুদের 'আর্য' নামে অভিহিত করা হতো এবং ক্রমে গৃহস্থ ভিক্ষুরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ওই সকল গৃহস্থ ভিক্ষুর সন্তানরা আপনা আপনি ভিক্ষু বলে পরিচিত হতো। গৃহস্থ ভিক্ষুরা সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির ন্যায় একাধারে কাজকর্ম করে জীবিকানির্বাহ করতেন আবার ভিক্ষান্নগ্রহণ, ধর্মকর্ম, পূজাপাঠ ইত্যাদিও করতেন। কিন্তু বেশি লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তার অবসর তাদের থাকতো না। এভাবে বৌদ্ধধর্মের পৌরাহিত্যের কাজটি মূর্খদের হাতে পড়ে বৌদ্ধধর্মের ক্ষতি হতে লাগলো। অপর দিকে প্রকৃত ভিক্ষুরা কিন্তু বিহারেই থাকতেন এবং রাজনৈতিক আনুকূল্যের অভাবে দুরন্ত আর্থিক সঙ্কটে পড়ে বিহারের জমিজমার আয় থেকেই কোনরূপে জীবন ধারণ করতেন। চরিত্রহীন, পাপাচারযুক্ত সামাজিক বৌদ্ধগণের ক্রিয়াকাণ্ডে লোকসাধারণের মনে বৌদ্ধ সমাজের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্ম নিলে বৌদ্ধসমাজ ধর্মবলহীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে।

বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূত-প্রেতের উপাসক হয়ে যে অধঃপাতে গিয়েছিল,

মুসলমান আক্রমণ খানিকটা তারই প্রায়শ্চিত্ত। ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূত-প্রেত পুজো করে বুজরুক হবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকে ধর্ম বলে মনে করা ও তা শেখানো– পরিণামে তাদেরকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়তে হলো। তাদের সমূলে উচ্ছেদের জন্যই যেন মুসলমান আক্রমণ।

একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলজি বিহারের ওদন্তপুরি মহাবিহারটি আক্রমণ করে তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। অগ্নিসংযোগ দ্বারা হত্যালীলা চালিয়ে তিনি বৌদ্ধ সাহিত্যের বহু অমূল্য পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করেন ও দু'হাজার অসংখ্য বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের চেষ্টা করেন। পাথরের মূর্তিগুলি ভেঙে চুরে ফেলা হয়, সোনা-রূপা-তামা-পিতল, কাঁসার মূর্তিগুলি গালিয়ে ফেলা হয়। বিক্রমশীলা, নালন্দা, সোমপুরী ও জগদ্দল প্রভৃতি বড়ো বিহারের একই দশা হয়। জ্ঞানীগুণী ভিক্ষুর অভাবে ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টায় দিশেহারা বৌদ্ধ জনসাধারণ আত্মরক্ষার তাগিদে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, অনেকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার নিম্নবর্ণে স্থানলাভ করে বৃহত্তর হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশে যায়। বাকীদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা বৌদ্ধধর্মকে টিকিয়ে রাখা। মুসলমান ও ব্রাহ্মণ্য উভয় ধর্মের যাড়াশী আক্রমণে বৌদ্ধভিক্ষুরা দেশ ছেড়ে নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, বার্মা, সিংহলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

তবে ধর্মীয় অত্যাচার একটি ধর্মের অগ্রগতির পক্ষে প্রতিবন্ধকতা আনয়ন করে কিন্তু একটি অত্যন্ত সুপ্রচলিত ধর্মকে হত্যা করতে পারে না। মুসলমানগণ সমপরিমাণেই হিন্দু-মন্দির, হিন্দু-দেবদেবীর বিগ্রহ নষ্ট করেছে কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী অবহেলিত থেকেও হিন্দুধর্ম টিকে গেছে, বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে তা ঘটেনি। কারণ বৌদ্ধধর্ম আদৌ সামাজিক হয়ে উঠতে পারেনি, তা প্রধানত মঠ বিহারগুলিকেই বেষ্টন করেছিল। সামাজিক প্রভাব বিস্তারে বিফলতাই বৌদ্ধধর্মকে অস্তিত্ব-সঙ্কটে ফেলে।

তাহলে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের কারণ হিসেবে রাজানুগ্রহ থেকে বৌদ্ধধর্মের বঞ্চনা, বৌদ্ধধর্মের দুঃখবাদ, শঙ্করাচার্য কুমারিল ভট্ট প্রমুখ হিন্দু সংস্কারকদের উত্থান, মূর্তিপূজা গ্রহণের ফলে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য-বিলুপ্তি, বৌদ্ধসঙ্ঘে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ, বৌদ্ধভিক্ষুদের বিলাসপ্রিয় জীবনযাপন, ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ও বৌদ্ধদের উপর অত্যাচার এবং সামাজিক প্রভাব বিস্তারে বিফলতাকেই দায়ী করা চলে।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ে সাহিত্যেও অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রস্থল বিহারগুলিতে রক্ষিত মূল্যবান অসংখ্য পুঁথি নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, পণ্ডিত বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যার কারণে ও মূর্খ গৃহস্থ ভিক্ষুর বিদ্যাচর্চার অনীহা তৈরি হওয়ায় এবং উজ্জ্বল মেধা সম্পন্ন সৃজনশীল মনীষার অভাবে বাংলার সাহিত্যভূমি যথার্থই শুষ্ক ও নিষ্ফলা থেকে যায়।

সৃজনশীল মনীষার অভাবে বাংলার সাহিত্যভূমি যথার্থই শুষ্ক ও নিষ্ফলা থেকে যায়।
এখানেই সেইসময়ের বিদ্যাচর্চা ও পুঁথিপাজির সমাপ্তি সূচিত হয়।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয় ঘটলেও অবলুপ্তি ঘটেনি। বৌদ্ধ দেব-দেবীরা নবীকরণের মধ্য দিয়ে হিন্দুব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে আছে। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর রূপকল্পনায়, পূজা-বন্দনায়, মন্ত্রসাধনায় বৌদ্ধধর্মের ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মের সারার্থকে অন্তরে ধারণ করে 'নাথধর্ম' বাংলাদেশের ধর্মসাধনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব' এবং সাধনার চরম প্রাপ্তি পরমানন্দ লাভ, সমস্ত ক্ষেত্রেই নাথধর্ম বৌদ্ধধর্মকে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধধর্মকে পরোক্ষে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। তৎকালীন বাংলাদেশের ইসলামধর্মও বৌদ্ধধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছিল। ইসলামী সুফিসাধনা, বেদর-ফকিরি ধর্মাচরণের মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির মিল দেখা যায়। বৌদ্ধধর্ম আজও বহুলাংশে বেঁচে আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বৌদ্ধ জনজাতি হিসাবে যাদের দেখা যায়, তারা কেউই এখানকার ভূমিপুত্র নয়। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাজনের সময় পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসে বসতি স্থাপন করেছে ধর্মরক্ষার্থে কারণ এই দেশ প্রতিরূপ নয়। ২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৮,০১,৭৬,১৯৭। ধর্মের ভিত্তিতে চিত্রটা এইরকম –

হিন্দু ৫,৮১,০৪,৮৩৫ (৭২%)
মুসলিম ২,০২,৪০,৫৪৩ (১৫%)
খ্রিস্টান ৫,১৫,১৫০ (০.৬৪%)
বৌদ্ধ ২,৪৩,৩৬৪ (০.৩০%)
শিখ ৬৬,৩৯১ (০.০৮%)
জৈন ৫৫,২২৩ (০.০৭%)

– অর্থাৎ সংখ্যাগতভাবে পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের স্থান ছিল চতুর্থ।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মহাবোধি সোসাইটি, বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন এর চেষ্টায় বহুজন এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। কোন ধর্মই পুরোপুরি অবলুপ্ত হয়ে যায় না, কোনো না কোনোভাবে তার ক্ষীণধারা বয়েই যায়। যদিও বহুধা বিকৃত রূপটি হয়তো আর সেভাবে চোখে পড়ে না।

আজকের অস্থির রাজনৈতিক সমাজ পরিস্থিতিতে বৌদ্ধধর্ম তার স্বমহিমায় প্রকাশিত হয়ে

'জন-গণ-মণে' প্রভাব বিস্তার করতে পারলে বাংলায় ফিরে আসতে পারে শান্তির বাতাবরণ

গ্রন্থপঞ্জি –

১. "স্বদেশ সভ্যতা ও বিশ্ব" – জীবন মুখোপাধ্যায়
২. "বাংলায় বৌদ্ধধর্ম" – নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন
৩. "বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস" – ডঃ মণিকুন্তলা হালদার (দে)
৪. "হরপ্রসাদশাস্ত্রী রচনা – সংগ্রহ", তৃতীয় খণ্ড ।

....

বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ চেতনা

ড. সুকন্যা সরকার

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার একটি ধর্মমতের মধ্যে পরিবেশ চেতনার অনুসন্ধানকে আপাতভাবে অসঙ্গত বলে মনে হতে পারে। কেননা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আধুনিক পরিবেশ বিদ্যা চর্চার সূত্রপাত।[১] এই সাম্প্রতিক চর্চার আলোকে সুদূর অতীতের কোন ধর্মের গূঢ় দর্শনের বিশ্লেষণ কতখানি যুক্তিযুক্ত? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, পরিবেশের সঙ্কট বা বিপর্যয় অবশ্যই আধুনিক সভ্যতার ফসল। কিন্তু পরিবেশগত কিছু সমস্যা, যেমন, দূষণ, অরণ্যচ্ছেদন প্রভৃতি মাত্রায় আজকের তুলনায় ঢের কম হলেও সভ্যতার সহজাত। প্রবহমান সভ্যতার নানা বাঁকে মানুষকে বারবার পরিবেশের সঙ্গে এবং উদ্ভিদ ও জীবজগতের সঙ্গে নিজের সম্পর্ক পুনর্নির্ধারণ করতে হয়েছে। গড়ে তুলতে হয়েছে পরিবেশের অন্তর্দ্বন্দ রক্ষাকারী আত্মসমীক্ষা ও বিশ্ববীক্ষার কৌশল।

যিশুখ্রিস্টের জন্মের ছশো বছর আগে ভারতের ইতিহাসে এমন কিছু নতুন পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যাতে পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে নতুন করে ভাবতে হয়েছিল। লোহার হাতিয়ারের সাহায্যে অথবা বন পুড়িয়ে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্যাপক অরণ্যচ্ছেদন ছিল কৃষির প্রসারের সঙ্গে জড়িত। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগতির ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণের উদ্ভব হয়েছিল। এইসব নতুন পরিবর্তনের ধাক্কায় খুব স্বাভাবিকভাবেই বদল ঘটছিল উদ্ভিদ ও জীবের স্বাভাবিক বসতভূমির চরিত্রে। অরণ্যের সঙ্গে হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছিল বন্যপ্রাণীর সংখ্যা। এর পাশাপাশি কৃষি, পরিবহন ও অন্যান্য কাজে পশুশক্তির ব্যবহার বাড়ছিল। ফলে, বৈদিক ধর্মীয় আচার যা পশুসম্পদ নিধন করে এবং যজ্ঞসমিধ আহরণের স্বার্থে বৃক্ষসংহার করে, আর নতুন যুগের উপযোগী থাকেনি। প্রয়োজন হয়েছিল পরিবর্তিত সময়ের সঙ্গে মানানসই ধর্মচিন্তার। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উত্থান সেই যুগচাহিদাকে পূরণ করেছিল।

বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ চেতনার অন্বেষণের ইতিহাসের সূত্রপাত প্রায় অর্ধশতক আগে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমী গবেষক লিন হোয়াইট পরিবেশ সঙ্কটের ঐতিহাসিক উৎসের খোঁজ করতে গিয়ে বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী মানুষের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলেছিলেন।[২] তার মতে, মানুষ পরিবেশের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক গড়ে তুলবে তা নির্ভর করে নিজের সম্পর্কে, প্রকৃতি সম্পর্কে এবং প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক সম্বন্ধে সে কী ভাবছে তার ওপর। অনেক সময় তার এই ধারণা ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। বৌদ্ধধর্মে একক বিশ্বস্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানা হয়নি, বরং অনেক বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বিশ্বের বিবর্তনের ধারণা।

অগণ্যসূত্তে বলা হয়েছে সৃষ্টির আদিতে পৃথিবী মাখনের মত পদার্থে ঢাকা ছিল।[৩] মানুষের কর্মফলে পৃথিবী ক্রমে তার উর্বরতা হারাল। স্বতঃউৎপাদিত ফসল আর ফলল না, মানুষকে শ্রম দিয়ে চাষ করতে হল। মানুষের আচরণ যে পরিবেশকে পরিবর্তিত করে তার ইঙ্গিত রয়েছে বৌদ্ধধর্মের কর্মতত্ত্ব এবং কার্য-কারণ অনুসন্ধান প্রবণতার মধ্যে।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ চেতনার অনুসন্ধান বিষয়ে লেখালেখি উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। যেহেতু এই ধর্ম আন্তর্জাতিক স্তরে পরিব্যাপ্ত, দেশ-বিদেশের গবেষকদের আগ্রহের পরিণামে বিষয়টি সমৃদ্ধ হয়েছে। ১৯৭২ সালে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার বছরেই নরওয়ের আরনে নায়েস তার ডীপ ইকোলজি তত্ত্ব পেশ করেছেন।[৪] যেখানে পরিবেশ বিষয়ক ধ্যানধারণা শুধু মানুষ কেন্দ্রিক নয়। যার সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বাণী অসম্ভব সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওই দশকেই ফ্রিৎজফ কাপরা এবং জেমস লাভলকের গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।[৫] এইসব বইয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে বিজ্ঞান, পরিবেশ এবং বৌদ্ধধর্মের যোগসূত্র। ক্রমে বিশ্বজুড়ে গড়ে উঠেছে 'গ্রিন বুদ্ধিজিম' তত্ত্ব - বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আধুনিক পরিবেশ চেতনার সম্ভাব্য লক্ষণগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে। তবে ১৯৯০এর দশকে এই আলোচনার বৃত্তে ঢুকে পড়েছে কিছু বিতর্কিত প্রশ্ন, আয়ান হ্যারিস এবং ল্যাম্বার্ট স্কমিথাওসেন প্রমুখের গবেষণার দৌলতে।[৬] এগুলো যথা প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাবে।

প্রায় সব গবেষকরাই বুদ্ধের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক বোঝাতে গিয়ে তাঁর জীবনের প্রধান ঘটনাবলির সঙ্গে গাছের যোগ দেখিয়েছেন। জন্ম এবং মহাপরিবির্বাণ - দুইই ঘটেছিল শাল গাছের তলায়। আর তাঁর সম্বোধি লাভ হয়েছিল একটি অশ্বত্থগাছের ছায়ায়। যেটি বোধিবৃক্ষরূপে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ও পূজিত বৃক্ষ। বুদ্ধত্ব লাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন হয়েছিল মৃগদাবে (বর্তমান সারনাথের ঋষিপতন), যা ছিল এক সংরক্ষিত মৃগ অরণ্য। জেতাবন, রাজগৃহে জীবকের বেণুবন প্রভৃতি উদ্যানের নাম বৌদ্ধসাহিত্যে পাওয়া যায়। বুদ্ধ অনেক সময় এইসব উদ্যান থেকে তাঁর বাণী প্রচার করতেন। ভিক্ষুরাও মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে সাধনা করার নির্দেশ পেয়েছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও উল্লেখ্য যে, বুদ্ধ অনেক সময় সচেতনভাবে নগরকে তাঁর কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিতেন। নতুন গড়ে ওঠা নগর, তার বণিক, শ্রমজীবী মানুষ, সমাজের প্রান্তিক মানুষ, যারা নানা জীবিকার সন্ধানে নগরে জড়ো হয়েছেন তাদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তাই বুদ্ধ নগরবিমুখ প্রকৃতিমুগ্ধ ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। নগরের অপরিহার্যতা স্বীকার করে নিয়েই তিনি বুদ্ধ প্রকৃতির সংরক্ষণের কথা বলেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে গাছ কাটার ওপর বিধিনিষেধ ছিল, ভিক্ষুদের বলা হত এর অবদান

স্বীকার করে শ্রদ্ধাবনত হওয়ার। শুধু নিষেধাজ্ঞা আরোপই নয়, গাছের অকালমৃত্যু ঘটানো রীতিমত অপরাধ বলে গণ্য হত।[৭] বুদ্ধ আধ্যাত্মিক যজ্ঞের প্রশংসা করেছিলেন। কারণ, তাতে বৈদিক যজ্ঞের মত বৃক্ষসংহারের প্রয়োজন হয় না।[৮] সেতু বা যাত্রীনিবাস নির্মাণের মত বৃক্ষরোপণও বৌদ্ধধর্মে একটি পুণ্যকাজ বলে বিবেচিত হত, যা সকলের কল্যাণ করে।[৯] সবুজ ঘাস পশুদের খাদ্য, তাই তাকে দূষণমুক্ত রাখার ওপর জোর দেওয়া হত।[১০] জাতক কাহিনিগুলোতে বুদ্ধ যখন পশুপাখির রূপ পেয়েছিলেন সেইসময় বৃক্ষ, লতা এবং গুল্ম অর্থাৎ উদ্ভিদজগতের সঙ্গে তার সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্কের বর্ণনা পাওয়া যায়। স্পন্দনজাতকে পলাশ, বৃক্ষধর্মজাতকে শাল এবং কুণাল জাতকে রয়েছে কুরুবক থেকে মাধবীলতা – বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের এক অনুপুঙ্ক্ষ বিবরণ। এইসব জাতক কাহিনি ভারতের উদ্ভিদবৈচিত্র্য তুলে ধরেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাণী বৈচিত্র্য। আবার, কিছু কিছু জাতকে বৃক্ষদেবতার কথা বলা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু গাছ এবং উদ্যানকে বৌদ্ধধর্মের প্রতীকী রূপ বলে মনে করা হয়। বৃহৎ গাছ বা বনস্পতিকে উপাসনা করার চল ছিল, যাকে গণ্য করা হত বুদ্ধের পূর্বরূপ হিসাবে।[১১]

পরিবেশ-দূষণ এড়াতে বুদ্ধ মানুষকে সংযত আচরণ করার কথা বলেছিলেন। যেমন, জলে দেহজাত বর্জ্য নিক্ষেপ না করার এবং যত্রতত্র আবর্জনা না ছড়িয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে তা জড়ো করার অনুরোধ ছিল।[১২] আবর্জনার চৌবাচ্চা থেকে দূষণ রুখতে তাতে ঢাকনা লাগানোর জন্য বুদ্ধ অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন।[১৩]

নানা বৌদ্ধ সূত্রে পর্বতশিখরে জলাশয়গুলোর জলের স্বচ্ছতার গুণগান করা হয়েছে। স্বচ্ছ জল এবং তাতে শামুক ঝিনুক মাছেদের আনাগোনার দৃশ্য চিত্তকে প্রসন্ন করে বলে বর্ণিত হয়েছে।[১৪] জলের অপরিসীম গুরুত্ব- কি কৃষি উৎপাদনে, কি প্রাত্যহিক জীবনযাপনে- উপলব্ধি করে বুদ্ধ পুকুর, জলাশয় বুজিয়ে দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন।[১৫]

বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ চেতনার যে দিকটি গবেষক মহলে সবচেয়ে বেশি আলোচিত ও বিতর্কিত তা হল সর্বজীবে দয়া, করুণা ও মৈত্রীর তত্ত্ব। অন্যতম বৌদ্ধ শীল ছিল – পানং না হানে – প্রাণী হত্যা না করা। যদি কোন ভিক্ষু ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাণীহত্যা করতেন তবে তাকে অপরাধী বলে গণ্য করা হত। অনিচ্ছাকৃত প্রাণীহত্যা এড়াতে বৌদ্ধধর্মে নানা বিধান ছিল। বর্ষাকালে ভিজে আবহাওয়ায় যেসব কীটপতঙ্গ মাটির ওপর উঠে আসে তাদের অনভিপ্রেত মৃত্যু ঠেকাতে ভিক্ষুদের ওপর নির্দেশ ছিল বৃষ্টিতে বাইরে না যাওয়ার।[১৬] একই উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা থাকত মাটিতে গর্ত খোঁড়ার ওপর। অপরিশ্রুত জলপানও বারণ ছিল।[১৭] কারণ, তাতে যেমন স্বাস্থ্যহানি ঘটে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রাণীহত্যাও ঘটে। শুধু হত্যা থেকে বিরত

থাকাই নয়, বুদ্ধের আহ্বান ছিল মৈত্রীভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রাণীদের রক্ষা করার। রক্ষা কর ক্ষেত্রে বুদ্ধ সর্বোত্তম রক্ষণের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন – মা যেমন করে তার নিজের আয়ু ক্ষ করে নিজের একমাত্র পুত্রকে রক্ষা করে তেমনি সব প্রাণীর প্রতি অপরিমিত দয়াভা জাগিয়ে তুলতে হবে। উর্ধ্ব অধঃ – চারদিকের সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন, শত্রুতাহী মনোভাব এবং মৈত্রী রক্ষা করবে। যখন কেউ দাঁড়িয়ে আছে বা চলছে, বসে আছে বা শু আছে, যে পর্যন্ত তার নিদ্রা না আসে সে পর্যন্ত, এই ধরনের প্রীতির মনোভাব ধরে রাখা তিনি ব্রহ্মবিহার নাম দিয়েছিলেন।[১৮] তাঁর আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল যে সব প্রাণী সুখী হোক বৌদ্ধধর্মে কোন প্রাণীর অস্তিত্বই তুচ্ছ নয়, এমনকি যে প্রাণ এখনও অবয়ব পায়নি তাকে মেত্তা সূত্রে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে – দুর্বল বা শক্তিশালী, ছোট বা বড় মাঝারি বা অতিক্ষুদ্র, চোখে দেখা যায় বা যায় না, কাছের বা দূরের, যারা জন্মেছে বা যার জন্মায়নি, সবাই সুখী হোক।[১৯] সকল প্রাণী সুখী, শত্রুহীন, অহিংসিত হওয়ার পাশাপাশি যেন নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত না হয় – এই আবেদনও বুদ্ধের প্রার্থনায় ছিল।[২০]

মানুষকে প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল অঙ্গুত্ত নিকায়তে। যেমন, যেসব জলাশয়ে প্রাণী আছে সেখানে অবশিষ্ট খাদ্য নিক্ষেপের কথা ব হয়েছে।[২১] মচ্ছুদান জাতক কাহিনিতে বোধিসত্ত্ব এমনটাই করেছিলেন।[২২] শুধু ভিক্ষুদে আচরণবিধিতে নয়, সর্বপ্রাণের প্রতি শ্রদ্ধা ও সংরক্ষণের মনোভাব রাখতে হবে সর্বোচ্চ শাসক থেকে সাধারণ মানুষ, সকলকে। জনগণের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় ছিল কীভাবে গৃহপালিত পশুদের রক্ষা করা উচিত।[২৩] এমনকী বন্য পশুদের পোষ মানানোর সময়ে মৈত্রীর মনোভাব দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন, নালাগিরি নামে একটি হাতিকে বুদ্ধ তাঁর করুণা ও মৈত্রী দিয়ে পোষ মানিয়েছিলেন।[২৪] কিন্তু পশুর ওপর মানুষে কর্তৃত্ব ও নিজের স্বার্থে তাকে ব্যবহারের বিষয়টি পালি ধর্মগ্রন্থগুলোর কোথায় নিন্দিত হয়নি। ২০০২ সালে প্রকাশিত একটি বইয়ে পল ওয়ালদ নামে এক গবেষক এরকম অভিযোগ তুলেছেন।[২৫] তার বক্তব্য অনুযায়ী, বৌদ্ধ ধর্মে সম্পদ হিসাবে হাতির মালিকানাকে যথেষ্ট সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে দেখা হয়েছে। হাতির ব্যবসার বেশ রমরমা ছিল। আর্থিক লেনদেনে মাধ্যমে মালিকানার হাতবদল হত। হাতির যোগান দেওয়ার জন্য বুনো হাতি ধরতে হত চালু ছিল বুনো হাতি পোষ মানানোর নানা নিষ্ঠুর কায়দা। বৌদ্ধসাহিত্যে তার প্রতিফলন রয়েছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ধম্মপাদে বুদ্ধ দাবি করেছিলেন, "মাহুত যেমন অঙ্কু মেরে হাতিকে আয়ত্তে রাখে আমিও এখন তেমন করে আমার মনকে বশে রাখতে পারব।" দীঘনিকায়তেও হাতিকে অঙ্কুশ মেরে চালনা করার কথা পাওয়া যায়। তাই প্রশ্ন ওঠে, যে সভ্যতার ওই পর্যায়ে, যেখানে মানুষকে যন্ত্রের অনুপস্থিতিতে পশুশক্তির ওপর অনেকখানি

নির্ভর করতে হত সেখানে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে সকল প্রাণীর প্রতি সমদর্শী নীতি বজায় রাখাটা কতখানি সম্ভবপর ছিল? আরও অভিযোগ যে, হাতিকে তখনই বেশি প্রশংসা করা হয়েছে যখন সে পোষমানা বা অনুগত এবং ব্যবহার উপযোগী। দুর্দান্ত বা বন্য নয়।[২৬] তবে থেরীগাথা থেকে এর বিপরীত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। যেখানে বনবাসী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের জীবনের কথা রয়েছে এবং তারা বন্য পশুদের প্রতিও সপ্রশংস দৃষ্টির অধিকারী। হাতিকে অঙ্কুশ মারার কথা এসেছে চারপাশ যেভাবে ধরা পড়েছে তার বর্ণনায়। এতে বুদ্ধের অনুমোদন খোঁজা নিরর্থক।

সর্বপ্রাণের প্রতি বৌদ্ধধর্মের সমদর্শিতার নীতি সমালোচিত হয়েছে জাতকের কাহিনিগুলোর সূত্রে। আয়ান হ্যারিস এবং ল্যাম্বার্ট স্কমিথাওসেনের গবেষণায় প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, বুদ্ধ যখন বোধিসত্ত্বরূপ প্রাপ্তির আগের জন্মগুলোতে পশু-পাখি ইত্যাদি রূপ পেয়েছিলেন, সেই জন্মগুলোকে মনুষ্যজন্মের থেকে কম উৎকৃষ্টরূপে বর্ণনা করার মধ্যদিয়ে কি অন্য সব প্রাণকে মানুষের থেকে হীন বলা হয় নি?[২৭] বৌদ্ধ সাহিত্যে মানবজীবন প্রাণীজীবনের তুলনায় অধিক সুখসম্পন্ন বলে বর্ণিত হয়েছে। কোন প্রাণী সুকর্মের ফলে মানবজীবন পায়, আর দুষ্কর্ম বা ত্রুটিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মনুষ্যেতরের জীবন। জাতক কাহিনিতে অন্যান্য প্রাণীকে মানুষের থেকে নিকৃষ্টরূপে বর্ণনা করা হয়েছে একথা আপাতভাবে মনে হলেও দেখা যায় যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা অনেকক্ষেত্রেই উদ্ভিদ ও প্রাণী এমনকি পৃথিবীর বোধিলাভের অধিকারের কথা বলেছেন।[২৮] কার্যত তারা সব প্রাণকে সমমর্যাদা দিয়েছেন। এবং সামগ্রিকভাবে বৌদ্ধধর্মে প্রকৃতির ভয়াল, প্রচণ্ড এবং বিধ্বংসী রূপের চাইতে সহিষ্ণু এবং পোষণকারীরূপ তুলে ধরার চেষ্টাই লক্ষ করা যায়। প্রাণীদের প্রতি বুদ্ধের মৈত্রীর আদর্শের সমতুল্য কোন ধর্মীয় আদর্শ ইতিহাসে বিরল।

বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ চেতনা সম্পর্কে আর একটি বিতর্কিত প্রশ্ন হল – পরিবেশ সচেতনতার যে পাঠ বৌদ্ধধর্মে পাওয়া যায় তা কি শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল? না কি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল বৃহত্তর সমাজে? সরকারি নীতি এবং পরিকল্পনায় এই পরিবেশ চেতনা কি কোন প্রভাব ফেলেছিল? আধুনিক পরিবেশ চেতনার বিকাশে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশে-দেশান্তরে ব্যাপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কতখানি?

প্রাচীনভারতে বৌদ্ধধর্মে কসি (কৃষি) ও গোরকখা(গো-রক্ষা) কথা দুটি একসাথে উচ্চারিত হয়েছিল। বলিদান থেকে গোসম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে যে আন্দোলন বৌদ্ধধর্ম গড়ে তুলেছিল তার সার্থকতার প্রমাণ মেলে। বৃহত্তর সমাজের সহযোগিতা ছাড়া শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পক্ষে প্রাণীহত্যা এতটা কমানো সম্ভব ছিল না। যেমন, খ্রিস্টপূর্ব ৫০০

পূর্ববর্তী সময়ে উত্তরপ্রদেশের অত্রঞ্জিখেড়ায় প্রচুর পরিমাণে মৃত পশুর দেহাবশেষ পাও
গেছে, যার মধ্যে গবাদিপশুও ছিল। কিন্তু ৫০০ খ্রিঃপূঃ পরবর্তী সময়ের সভ্যতার স্তর থে
নিহত পশুর অস্থি অত্রঞ্জিখেড়ায় বিরল। পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ এই সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাণীহত্যা
প্রবণতা কমছিল।[২৯] বৌদ্ধধর্মের পরিবেশ চেতনা যে পরবর্তী সময়ের সরকারি নীতি
প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ রয়েছে অশোকের শিলানুশাসনগুলোতে। ধৌলি লেখতে প
ও মানুষের উভয়ের জন্যই চিকিৎসার ব্যবস্থা, জলের যোগান এবং ছায়াদায়ী বৃক্ষে
আবশ্যকতার কথা বলা হয়েছিল। শুধু বন্য প্রাণীহত্যাকে নিয়ন্ত্রিত করাই নয়, নদী
অত্যধিক মৎস্য শিকারও নিষিদ্ধ হয়েছিল। কোন কোন প্রাণী অবধ্য তার একটি সুচিন্তি
তালিকা তৈরি করা হয়েছিল।[৩০]

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের বাণী বিশ্বের বিভিন্ন দে
পরিবেশের সঙ্গে একাত্মতা উপলব্ধির স্বার্থে, পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নে নানাভা
ব্যাখ্যাত ও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, চীনে হুয়া ইয়েন গোষ্ঠী বৌদ্ধধর্মে বর্ণিত পরস্প
নির্ভরশীল বিশ্বের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। সপ্তম শতকে অবতামসক সূত্রে ক
হয়েছিল, ইন্দ্রজাল অর্থাৎ এক বহুমুখী রত্নশোভিত অনন্তজাল বিশ্বকে ধরে রেখেছে। এ
জালের প্রত্যেকটি বাঁধনের ওপর রয়েছে একটি করে অত্যুজ্জ্বল রত্ন। প্রত্যেকটি রত্ন এ
অন্যের বিচ্ছুরিত আলোর প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। কোনটা যদি অস্বচ্ছ হয়ে যায় ত
অন্যগুলোও অনুজ্জ্বল হয়ে যাবে। নদীকে দূষণমুক্ত করার এবং জীব ও উদ্ভিদ বৈচিত্র
তাদের স্বাভাবিক বসতভূমিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে রত্নগুলোকে উজ্জ্বল রাখার কথা ব
হয়েছে। পরের শতাব্দীতে চীনের তিয়েন তাই সন্ন্যাসীরা বিশ্বজনীন বুদ্ধত্বের আদর্শ প্রচা
করেছিলেন। যে ধারণা অনুসারে, প্রকৃতির যে কোন উপাদান এমনকি পৃথিবী নিজে
বোধিলাভ করতে পারে। এখানকার মহাযান গোষ্ঠী কনফুশীয় সেবাধর্মের প্রভাবে মানু
ছাড়াও উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রতি সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ককে আরো প্রসারিত করার ক
বলেছিলেন। আবার তিবত্তীয় সন্ন্যাসীরা প্রচার করেছিলেন সব প্রাণীকে পূর্বজন্মের মা ব
শ্রদ্ধা ও সেবা করার আদর্শ। জাপানে জেন বৌদ্ধধর্মে পাহাড় ও নদীকেই পবিত্র সূত্র ব
মানা হয়। প্রচারিত হয় প্রকৃতির ধর্মের বাণী।[৩১]

এই বিশ্বের সমস্ত কিছুর পরস্পরের সঙ্গে নির্বিকল্প নির্ভরশীলতা, সকলের প্র
সহানুভূতি ও সমানুভূতি ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধ্বে উঠে পরহিত সাধন – বৌদ্ধধর্মের এই চিন্তাধা
আধুনিক যুগের পরিবেশবিদদের মনোযোগ কেড়েছে। বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে বিশ্বজুড়ে পরিবে
সংরক্ষণের কাজ হয়ে চলেছে। থাইল্যাণ্ডে ১৯৭০-এর দশকে সরকারি বনদপ্তর স্বাভাবি
বনভূমিকে ধ্বংস করে ইউক্যালিপটাস চাষের মাধ্যমে বিদেশি মুদ্রা রোজগারের যে উদ্যো

নিয়েছিল, তার বিরোধিতায় নেমেছিলেন সেখানকার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা। যাদের পরিচয় দাঁড়ায় 'ইকোলজিক্যাল মঙ্কস' নামে। তাঁদের নেতৃত্বে মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছিল। কেননা, ধানের জমির পাশেই ভূগর্ভস্থ জল শোষণকারী ও ভূমিক্ষয়কারী অস্ট্রেলিয় গাছের উপস্থিতি তাদের আতঙ্কিত করেছিল। যে জঙ্গল তাদের পশুর খাবার, জ্বালানী, ফলপাকুড়, ওষধি প্রভৃতি যুগিয়ে থাকে তার ওপর কোপ যে তাদের জীবনধারাকে পালটে দেবে তা বুঝতে বাকি ছিল না। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সরকারি আধিকারিকদের কাছে চাষিদের বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছিলেন। পাশাপাশি গাছকে সম্মান দেখিয়ে কিছু উৎসব করেছিলেন যাতে অরণ্যকে কৃত্রিম করে তোলার অপচেষ্টা প্রতিরোধ করা যায়। এরকম উৎসব শ্রীলঙ্কাতেও হয়ে থাকে। বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও শাসকেরা প্রকৃতির প্রতি সহমর্মিতা, ন্যায়ধর্ম পালন ও সমন্বয়ের নীতি যেভাবে লঙ্ঘন করছিল তা তাদের মনে করিয়ে দেওয়া এই আন্দোলনের অন্যতম পদ্ধতি ছিল।[৩২] এছাড়া, থাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দূষণমুক্ত দেশের জন্য আধ্যাত্মিক মিছিল করেছিলেন। তিব্বতে বাস্তুতন্ত্রের বিপর্যয় এড়াতে সন্ন্যাসীরা উদ্যোগ নিয়েছেন। আমেরিকায় সর্বব্যাপী ভোগবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ ও পশুদের অধিকারের দাবিতে বৌদ্ধ নীতিগুলোকে তুলে ধরার উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন গ্যারি স্নাইডার।

১৯৮০'র দশক থেকে পরিবেশ সংরক্ষণ আন্দোলনে বৌদ্ধ নীতির অনুপ্রেরণাকে আরো জোরদারভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। ১৯৮৯ সালে নোবেল প্রাইজ নেওয়ার সময় বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামা তিব্বতকে বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণোশীল দেশ হিসাবে ঘোষণা করেন। এর আগে ১৯৮৬ সালে ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ডের উদ্যোগে ইতালির অ্যাসিসি শহরে যে সম্মেলন হয়েছিল তাতে দলাই লামার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর তরফ থেকে প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং মানুষকে প্রাকৃতিক বিশ্বের সঙ্গে সমন্বয়পূর্ণ জীবনযাপনের কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার শপথ গ্রহণ।[৩৩] একুশ শতকের সূচনায় ভিয়েতনামী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী টি. এন. হান বিশ্বের পরস্পরনির্ভরশীলতার তত্ত্বের সঙ্গে 'ডীপ ইকোলজি'র সাদৃশ্য তুলে ধরেন। হান বলেন, 'আমাদের ইকোলজি ডীপ ইকোলজি। প্রাণ এক..... যখন আমরা একটা ফুলকে দেখি, আপাতভাবে মনে হয় এটা শুধুই একটা ফুল, অন্য সব কিছুর থেকে আলাদা। কিন্তু এর গভীরে তাকালে বিশ্বের সবকিছু এতেই পাই। রোদ, বৃষ্টি, মাটি, খনিজ পদার্থ, তাপ, নদী এবং প্রাণ – যা ছাড়া কোন ফুল ফুটে উঠতে পারে না।'[৩৪]

উত্তর ক্যালিফোর্ণিয়ায় প্রাচীন রেডউড গাছের রক্ষার দাবিতে, সান ফ্রান্সিসকোয় গবেষণাগারের খাঁচায় রাখা প্রাণীদের ওপর নিষ্ঠুর পরীক্ষা নিরীক্ষার বিরুদ্ধে, বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা যাতে না বাড়ে, পৃথিবী যাতে পারমাণবিক বর্জ্যের থেকে মুক্ত হয় তার স্বার্থে,

অস্ট্রেলিয়ায় রেনফরেস্ট বাঁচানোর জন্য যেসব আন্দোলন চলছে তার উদ্যোক্তরা বৌদ্ধ আদর্শকে অবলম্বন করেছেন।[৩৫] শুধু সংরক্ষণের দাবিতে আন্দোলন চালানো নয়, বৃহত্তর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে ধ্যানধারণা এবং জীবনযাত্রা আধুনিকতার নামে প্রকৃতির ভারসাম্যের মূলসূত্র লঙ্ঘন করতে মানুষকে প্ররোচিত করে তার বিরুদ্ধে। বৌদ্ধধর্মের কার্য-কারণ সম্পর্কের তত্ত্ব পরিবেশবিদদের উদ্বুদ্ধ করেছে বর্তমান সঙ্কটের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক এবং মনস্তাত্ত্বিক কারণ অনুসন্ধানে। অহিংসার বাণীকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে কীটনাশক, খাদ্যে ও ওষুধে ভেজাল, নানা ধরনের দূষণ ও আরো বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে। অর্থাৎ বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্ব বিপন্ন করার সম্ভাব্য কারণগুলো প্রতিরোধ করাই হবে অহিংসার আদর্শের সার্থক রূপায়ণ। অচৌর্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিশ্বজুড়ে সম্পদের ওপর মুষ্টিমেয়র মালিকানা আর সংখ্যাগরিষ্ঠের বঞ্চনা এবং বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর শোষণের বিরুদ্ধে। অনৃতভাষণের বিরোধিতা চলছে মিথ্যা দাবিতে পুঁজি করে ভোগ্যপণ্যের নিরন্তর বাজার বাড়িয়ে চলার বিরুদ্ধে, যার শিকার হচ্ছে মধ্যবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত মানুষ। ব্যভিচার বলে মনে করা হচ্ছে উদ্ভিদ ও জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ও অশ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণকে। এভাবে বৌদ্ধধর্ম থেকে প্রাণরস ধারণ করে ক্রমশ সজীব হয়ে উঠেছে গোটা বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সহনশীল এবং সংরক্ষণশীল জীবনযাত্রা ও উন্নয়নের ধারণা।

তথ্যসূত্র

১. ১৯৬২ সালে র‍্যাচেল কারসনের সাইলেন্ট স্প্রিং বই-এর প্রকাশকে আধুনিক পরিবেশ আন্দোলনের সূচনা বলে মনে করা হয়ে থাকে।

২. Lyn White, 'The Historical Roots of Our Ecological Crisis', *Science*, 115: 1967, pp 1203 – 1205.

৩. Stephanie Kaza, 'Green Buddhism' in *When Worlds Converge; What Science and Religion Tell us about the story of the Universe and Our Planet in it* (eds), C.N. Mathews, K.E. Tucker and P. Hefner, Chicago, Open Court, pp, 293.

৪. Arne Naess, *Ecology, Community and Lifestyle*, trans. David Rothenberg, Cambridge, C.U.P, 2000.

৫. Fritjof Capra, *The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels between Modern Physics and eastern Mysticism*, London, Fontana, 1976;

James E. Lovelock, *Gaia : a New Look at Life on Earth*, Oxford, O.U.P., 1979.

৬. Ian Harris, 'How environmentalist is Buddhism?' *Religion* 21, 101 – 114; Lambert Schmithausen, *Buddhism and Nature*, Tokyo, International Institute For Buddhist Studies, 1991.

৭. *সামন্তপাসাদিকা*, পৃঃ ৩৩৬ – ৩৩৭, উল্লিখিত হয়েছে শুভাশিস বড়ুয়া, 'বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের আলোকে পরিবেশ সচেতনতা', *ইতিহাস অনুসন্ধান*, খণ্ড ২৬, পঃ বঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ২০১২, পৃঃ ১২২।

৮. *দীঘনিকায়*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৬ – ৩৩৭, উল্লিখিত হয়েছে *ইতিহাস অনুসন্ধান*, পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২।

৯. *সংযুক্ত নিকায়*, পৃঃ ৫৫, উল্লিখিত হয়েছে পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২২।

১০. তদেব

১১. শুভেন্দু গুপ্ত, *প্রাচীন ভারতে পরিবেশ চিন্তা*, কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ, ২০১২, পৃঃ ১১৪ – ১২৬।

১২. *বিনয় পিটক*, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২০৫ – ২০৬, *চুল্লবর্গ*, পৃঃ ৩১৩, উল্লিখিত হয়েছে, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, খণ্ড ২৬, পৃঃ ১২১।

১৩. *চুল্লবর্গ*, পৃঃ ২৩১, উল্লিখিত তদেব।

১৪. *দীর্ঘনিকায়*, পৃঃ ৯২, উল্লিখিত তদেব।

১৫. *সামন্তপাসাদিকা, দীঘনিকায় টীকা*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১১২, তদেব, পৃঃ ১২২।

১৬. Stephanie kaza, pp 293 – 309.

১৭. পাচিত্তিয়া (পালি), ভিকখু বিভঙ্গ, পৃঃ ৩৩৮; *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ২৬, পৃঃ ১২৩।

১৮. 'বুদ্ধদেব', *রবীন্দ্র রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ, পঃবঙ্গ সরকার, পৃঃ ৪৭৬ – ৪৭৭।

১৯. *সুত্তনিপাত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ৮; উল্লেখিত হয়েছে *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ২৬, পৃঃ ১২৩।

২০. 'বুদ্ধদেব' *রবীন্দ্ররচনাবলী*, পৃঃ ৪৭৭।

২১. *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১; *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ২৬, পৃঃ ১২৩।

২২. *জাতক*, ১ম খণ্ড, মচ্ছুদান জাতক, পৃঃ ৪২৩, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, তদেব।

২৩. *জাতক*, ১ম খণ্ড, নন্দিবিশাল জাতক, পৃঃ ১৯১; *ইতিহাস অনুসন্ধান*, তদেব।

২৪. *বিনয়পিটক*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৪;

২৫. Paul Waldau, *The Specter of Speciesism; Buddhist and Christian Views of Animals*, New York, O.U.P., 2002.

২৬. উপরোক্ত, পৃঃ ১২৮।
২৭. উপরোক্ত, পৃঃ ১৩১ – ১৩২।
২৮. চীনে অষ্টম শতকে তিয়েন তাই সন্ন্যাসীরা বৌদ্ধধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উদ্ভিদ, প্রাণী সকলকেই পরমজ্ঞান লাভ বা বুদ্ধত্ব অর্জনের অধিকারী বলে মনে করতেন।
২৯. রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৭৫।
৩০. বিশদ আলোচনা রয়েছে, অনিতা বাগচী, 'প্রাচীন ভারতে প্রাণী সুরক্ষায় কিছু বিধান', *ইতিহাস অনুসন্ধান*, ১৫, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ ১০৭ – ১১১।
৩১. Stephanic Kaza, 'Green Buddhism', pp 293 – 309.
৩২. Ramchandra Guha, *Environmentalism: A global history*, Oxford University Press, 2000, pp 100, 107.
৩৩. উপরোক্ত, পৃঃ ১৩৮।
৩৪. Thich Nhat Hanh, *The World We have: A Buddhist Approach to Peace and Ecology*, Berkerly, California, Parallax Press, 2008.
৩৫. Stephanic kaza, pp 302 – 309.

<u>সহায়ক উপাদান</u>

Collette Sciberras, *Buddhist Philosophy and the Ideals of Environmentalism,* Ph. D thesis, Dept. of Philosophy, Durham University, 2010.

....

বাঙালির জীবনে ও সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব : প্রাক্-আধুনিক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

একটি জাতির পরিচয় ফুটে ওঠে তার ভাষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যশিল্পের নিজস্ব ঘরানায়। জাতীয় জীবনে উনবিংশ শতকে নবজাগরণের পূর্বে বাঙালি জাতি- সত্তার পরিচয় বিধৃত ছিল অপর একটি উপাদানে, তা হল ধর্ম। ধর্ম ছিল জীবনের আধার। ধর্মীয়পরিচয় ভিন্ন জাতির পরিচয় পূর্ণ ছিল না। যদিও জাতীয় জীবনে বাঙালি বিভিন্ন ধর্মের ঘাত-প্রতিঘাতে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এক ধর্ম ছেড়ে অপর ধর্ম গ্রহণ করেছে। নবধর্ম গ্রহণ করেও পূর্বধর্ম-সংস্কার সত্তার গভীরে লালন করেছে। ধর্মীয় নমনীয়তাও বাঙালির জাতিসত্তার বিশিষ্টতা। ফলে বৌদ্ধ-জৈন-হিন্দু-ইসলাম-খ্রিস্টান নানাবিধ ধর্মের সাহচর্যে এসেও বাঙালি কোন কালে খাঁটি বৌদ্ধ, কিংবা খাঁটি হিন্দু, কিংবা খাঁটি মুসলমান বা খাঁটি খ্রিস্টান হয়ে উঠতে পারেনি। নৃতাত্ত্বিক বিচারে বাঙালির রক্তে যেমন বহমান অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-আল্পনীয় আর্যদের মিশ্র রক্তধারা, তেমনি ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচরণেও মিশ্র ধর্মীয় সংস্কৃতি। বাঙালি-হিন্দু উত্তর ভারতীয় হিন্দুদের কাছে একদা ব্রাত্য ছিল। বাঙালি-মুসলমান আজও পাকিস্থানী খানদানি মুসলমানদের কাছে ম্লেচ্ছই রয়ে গেছে। আর বাঙালি-বৌদ্ধকে স্বতন্ত্র পরিচয়ে চিনে নেবার উপায়ও আজ আর নেই। বাঙালির সত্তার গভীরে বৌদ্ধত্ব খুঁজে বের করা আজ একবিংশ শতকে রীতিমতো গবেষণার বিষয়।

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির তিনভুবনে এ অন্বেষণ চলতে পারে। তবে কেবলমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই আলোচনাকে সীমায়িত রাখতে চেয়েছি। তাও আবার প্রাক্-আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে। যেখানে চর্যাগীতিকে বাদ দিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্যকে বৌদ্ধসাহিত্য অভিধায় চিহ্নিত করা যাবে না। প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় এক হাজার বছরের ইতিহাসে বৌদ্ধ সাহিত্যের বিরল অস্তিত্বই নিদর্শনের তুলনায় আমাকে বেশি আগ্রহী করে তোলে। সেই বিরল অস্তিত্বের কারণ, তার স্বরূপ উন্মোচনই এ প্রবন্ধের অভিপ্রায়।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধের সময় কাল থেকেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তারও আগে বঙ্গদেশে জৈন ও আজীবিক ধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। কিন্তু বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠা খুব সহজে সম্পন্ন হয়নি। মহাবীরকে বঙ্গদেশে যথেষ্ট বিরোধিতার মধ্যে পড়তে হয়েছিল। যথেষ্ট নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করে সামান্য কিছু সাফল্য অর্জন করেন। আজীবিক ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের বন্ধু ও মহাবীর রাঢ় বঙ্গে ছয় বৎসরকাল অবস্থান করেছিলেন। তবে জৈন বা আজীবিক ধর্ম রাজ-আনুগত্য লাভ না করায় অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে পড়েছিল। সেই সংকটে পড়ে বহু জৈন ও আজীবিক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে।

প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে বঙ্গদেশ বৈদিক আর্যদের কাছে ব্রাত্য বলে গণ্য হয়েছিল।

ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যকে' 'বঙ্গ', 'বগধ' ও 'চের' তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়। ছোটনাগপুরের অর্ধসভ্য জাতি নিজেদের 'চের' বলে দাবি করে। বঙ্গ বা 'বং' নামে এক দ্রাবিড় জাতি বঙ্গদেশেরই অধিবাসী। আর 'বগধ'-এর বংশধর রাঢ়বঙ্গের বাগ্‌দি জাতি। এছাড়া উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র ও কৈবর্ত জাতি বাস করতো। আর্যরা যাদের দস্যু বলে অভিহিত করেন।

বৈদিক আর্যদের অনুপ্রবেশের পূর্বে বঙ্গীয় সমাজ ছিল মূলত কৌম সমাজ। কৌমসমাজ হল বৃত্তিধারী জনগোষ্ঠির সমাজ। তাদের ধর্ম বলতে বোঝাতো কিছু অলৌকিকত্বে অটুট বিশ্বাস ও আচরিত সংস্কার। প্রেততত্ত্ব ও যাদুবিদ্যায় ছিল তাদের অটুট বিশ্বাস। নদী বৃক্ষ অরণ্য পর্বত পশু পাখি প্রভৃতির মধ্যে নিহিত ছিল শক্তির পূজা, দুষ্টশক্তির দমনে তুক-তাক-ঝাড়-ফুঁক-বাণ-উচাটন, কবচ-মাদুলি এবং বশীকরণে অবিচল আস্থা নিয়েই প্রাক্-আর্য বঙ্গ সমাজের ধর্মভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

এই প্রাক্-বৈদিক আর্যভিত্তির উপর বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গদেশ ও তার বাইরে, বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল রাজ-আনুগত্য লাভ। খ্রিস্টপূর্ব যুগে ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে মগধ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। মগধের সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কালে পুণ্ড্রবর্ধন তথা উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময়কালে বঙ্গদেশে আর্যসংস্কৃতি তথা হিন্দুধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ইতিহাস-পাঠক মাত্রই জানেন, বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ ও হিন্দু-সংস্কৃতির ধারক চাণক্য চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মহামন্ত্রী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নিজে জৈন ধর্মের দ্বারা উজ্জীবিত হলেও দোর্দণ্ডপ্রতাপ তেজস্বী ব্রাহ্মণ চাণক্যের সৌজন্যে হিন্দুধর্ম মৌর্য সাম্রাজ্যের পৃষ্টপোষকতা অর্জন করে। ফলে বঙ্গেও হিন্দুধর্ম প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দৌহিত্র সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তো বটেই, ভারতের বাইরেও শ্রীলঙ্কা, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তিনি বঙ্গদেশে সাম্রাজ্য বিস্তার করে বহু বৌদ্ধ বিহার, স্তূপ, সংঘ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন।

চৈনিক পরিব্রাজক উয়াং চুয়াং তার ভ্রমণ কাহিনিতে উল্লেখ করেছেন স্বয়ং বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধনে তিনমাস, সাতদিন করে সমতটে ও কর্ণসুবর্ণে বসবাস করেছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'বোধিসত্ত্বকল্পলতা'তেও উল্লিখিত হয়েছে, পুণ্ড্রবর্ধনে বুদ্ধদেব স্বয়ং ছ'মাস অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। বুদ্ধশিষ্য অনাথ পিণ্ডদের কন্যা সুমাগন্ধা (Sumāgadha)-ও পুণ্ড্রবর্ধনে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। আরো অনেক দৃষ্টান্ত সহযোগে প্রমাণ করা সম্ভব যে খ্রিস্টপূর্ব যুগেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

গুপ্তযুগে বঙ্গদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রবেশ

ঘটতে থাকে। গুপ্ত সম্রাটেরা হিন্দু ছিলেন। রাজ-আনুগত্য লাভ করে দলে দলে ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে এলেও বৈদিক-ব্রাহ্মণ্য আভিজাত্য জাহির করেনি। কালের বিবর্তনে বৈদিক যুগ থেকে পৌরাণিক যুগে এসে ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যেও বদল ঘটে গেছে। বৈদিক যুগে আর্যেতর সংস্কৃতির সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের ফল হিসাবে পৌরাণিক যুগে আর্যেতর ধর্ম-সংস্কৃতি আত্তীকরণের প্রয়াস দেখা গেছে। আর্যেতর দেবদেবী আর্যমণ্ডলীতে গৃহীত হয়েছে। রামায়ণ-মহাভারত ও পুরাণে বেদের ধর্মের পরিবর্তে কৃষ্ণের ধর্মই জয়ী হয়েছে। বৈদিক দেবতা ইন্দ্র-বরুণের পরিবর্তে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছে। ব্রহ্মা অবৈদিক দেবতা, শিব অনার্য। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা হলেও আর্যেতর কল্পনায় অবতারত্বের মধ্যদিয়ে গৃহীত হয়েছে। বিষ্ণুর দশ অবতার মৎস্য, কূর্ম, বরাহ প্রভৃতি অস্ট্রিক সমাজের টোটেম কল্পনা থেকে গৃহীত হয়েছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ব্যাপার হল – বেদবিদ্বেষের প্রবক্তা 'বুদ্ধ' বিষ্ণুর অবতার রূপে গৃহীত হলেন। ফলে গুপ্ত বা তার পরবর্তী পাল যুগে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে ধর্মীয় বিদ্বেষের পরিবর্তে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সহজতর হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণে রাখতে হবে, বঙ্গের পাল রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ হলেও হিন্দুদের প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষণ করেননি। হিন্দুদের বরং পৃষ্ঠপোষণা দান করেছেন।

পালযুগের প্রায় ৪০০ বছর রাজত্বকালে হিন্দু-বৌদ্ধের এই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান সুখকর বলে মনে হলেও, এর ভিতরে ভিতরে চলেছিল নিঃশব্দ ঘাতকের গভীর ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের শিকার বৌদ্ধধর্ম, শিকারী সুচতুর ব্রাহ্মণ্যমণ্ডলী। বাঙালির রাজনৈতিক ইতিহাসের খুব সুখের সময় ছিল পালযুগ। এই সময় বাঙালি বিশেষত বৌদ্ধ-বাঙালি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-স্থাপত্য-ভাস্কর্য চর্চার সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেছিল। এই সময় বাঙালি-প্রতিভার বিস্ময়কর প্রকাশ ঘটেছিল।

গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণ্যধর্ম আসলে পৌরাণিক ধর্ম বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার রূপে গ্রহণ করে বৌদ্ধ-অধ্যুষিত বঙ্গে বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্যবিদ্বেষকে অনেকখানি প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। গুপ্তযুগের অবসানে শশাঙ্ক বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি শিবের উপাসক ছিলেন। শিব ছিলেন অনার্য দেবতা। শিবের দুহিতা লক্ষ্মীকে আর্য দেবতা বিষ্ণুর সহধর্মিণী রূপে উপস্থাপন করে শিবের আর্যীকরণের প্রয়াস পেয়েছেন। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণ্যমণ্ডলী শিব ও বিষ্ণুর পার্থক্য ঘোচাতে গিয়ে হরি-হর মূর্তির কল্পনা করেছেন। যিনি হর তিনি হরি – এই বিশ্বাসে হিন্দুসমাজের বন্ধনকে দৃঢ় করতে প্রয়াসী হয়েছেন। এই দুটি ঘটনাই প্রমাণ করে, কত সুচতুর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্যমণ্ডলী হিন্দুসমাজের অভ্যন্তরীণ বিভেদ যেমন নাশ করেছেন, তেমনি বুদ্ধকে হিন্দু অবতার বানিয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি বৌদ্ধদের আকৃষ্ট করেছেন।

পাল যুগের রাজা হিন্দু না হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্যসমাজ যেমন রাজ আনুগত্য অর্জন করেছেন, তেমনি বৌদ্ধদের উপর বিদ্বেষ পোষণ না করে কৌশলে হিন্দুধর্মের বিশ্বাস-সংস্কার তথা হিন্দুত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করেছেন। সেদিনের বাঙালি হিন্দু দেবদেবীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা বৌদ্ধ দেবমণ্ডলী গড়ে তোলেন। বৌদ্ধ দেবতাদের মধ্যে আছেন আদিবুদ্ধ, পাঁচটি ধ্যানী বুদ্ধ, আমোঘসিদ্ধি (শক্তি তারা), বৈরোচন (শক্তিলোচনা), রত্নসম্ভব (শক্তি বজ্রধাত্বীশরী), বজ্রসত্ত্ব (শক্তি বজ্রসাত্ত্বিক) ও তাদের সন্তানসন্ততি। নানাবিধ বোধিচিত্ত থেকেই এইসব দেবতার উৎপত্তি। বৌদ্ধশাস্ত্রসিদ্ধ এই সমস্ত দেবদেবী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের কাছে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। হিন্দু দেব-দেবীই তাদের কাছে সমধিক গৃহীত হয়েছে। বহু বৌদ্ধ বিহারে পোড়া মাটির ফলকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখা গেছে। সূর্য, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ, হরগৌরী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত হয়ে থাকেন। পাহাড়পুরের বিহারে পোড়ামাটির ফলকে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাথরের তৈরি ৬৩টি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি পাওয়া যায়। অর্থাৎ পালযুগে বৌদ্ধরা নিজেদের অজান্তে সেমি-হিন্দু (Semi-Hindu) হয়ে ওঠে।

প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে বিশেষত বাংলার কৌম সমাজে তন্ত্রের প্রচলন ছিল। গুরুশিষ্য পরম্পরা তা অধিগত করতে হত। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে এই তন্ত্র বৌদ্ধধর্মের অধিগত হয়ে পালযুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সাধনার জন্য 'উড্ডীয়ান', 'কামাখ্যা', 'শ্রীহট্ট' ও 'পূর্ণগিরি' চারটি পীঠস্থান গড়ে ওঠে। প্রতিটি পীঠস্থানেই বজ্রযোগিনীর মন্দির নির্মিত হয়। এই সাধকেরাই বজ্রযানী নামে পরিচিত। বজ্রযানীদের মতে আদিবুদ্ধই হলেন সৃষ্টির কারণ, সর্বভূতে তিনি বর্তমান। এই কল্পনার মধ্যে হিন্দু দেবতা বিষ্ণুর ছায়াপাত ঘটেছে। অর্থাৎ হিন্দুরা বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার রূপে গ্রহণ করেছেন, আর বৌদ্ধরা আদিবুদ্ধত্বে বিষ্ণুত্ব আরোপ করেছেন। তাদের ধর্মজীবনে বৌদ্ধত্ব বিষ্ণুত্বের দ্বারা ক্রম আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে।

অপরদিকে, বৌদ্ধসাহিত্যের বিপুল ভাণ্ডার ব্রাহ্মণ্যমণ্ডলীর সুচতুর পদক্ষেপে বাঙালির ঐতিহ্য থেকে অপসৃত হয়েছে। অধিকাংশ বৌদ্ধ সাহিত্য তথা স্মৃতি-দর্শন-ন্যায়-ব্যাকরণ-অভিধান-'ছন্দশাস্ত্র' ও তন্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থ বৌদ্ধপণ্ডিতদের দ্বারা পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল। তাঁরা সংস্কৃতেও পারদর্শী ছিলেন। সংস্কৃত ভাষাতেও বহু বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। অথচ বাঙালির ঐতিহ্যে তাদের স্থান নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বাংলায় বৌদ্ধ সমাজ' প্রবন্ধে সঙ্গতকারণেই প্রশ্ন তুলেছেন 'এ সাহিত্য গেল কোথায়?' তিনি তাঁর মতো করে হারানো ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করেছেন। তাতে তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্ত হল, ব্রাহ্মণ্যসমাজ হংসের ন্যায় এই বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্যের সারটুকু গ্রহণ করে অবশিষ্ট অংশ নষ্ট করেছে।

'পাণিনীয়ম্', কাত্যায়নের 'বার্তিক' কিংবা পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ 'ব্যাকরণ' গ্রন্থ। কিন্তু বৌদ্ধরা সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করতে থাকলে বৌদ্ধপণ্ডিত চন্দ্রগোমী 'চান্দ্রব্যাকরণ' রচনা করেন, এই ব্যাকরণের দ্বারা বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সিদ্ধ ছিল। এই চন্দ্রগোমী বৌদ্ধও বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন। তিনি গুপ্তযুগে চন্দ্রদ্বীপে বাস করতেন। বহু বৌদ্ধ তার টীকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু উত্তরকালে শৈব-সূত্রকার ক্রমদীশ্বর পাণিনির সূত্র, পাতঞ্জল ভাষ্য ও বৌদ্ধবৃত্তিতে বৈপরীত্য লক্ষ্য করে 'সংক্ষিপ্তসার' নামে যে ব্যাকরণ রচনা করলেন, তা পাণিনির সংক্ষিপ্তসার বলে প্রচারিত হলেও তাতে চান্দ্রব্যাকরণের 'যা কিছু ভালো' তা গৃহীত হল। ফলে পাঠকের কাছে সংক্ষিপ্তসার গৃহীত হলে চান্দ্রব্যাকরণ তার গ্রহণযোগ্যতা হারাল। চাঙ্গুদাস নামেও এক কায়স্থ বৌদ্ধ ব্যাকরণের কারিকা প্রস্তুত করেছিলেন। সেই কারিকাগুলি উড়িশ্যায় পঠিত হলেও বাঙালিদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ বৌদ্ধ- বাঙালিদের হাতে রচিত ব্যাকরণ বাঙালির ঐতিহ্যে ঠাঁই পায়নি, পাণিনি প্রবর্তিত ব্যাকরণের ধারায় তার শ্রেষ্ঠ অংশ গৃহীত হয়েছে কিন্তু কোথাও বৌদ্ধ অবদানের কথা উল্লিখিত হয়নি। হিন্দুধর্ম এই ভাবেই বৌদ্ধদের ব্যাকরণ-অনুধ্যানের কৃতিত্ব গ্রাস করে নিয়েছে।

বৌদ্ধ পণ্ডিত অমর সিংহ 'নামলিঙ্গানুশান' ও 'ত্রিকাণ্ড' নামে অভিধান রচনা করেন। ইতোপূর্বে রচিত বররুচি, ব্যাড়ি, কাত্যায়ন কালিদাস প্রমুখের তুলনায় এ গ্রন্থ শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পাই। ব্রাহ্মণ্যসমাজের প্রতিনিধি শ্রীহর্ষ অমর সিংহের সহজ সরল ভাষায় লেখা 'ত্রিকাণ্ড' গ্রন্থের তীব্র সমালোচনা করেন। এতে উৎসাহিত হিন্দু পণ্ডিতেরা তার বহু সংখ্যক টীকা রচনা করে গ্রন্থটির গুরুত্ব হ্রাসে প্রয়াস পান।

অতীশ দীপঙ্করের গুরু মহাপণ্ডিত রত্নাকর শান্তি ছন্দের বই লিখেছিলেন কিন্তু আজ তার কোন অস্তিত্ব নেই। বৌদ্ধ দিঙনাগ কালিদাসের কাব্যসমূহের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু কালের গর্ভে তা হারিয়ে গেছে। ন্যায়শাস্ত্রে বৌদ্ধদের গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় মেলে। ক্ষণবাদী দর্শনের দ্বারা বৌদ্ধ নৈয়ায়িকেরা তাতে সূক্ষ্ম মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিতেরা ন্যায় ও বৈশেষিক যোগে বৌদ্ধদর্শনকে খণ্ডনের প্রয়াস পান। আচার্য উদয়ন 'আত্মানাত্মাবিবেক' রচনা করেন যা 'বৌদ্ধধিক্কার' নামে জনসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। এই প্রয়াসের মধ্যদিয়ে বৌদ্ধদের ক্ষণবাদী দর্শন অনেকখানি কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল।

বৌদ্ধস্মৃতিতে বৌদ্ধভিক্ষুদের উদ্দেশ্য পঞ্চশীল, অষ্টমশীল প্রভৃতি পালনের নির্দেশ আছে। ব্রাহ্মণ্যসমাজের দ্বারা তা সহজেই পরিত্যক্ত হলেও মন্দির প্রতিষ্ঠা, তান্ত্রিক দীক্ষা,

অর্থাৎ দেহ বা কায়ার মধ্যেই পরম ব্রহ্মের অবস্থান। বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকে পঞ্চইন্দ্রিয়াত্মক দেহকেই ব্রহ্মের আধার জ্ঞান করে কায়াসাধনায় ব্রতী হয়েছেন। চর্যাগীতি ৩৪ নং পদে দারিকপাদ এই মর্মেই লিখেছেন – 'কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তোরে ঝা বাখানে।' অর্থাৎ তন্ত্র-মন্ত্র-ধ্যানে কিংবা ব্যাখ্যানে কিছুই হবে না। কায়া সাধনার মধ্যদিয়ে ব্রহ্মত্বকে লাভ করতে হবে।

বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্র সাধনা বৈষ্ণবধর্মকে প্রভাবিত করে। বৌদ্ধ' তন্ত্র সাধন 'প্রজ্ঞা' ও 'উপায়' বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনায় 'রাধা' ও 'কৃষ্ণে' রূপান্তরিত হয়। প্রজ্ঞা ও উপায়ে মিলনে সহজসুখ লাভ করা যায়, তেমনি রাধা-কৃষ্ণের মিলনের মধ্যদিয়ে বৈষ্ণব-সহজিয়া লীলারস আস্বাদন করেন। বৈষ্ণব সহজিয়া সাহিত্যে পুরুষ ও প্রকৃতির দুই সত্তার মিল প্রেমের স্বর্গীয় উপলব্ধি তথা সহজানন্দ লাভ হবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের প্রায় চার বছর ধরে যে বৈষ্ণব পদসাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মূল প্রেরণা সহজিয়া সাধনা যা বৌ প্রভাবের বৈষ্ণবীয় ফল। শেষ বয়সে রাজা লক্ষ্ণণ সেন বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁ সভাকবিরূপে জয়দেব যে গীতগোবিন্দ রচনা করেন, সেখানে 'কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর বলতে কোন দ্বিধা করেননি।

তন্ত্রসাধনা বামাচারী হলেও কাম পরিতৃপ্তির মধ্যেই এই সাধনা নিঃশেষি নয়, আত্মশক্তিতে জেগে ওঠাই এই সাধনার মূল অভিপ্রায়। কুলনারী তাই সাধনসঙ্গি বৌদ্ধসিদ্ধাচার্যদের মতো সাধক কবি চণ্ডীদাসও রজকিনী রামীকে বলেন – 'রজকিনী প্রে নিকষিত হেম কামগন্ধ নাহি তায়'। সমগ্র বৈষ্ণবসাহিত্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেম সহজ সাধ দ্বারা অপার্থিব মিলনের ব্যঞ্জনায় গৃহীত হয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মের মতো শৈব ধর্মও বৌ সহজযান তন্ত্রসাধনা গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার প্রজ্ঞা ও উপায় শৈব তন্ত্রসাধনায় হ শিব ও শক্তি। নাথসিদ্ধাদের কাছে শিবই হলেন আদি নাথ অর্থাৎ পরম যোগী। বৌদ্ধ ত বজ্রসত্ত্ব বা হেবজ্র হলেন নাথসিদ্ধাদের কাছে আদিনাথ বা ভূতনাথ। যোগসাধনার মধ্যদি মৃত্যুকে জয় করে দৈবমহিমার অধিকারী হওয়াই ছিল নাথসিদ্ধাদের সাধ বৌদ্ধতান্ত্রিকদেরও ছিল একই অভিপ্রায়। বৌদ্ধদের সহজিয়া সাধনার মাধ্যমে নাথযোগী উপলব্ধি করেন কায়াসাধনের মধ্যদিয়েই যে মহাশক্তি লাভ ঘটে, তার মধ্যদিয়েই তাদে অভিপ্রায় সিদ্ধ হতে পারে। তখন তারা হটযোগ ত্যাগ করে সহজিয়া কায়া সাধ আত্মনিয়োগ করল। বাংলার নাথসাহিত্য 'গোরক্ষবিজয়কাব্য'-ও 'ময়নামতীর গান' ন আখ্যানে এই সহজিয়া কায়া সাধনার ছায়াপাত ঘটেছে। সুতরাং বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ম নাথসাহিত্যও বৌদ্ধ কায়াসাধনতত্ত্বের নাথসিদ্ধাই ফল। কারণ নাথসিদ্ধারা কায়াসাধ মধ্যদিয়ে স্বদেহে জীবনমুক্তি লাভ করতে চাইলো। পতঞ্জলির মতে সহজিয়া তন্ত্রসাধ

নাথপন্থিদের কাছে যোগসাধনার অঙ্গ হিসাবেই গৃহীত হয়েছিল।

বাংলার বাউল সম্প্রদায়ও সহজিয়া সাধনার মধ্যদিয়ে 'মনের মানুষ' অন্বেষণের প্রয়াস পান। বাউলদের সাধনতত্ত্বও আসলে দেহতত্ত্ব। - 'মনের মানুষ আছে প্রাণে, তাই হেরি তারে সকল খানে।' বৌদ্ধ সহজযানীদের মতো যৌন-যোগ ক্রিয়ার বা নারী পুরুষের মিলনের চরম মুহূর্তে সহজসুখের উপলব্ধি বাউল সাধনারও পাথেয়। সুতরাং বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনার ফল বাউল সাধনার মধ্যেও লাভ করা যায়। বাউলের গানে গানে সেই সহজিয়া সাধন তন্ত্রেরই উদ্ভাস।

মঙ্গল কাব্যেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করার জো নেই। বিশেষত অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষদের মধ্যে তুলনায় প্রকট রূপেই বলবৎ ছিল। তাদের পূজা ধর্মঠাকুরের মধ্যে হিন্দু-বৌদ্ধ নানা দেবতার আদল অনুভব করা যায়। ধর্মঠাকুর কখনও আর্যদেবতা সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন। কখনো তিনি আদ্য অর্থাৎ আদিনাথ শিব কখনো বা তিনি অনাদ্য – ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তারই অংশ মাত্র। রমাই পণ্ডিতের পুথিতে বর্ণিত 'নিরঞ্জনের উষ্মা'য় ধর্মঠাকুরের ভক্তদের হিন্দুবিদ্বেষী ও ইসলাম ভক্তির পরিচয় মেলে। এমনকি ধর্মঠাকুরকে ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার নিবারণের জন্য যবনরূপে আবির্ভূত হতে হয়।

"ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি,
হাততে শোভে ত্রিরুচ কামান।"

এখানে ধর্মবিদ্বেষ তথা ব্রাহ্মণ্য অত্যাচার ও পরিণাম তথা ধর্মান্তরীকরণের ইতিহাস গভীর ছায়া ফেলেছে।

এই ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণ্যসমাজের কাছে অপাঙক্তেয় ছিল। কোন ব্রাহ্মণ ধর্মঠাকুরের পূজায় অংশ গ্রহণ করত না। দুলে বাগ্‌দি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষেরাই এর পৌরহিত্য কার্য সম্পাদন করতেন। নিজেদের পূজা পাঠ ও হবিষ্য ইত্যাদি যে সমস্ত ক্রিয়াধর্ম সম্পাদন করত, তা বৌদ্ধদেরই করণীয় ছিল। ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি; শূন্যবাদ বৌদ্ধদর্শন। নির্বাণ লাভের অর্থ শূন্যত্ব লাভ। শূন্য থেকেই সবকিছুর সৃষ্টি – 'অসতঃ সৎ জায়তে'। তাই ধর্মঠাকুরের মধ্যে বুদ্ধের প্রভাবও বর্তমান। বৌদ্ধধর্ম ও ধর্মানুচরণের ক্ষীণ সূত্র ধর্মমঙ্গল কাব্যেও খুঁজে পাওয়া যায়।

সুতরাং প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দীর্ঘ এক সহস্র বছরের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যের বিষয় বৈচিত্র্য ও ক্রমবিবর্তনের পরতে পরতে ধর্মী সংঘাত ও তার ক্রিয়ায় ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মসংস্কৃতির যে পরিবর্তন ঘটে, সূক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করলে তাতে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির সুদূর-প্রসারী পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। বাঙালি জাতিসত্তার গভীরে নিজেদের আগোচরেই তা সক্রিয় থেকেছে।

....

চর্যাপদের বাঙালি জীবন ও বৌদ্ধধর্ম

মৌসুমী চক্রবর্তী

সাহিত্য, সমাজ এবং ধর্ম পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাহিত্য সর্বদাই সমাজজীবনে প্রতিচ্ছবি। সামাজিক ইতিহাস সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অন্যান্য সূত্রের মতোই অন্যত সহায়ক হল বিভিন্ন ধর্মসাহিত্য। বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোরতা, ধর্মীয় একাধিপত্য অস্পৃশ্যতা, ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি ইত্যাদি নানা কারণে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের মন ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। চারবর্ণে বিভক্ত বৈদিক সমাজের মধ্যেই ধর্মবিপ্লবের বী নিহিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী চিন্ত প্রকাশ দেখা দেয়। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এই যুগে একাধিক নতু ধর্মমতের উদ্ভব হয়। এইসব ধর্মমতের মধ্যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রতিবাদী আন্দোলনে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই ক্ষত্রি ছিলেন। একইসঙ্গে এইসময় সমাজে প্রচলিত বর্ণবৈষম্য ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক প্রভাবশালী বণিক বা 'শ্রেষ্ঠী' সম্প্রদায়ও সামাজিক মর্যাদালাভের জন্য সোচ্চা হয়ে ওঠে।

গৌতমবুদ্ধ সামাজিক সাম্যের বাণী প্রচার করে সমাজের সকল স্তরের মানুষে কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেন। কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের সময় আহূত চতুর্থ বৌদ্ধসম্মেলন বৌদ্ধরা 'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েন। বৌদ্ধদর্শনে ক্রমোন্নতির পর্যায় হিসাবেই প্রাচীন বৌদ্ধ আচার্যেরা এই দুই সম্প্রদায়ে ভাগ করেছে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতক থেকে বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিক প্রভাবের ফলে গুণগত পরিবর্তন ঘটে আধ্যাত্মিক দৃষ্টির বিভিন্নতা অনুসারে এইসময় বৌদ্ধধর্মে বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযা গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পাল রাজাদের আবির্ভাবের সম থেকেই বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বৌদ্ধধর্মের প্রভা বাঙালি জীবনে ও সাহিত্যেও নানাভাবে প্রতিফলিত হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ বা চর্যাগীতিগুলি আসলে বৌ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যদের গূঢ় আধ্যাত্মিক ইঙ্গিত ও জীবনাচরণের আনন্দকে ব্যক্ত করার জ সাধনসঙ্গীত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে নেপালের রাজদরবারে গ্রন্থাগার থেকে পুথিটি আবিষ্কার করেন। পুথিটি আনুমানিক দশম – দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত। তালপাতার এই পুথিতে চব্বিশজন সিদ্ধাচার্যের লেখা সাড়ে তিনটি পদ নষ্ট হওয়া মোট সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া গেছে অর্থাৎ মোট পঞ্চাশটি পদ ছিল। এই গ্রন্থে বর্ণি ধর্মতত্ত্ব, কবিত্ব ও তৎকালীন সমাজচিত্র অতিশয় মূল্যবান।

চর্যাকারগণ বৌদ্ধসহজিয়া ছিলেন। সত্য উপলব্ধির জন্য এই বৌদ্ধসহজিয়াগণ সহজ সাধনার পথকে গ্রহণ করেছিলেন। সহজিয়াদের মতানুসারে শূন্যতা হল প্রকৃতি এবং করুণা হল পুরুষ। এই প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনে বোধিচিত্তের পরমানন্দময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। এটাই হল মহাসুখ। আর এই মহাসুখই ধ্রুবসত্য। এই সহজপথ অবলম্বন করলে সাধক অতি সহজেই নির্বাণলাভ করতে পারবেন। সিদ্ধাচার্যরা সাধনার সূক্ষ্মতম অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করেছেন জীবনের নানা পরিচিত চিত্রের মধ্যদিয়ে।

চর্যাপদগুলির ধর্মীয় ভাবনায় বাঙালি জীবনের পরিচয় নানাভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। পদকর্তারা গুহ্য সাধনতত্ত্বকে দৈনন্দিন জীবনের রূপকল্প দিয়ে ভক্ত শিষ্যদের বোঝাতে চেয়েছেন। তত্ত্বদর্শী সাধকবৃন্দ চর্যাগীতির মধ্যে জীবনপ্রেমিক কবিরূপে প্রকাশিত। চর্যাপদের বাঙালি জীবনচিত্রের প্রেক্ষাপটে সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম কীভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তার আলোচনা করি।

চর্যাপদে বর্ণিত বাঙালি জীবনচিত্র প্রধানত লোকায়তিক। এর মধ্যে বর্ণাশ্রম-শাসিত উচ্চবর্ণের কথা কম। আছে, নদীমাতৃক ও আরণ্যক বঙ্গভূমির নিতান্ত নিম্নবর্গের মানুষের বলিষ্ঠ জীবন-সংগ্রাম, জাতিপ্রথা সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং স্বাভাবিক কামনাবাসনাকীর্ণ পারিবারিক জীবনপ্রবাহ।

চর্যাপদে বর্ণিত তৎকালীন সমাজব্যবস্থার কথা আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় জাতির কথা। বাংলাদেশ অনার্যপ্রধান দেশ। গুপ্ত সাম্রাজ্যের সময় থেকে অর্থাৎ খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক থেকে বাংলাদেশে ছিটেফোঁটা আর্যজাতি, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির আমদানি হয়ে থাকে। বাংলাদেশ অনার্যজাতির ভিতরে কোন জাতিই ঐতিহাসিকদের চোখে প্রাধান্য লাভ করেছে। এই আদিম কোলগণের ভিতরে শবর, পুলিন্দ, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি আদিম জাতিগুলি সভ্য নাগরিক জীবন থেকে দূরে সরে ছিল। পণ্ডিতেরা মনে করেন, চর্যার যুগে এই আদিম জনগোষ্ঠীর কথা, তাদের বাসস্থান, চরিত্র, সামাজিক সংস্কার, বৃত্তি ইত্যাদি জীবনচিত্রের ছবি সিদ্ধাচার্যদের চোখে সাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রকাশে প্রধান হয়ে উঠেছে।

চর্যার ২৮ সংখ্যক পদে শবরপাদ অন্ত্যজ শ্রেণির শবর-শবরীদের পার্বত্যজীবনের ছবি অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন –

> "উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই সবরী বালী।
> মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গীবত গুঞ্জরী মালী।।
> উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহোরি।
> ণিঅ ঘরণী নামে সহজ সুন্দরী।।"

এর সাধারণ অর্থ হল, উঁচু পর্বতে শবরী বালিকা বাস করে। শবরীর পরিধানে ময়ূরপুচ্ছ,

গলায় গুঞ্জার মালা। ওগো উন্মত্ত শবর, ওগো পাগল শবর, গোল বা ভুল কোরো না, দোহাই তোমার – আমি তোমারই গৃহিণী, নামে সহজ সুন্দরী।

উপরের পদটিতে শবর-শবরীর জীবনের আধারে ধর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে বলে পণ্ডিত-গবেষকদের অনুমান। এখানে সাধকের দেহ হল পর্বত, পর্বতশৃঙ্গ হল মস্তিষ্কের মহাসুখচক্র। পদটির মূল ধর্মকথা হল, বিষয়াসক্তিতে পূর্ণ সাধকের মন নৈরাত্মাকে চিনতে পারেননি; যখন চিনতে পারলেন, তখন মিলনের জন্য মহাসুখের শয্যা বিছালেন। নৈরাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে সাধক মহাসুখচক্ররূপ শিখর সন্ধিতে প্রবেশ করলেন।

সমাজের আর এক অন্ত্যজ শ্রেণি ব্যাধ সম্প্রদায়ের হরিণ শিকারের বর্ণনা আছে ভুসুকু পাদের ৬ সংখ্যক পদে –

"কাহেরে ঘিনি মেলি আচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস।।
অপনা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
ঘনহ ন ছাড়অ ভুসুকু অহেরি।।"

এই পদটিতে সেকালের ব্যাধ সম্প্রদায়ের শিকার জীবনের ছবি, শিকারের পদ্ধতি এবং খাদ্যস্বরূপ হরিণ-মাংসের কথা আছে। ভুসুকুপাদ হরিণ শিকারের চিত্রকল্পের মাধ্যমে সহজিয়া তত্ত্বদর্শনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অবিদ্যাবিমোহিত চিত্তরূপ হরিণ নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে নিয়ে আসে, পরে নিজের বিপদ বুঝে জাগতিক ভোগ-সুখ থেকে বিরত হয়ে নির্বাণরূপী হরিণীকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

নিম্নজাতীয়া ডোম্বীর উল্লেখ আছে কাহ্নপাদের ১০ নং চর্যাপদে। এই অস্পৃশ্য জাতিকে ছুঁতো না সেকালের সমাজে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। অর্থাৎ তৎকালীন সমাজে জাতিভেদ প্রকট ছিল। তাই নগরের বাইরে অর্থাৎ উচ্চঅভিজাত সমাজবৃত্তের বাইরে তাদের কুঁড়ে ঘরে বসবাস –

"নগর বাহিরিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্ম নাড়িআ।।"

এই ডোম রমণী নৌকায় যাতায়াত করত, ডোম্বী পাটনির কাজ ও বাঁশের জিনিস – চুপড়ি, চাঙ্গাড়ি বা ফুলের সাজি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করত। নৃত্যগীত পটীয়সী এই ডোম্বী একটি পদ্মের চৌষট্টিটি পাপড়ির উপর চড়ে অসাধারণ নেচে লোকের মন ভোলায়।

বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত এই পদটিতে পদ্ম হল দেহমধ্যস্থ নির্মাণচক্র। পদটির শেষে অস্পৃশ্যা ডোম্বী ও কাপালিক যোগীর অবৈধ মিলনের রূপকে সহজ সিদ্ধিলাভের কথা বলেছেন সিদ্ধাচার্যরা।

"গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রেঁ বহই নাই।
তহিঁ বুড়িলী মাতঙ্গী যোইআ লীলে পার করেই।।"

উপরের পদটিতে দেখছি তৎকালীন সমাজে ডোমরমণী পাটনীরূপে নৌকা পারাপার করত। অর্থাৎ অন্ত্যজ শ্রেণির নারীরা পরিশ্রমী ছিল। গঙ্গা-যমুনা মাঝে নৌকা বইছে, তাতে মাতঙ্গকন্যা ডোম্বী জলে ডুবে ডুবে যোগীকে অবলীলাক্রমে পার করে। এই পদটিতে বোধিচিত্তরূপ নৌকাচালনার রূপকে বৌদ্ধতান্ত্রিক সহজ সাধন প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে।

নদীমাতৃক বাংলাদেশের কাব্যে নদীপ্রসঙ্গ খুবই স্বাভাবিক। চর্যার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার ছবি, নদীর উপরে সেতুনির্মাণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, নদীবক্ষে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। ৫ সংখ্যক পদে চাটিলপাদ বলেছেন –

"ভবনই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন যাহী।।"

বৌদ্ধধর্মের গুহ্য সাধনতত্ত্বগুলি সাগর-নদী-খাল-বিলের রূপকেই বর্ণিত হয়েছে। নদীর এই অতিরিক্ত কাদাভরা দুই কূল বা তীর পলিমাটির বাংলাদেশের নদীর বৈশিষ্ট্যসূচক। গহন বা গভীর ভবনদী গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। নদীর দুই তীর কর্দমাক্ত – মাঝখানে ঠাঁই নেই। এখানে ভবসংসারকে নদীস্রোতের সঙ্গে তুলনা এবং মধ্যপথ অবলম্বনের নির্দেশ (বৌদ্ধদর্শনে মধ্যমা প্রতিপদ) ইত্যাদিতে বৌদ্ধদর্শনের তত্ত্ববর্ণনাই কবিতাটির উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য বলে মনে হয়। মধ্যপথ অর্থাৎ পরমসত্য গভীর। চাটিল পাদের সাঁকো গড়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্মের সংবৃত্তি ও পারমার্থিক বোধিচিত্তের মিলনকে বুঝিয়েছেন সিদ্ধাচার্য। অর্থাৎ মধ্যনাড়ীর মধ্যদিয়ে পরমসত্যে উপনীত হওয়া যায়। এইভাবে চললে সাধক মহাসুখ লাভ করবে।

ঢেণ্ঢণপাদের ৩৩ নং চর্যাগীতি 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী' পদটিতে বাঙালির দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের অসহায়তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে দেখি হাঁড়িতে ভাত নেই অথচ নিত্য অতিথির আনাগোনা। বহুসন্তানে সংসার বেড়েই চলে। যোগসাধনার দিক থেকে এখানে টিলা হল মহাসুখচক্র, প্রতিবেশী হল চন্দ্রসূর্যরূপ দ্বৈতাভাস (বা পার্শ্বস্থ দুই নাড়ী), হাঁড়ি হল দেহভাণ্ড, ভাত হল সংবৃত্তি –বোধিচিত্ত, ব্যঙ্গ হল অঙ্গশূন্য প্রভাস্বর বিজ্ঞান, দুধ হল বোধিচিত্ত, বাঁট হল মহাসুখচক্রপথ, বলদ হল সংবৃত্তি বোধিচিত্ত, গাভী হল নৈরাশ্যরূপী শূন্যতা। এইভাবে বাঙালি জীবনের দারিদ্র্যের বর্ণনার মাধ্যমে সিদ্ধাচার্য আসলে বৌদ্ধধর্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বকেই প্রকাশ করেছেন, যাতে সাধক সহজেই এই তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারেন।

মৎস্যজীবী (কৈবর্ত), তাঁতি, ধুনুরি, ছুতার, বণিক ইত্যাদি বৃত্তিধারী মানুষের জীবনচিত্রও চর্যাপদে বর্ণিত হয়েছে।

"সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী।।"

উপরিউক্ত চর্যার ৮ নং পদটিতে নদীপথে নৌকার সাহায্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা জানতে পারি। সেইসঙ্গে এই পদটিতে রয়েছে সহজসাধনার তত্ত্বকথা – প্রজ্ঞাস্বরূপ শূন্যতা-ই হল সাধক জীবনের সোনা, আর অবিদ্যাচিত্তজাত যে রূপজগৎ তাই হল রূপা। চিত্তরূপ নৌকাকে মহাসুখের পথে চালিত করলে অবিদ্যা দূরীভূত হবে। তবে সতর্কভাবে গুরুর নির্দেশে ডান ও বামদিকে চেপে অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার প্রতিবন্ধকতা দূর করে মধ্যনাড়ী সুষুম্নার সঙ্গে মিলিয়ে দিলেই মহাসুখলাভ হবে।

সমাজে মুষিকের উৎপাতের চিত্রটিও খুব সুন্দর। অন্ধকারে মুষিকের আনাগোনা, জিনিস তছনছ, আমন ধানখেত নষ্ট করার কথা আছে ভুসুকু পাদের লেখা এই পদটিতে –

"নিসি অন্ধারী মুসা অচারা।
অমিঅ ভখঅ মুসা মরঅ অহারা।।"

পণ্ডিতদের অনুমান চঞ্চলচিত্তকে চঞ্চল মুষিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

এইভাবে চর্যাগীতিতে প্রতিফলিত বাঙালি জীবনচিত্র বর্ণনায় আমরা দেখতে পাই, কবিগণ অধ্যাত্মপথের যাত্রী হলেও বিস্মৃত হতে পারেননি বাঙালি জীবনের মূল স্রোতকে। তাই বাঙালি জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনার মাধ্যমেই সাধকগণ বৌদ্ধধর্মের সহজিয়া সাধনপদ্ধতিকে তুলে ধরেছেন। অর্থাৎ চর্যাপদের বাঙালি জীবনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের অনেক চিহ্ন আমরা দেখতে পাই।

গ্রন্থপঞ্জি

১. দাস আশা; 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি'; ক্যালকাটা বুক হাউস; ১৯৬৯।
২. দাস আশা; 'বৌদ্ধধর্ম ও রবীন্দ্রনাথ'।
৩. দাশগুপ্ত শশিভূষণ; 'বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি'; ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৮৪।
৪. দে সত্যব্রত; 'চর্যাগীতি পরিচয়' ; জিজ্ঞাসা; কলকাতা; প্রথম সংস্করণ – অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।
৫. বাগচী শ্রী প্রবোধচন্দ্র; 'বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য'; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়; প্রকাশ – ১৩৫৯ মাঘ
৬. সিন্হা গোপালচন্দ্র; 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড : প্রাচীন ও আদিমধ্যযুগ); প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স; কলকাতা; সেপ্টেম্বর, ২০১১।

....

বৌদ্ধধর্ম : আবহমানকাল বাঙালি সংস্কৃতির নিয়ামক

অমিত দে

ভারতমায়ের কোল আলো করা বাংলাভূমি আমাদের প্রাণের, আমাদের মাতৃভূমি। শস্য শ্যামলা, সুজলাং-সুফলাং এই সোনার মাটিতে মানুষের প্রাণের টান, অন্তরের ভালোবাসা ভারতকে সারা পৃথিবীর কাছে মহান করে তুলেছে। বাঙালির আবেগ, বাঙালির ভালোবাসা সারা পৃথিবীর কাছে সমাদৃত হয়েছে। উনিশ শতকীয় রেনেসাঁ কিম্বা স্বাধীনতা আন্দোলন যেকোনো কিছুতেই নিজেকে প্রমাণ করেছে বাঙালি। কালে কালে বিদ্যাসাগর, রামমোহন, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, জগদীশ, সত্যেন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র প্রমুখ ঋষি-মনীষী, কবি-সাহিত্যিকদের জন্ম হয়েছে সোনার বাংলাতে। এত পরিমাণ বিখ্যাত লোকের জন্ম সারা ভারতবর্ষের অন্য কোথাও হয় নি। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সমগ্র ভারতের শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-উপাসনার পীঠস্থান ছিল। প্রাচীন যুগ থেকেই স্বতন্ত্র বাঙালি সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। এসবের মূলে একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে, একটা পোক্ত ব্যাকগ্রাউণ্ড রয়েছে।

শিল্পীর তুলির রং দিয়ে অসংখ্য আঁকাবাঁকা দেশ বাংলাদেশের একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। প্রায় চার হাজার বছরের পুরানো তাম্রযুগের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে বাংলায়। ইন্দো-আর্যরা আসার পর খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ রাজ্য গঠিত হয়। এই রাজ্যগুলি বাংলা ও বাংলার আশেপাশে গড়ে উঠেছিল। প্রায় একহাজার খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে অথর্ব বেদে এই রাজ্যগুলির উল্লেখ রয়েছে। মগধকে কেন্দ্র করেই বাংলা শাসিত হত। মৌর্য বংশ, হর্যঙ্ক বংশ, গুপ্ত বংশের রাজারা বাংলাকে শাসন করতেন, বাংলার নিজস্ব কোন রাজা ছিল না। বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা হলেন শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ)। ৬৩৭ খ্রিঃ রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শ বছর ধরে বাংলার বুকে চরম অরাজকতা চলেছিল যা ইতিহাসের পাতায় 'মাৎসন্যায়' নামে পরিচিত। এ সময় বাংলার বুকে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। খুন, রাহাজানি, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি চরম অশান্তিতে বাংলার দরিদ্র মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছিল। এমতাবস্থায় অতীষ্ট বাঙালিরা নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাতে রাজা নির্বাচন করে। সামন্তরাজা গোপাল আনুঃ ৭৫৬ খ্রিঃ বাংলার রাজা হিসাবে নির্বাচিত হন। এতদিনের অন্যায়, অত্যাচার, আবর্জনা, কলুষতার কুয়াশা কেটে নতুন সূর্যোদয় দেখল বাংলা। দীর্ঘ চারশত বছর ধরে (৭৫৬-১১৬০ খ্রিঃ) বাংলার বুকে পাল বংশ রাজত্ব করেছিল। বাংলার ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয় এই সময়কালকে। পাল রাজারা সকলেই

গবেষক ছাত্র, বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি।

বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সমগ্র বাংলা জুড়ে শান্তি ও সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈ হয়েছিল। মানুষে মানুষে কোন বিভেদ ছিল না, হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজা ছিল। বাংলা জ্ঞান-বিজ্ঞানের উত্তুঙ্গ শিখরে পৌঁছেছিল। বিক্রমশীলা, সোমপুরী, ওদন্তপুরী নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসত সুতরাং বাংলাকে বিশ্বমাঝে একটা বড় জায়গা দিয়েছিল পাল আমল। আসলে এসবের মূলে ছিল ধর্মের মুক্ত হাওয়া। গৌতম বুদ্ধ ছিলেন মানবতাবাদের পূজারী। বুদ্ধ শান্তি ও মৈত্রীতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর অভয় বাণী ছিল –

'মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা এক পুত্তম অনুরকখে
এবম্পি সর্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।'

মাতা যেমন নিজের আয়ু দ্বারা একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা করে তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমিত মৈত্রী পোষণ করবে।

মানব মুক্তির যাবতীয় উপাদান তাঁর প্রচলিত ধর্মে রয়েছে। স্বয়ং আইনস্টাইন বৌদ্ধধর্মকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলেছেন। তাঁর মতে, বৌদ্ধ ধর্মে রয়েছে আগামী দিনে 'কসমিক রিলিজিয়াস' অনুভূতির ধারণা। তিনি সরাসরি বলেছেন, "যদি পৃথিবীতে এমন একটি ধর্মও থেকে থাকে যা আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে তবে তা হল বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম হবে আগামীর কসমিক ধর্ম। এই ধর্ম ভিত্তি করে অভিজ্ঞতার উপরে, অন্যের চাপিয়ে দেওয়া "অবিতর্কযোগ্য" ধারণার উপরে নয়"।[১] মানুষের অজ্ঞানতা, মূঢ়তাকে, গভীরভাবে সমাচ্ছন্ন পৃথিবীকে অ্যালবার্ট বলেছেন 'ছায়া পরিবেশের কারাগার'। মানুষকে এই সমস্ত থেকে মুক্তি দিতে পারে গৌতম বুদ্ধের আদর্শ। বাংলার মানুষ একদিন টলেছিল এই ভাবাদর্শে। পাল আমল থেকেই বাংলার আকাশে-বাতাসে বৌদ্ধ হাওয়া বইত। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এক নতুন দিশা দেখেছিল বাঙালি। বাঙালির নতুন দিকের পরিচয় ড. নীহাররঞ্জন রায়, ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. আশা দাস প্রমুখ ইতিহাসবিদদের লেখাতে পাওয়া গেছে। সেগুলির দু'একটি তুলে দেওয়া হল –

১. ড. নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, "এ যুগেই একটি সামগ্রিক ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে। ইহাই বাঙালির স্বদেশ ও স্বজাত্যবোধের মূলে এবং ইহাই বাঙালির এক জাতীয়ত্বের ভিত্তি পালযুগের ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান।"[২]
২. ড. আশা দাশ বলেন, 'প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়ে যদি বাঙালির কিছু গৌরব করার থাকে তবে সে ইতিহাস রচিত হয়েছে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের যুগে।'[৩]
৩. ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে

বাঙালির নতুন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। ধর্ম, শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়েই এ জাতীয় জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ করেছিল।
পালরাজাগণের চারিশত বর্ষ ব্যাপী রাজ্যকাল বাঙালি জাতির আত্ম প্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্মপালের রাজ্য বাঙালির জীবন প্রভাত।'[৪]

এখন দেখার বিষয় এই যে, বাংলায় বৌদ্ধধর্ম কি পাল সাম্রাজ্যের হাত ধরে এসেছিল? নাকি তারও আগে বাংলাতে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল? – গবেষকরা জানাচ্ছেন যে, তথাগত বুদ্ধই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার করেছিলেন। নদী, খাল, বিল অধ্যুষিত গ্রাম-বাংলার বুকে তিনি এসেছিলেন। সংযুক্ত নিকায়ে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ একবার সুহ্ম ভূমির অন্তর্গত শেতক নগরে কিছুদিন বসবাস করেছিলেন। রাঢ় দেশের অপর নাম সুহ্ম। বর্তমান এটি মেদিনীপুর অঞ্চল। অঙ্গুত্তর নিকায়গ্রন্থে বঙ্গান্তপুত্ত নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর উল্লেখ পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতায় জানা যায় পুন্ড্রবর্ধনের রাণী সুমাগধার আমন্ত্রণে বুদ্ধ পুন্ড্রবর্ধনে এসে ছয়মাস অবস্থান করেছিলেন। চীন পরিব্রাজক য়ুয়াঙ চোয়াঙ তার ভ্রমণকাহিনিতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট এবং কর্ণসুবর্ণে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। অতএব বুদ্ধের জীবদ্দশায় যে বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নাই। মগধে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার বাংলায় এসে আছাড় মারবে না তা হয় না। তখন তো মগধ ছিল সমগ্র ভারতের একটি বৃহত্তর শক্তি। গৌতম বুদ্ধের বাংলায় আগমনকে নিয়ে অনেক কাহিনি রয়েছে। তেমনই এক গল্পের কথা উল্লেখ করা হল :

যীশু খ্রিষ্টের জন্মের পাঁচশো বছর আগে প্রাচীন বঙ্গভূমির এক শস্যক্ষেতের ধারে তথাগত তাঁর অপরূপ মহিমা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। সেখানে ক্ষেতে কাজ করছিল তিলক নামক এক চাষী। সঙ্গে ছিল তার মেয়ে অঞ্জনা। অষ্টাদশী এই কন্যাটি বুদ্ধের রূপে মুগ্ধ হয়ে যান। বুদ্ধ ভাত, অড়হর ডাল ও ডালের বড়া দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন। খাওয়া শেষ হলে বুদ্ধ কৃষককে তিনটি উপদেশ দেন – ক. জীবনে দুঃখ আছে, খ. কাজেই আমাদের দয়াশীল হওয়া উচিত, ও গ. জীবনকে এত সিরিয়াসলি নেবার দরকার নেই। কৃষক কন্যা অঞ্জনা তা শুনে অবাক হয়ে যায়।[৫] গৌতম বুদ্ধ এরকম সহজ-সরল ভাবে মানুষের ভেতরে প্রবেশ করেছিলেন। রাজপুত্র গৌতমের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন সরলতার সঙ্গে মিশে যাওয়াকে সেদিনের দরিদ্র বাঙালিদের মনে ধরেছিল। মহাজন সাহিত্যে যে ষোল জন মহাস্থবিরের নাম পাওয়া যায় তাতে তাম্রলিপ্তবাসী বঙ্গীয় ভিক্ষু কালিকের নামও রয়েছে। সিংহলী গ্রন্থে যে সমস্ত বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত জনপদের উল্লেখ রয়েছে তাতে বঙ্গ দেশের নাম রয়েছে। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম বাংলাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। একথা অনুমান করা হয় যে, খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে

বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচারকালেই বাংলাতে বৌদ্ধধর্মের বীজ রোপিত হয়েছিল। তবে সম্রাট অশোকের সময় তা সার্থক প্রতিষ্ঠা পায় এবং অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাল শাসনে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের 'স্বর্ণযুগ' বলা যায়। সুতরাং একটা জাতির সংস্কৃতির গতিপথ নির্ধারিত করেছিল বৌদ্ধ ধর্ম।

পালযুগে বৌদ্ধধর্মের যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবিকতা, সকল ধর্মের প্রতি সমভাবাপন্ন মনোভাব ইত্যাদি সমস্ত গুণগুলি বাঙালি জাতির মধ্যে প্রবেশ করেছিল তা এরপর আর থেমে থাকেনি। বাঙালিদের রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বৌদ্ধ প্রভাব। পালযুগেই রচিত হয়েছিল বাঙালির প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন "চর্যাপদ"। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' আবিষ্কার সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ দিকের পরিচয় বহন করেছে। নবম-দশম শতকের বাংলার জীবনকথা, লোকজীবনের খুঁটিনাটি বর্ণিত হয়েছে। সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা তাঁদের ধর্মের গোপনীয়তা রক্ষা করেছিলেন রূপক শব্দের ব্যবহারে। এই সমস্ত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা প্রায় সকলেই ছিলেন বাঙালি। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে অনেকের জন্মস্থান এই বাংলার বিভিন্ন জনপদে। চর্যাপদ বা চর্যাগীতি রচয়িতা সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে লুইপাদ (পশ্চিমবঙ্গ), কাহ্নপাদ (পশ্চিমবঙ্গ), জালন্ধরীপাদ (চট্টগ্রাম), ধর্মপাদ (বিক্রমপুর), বিরূপাপাদ (কুমিল্লা), ডোম্বীপাদ (কুমিল্লা), চাটিলপাদ (চট্টগ্রাম), তিলোপাদ (চট্টগ্রাম), নারোপাদ (চট্টগ্রাম), গোরক্ষপাদ (কুমিল্লা), চৌরঙ্গীপাদ (কুমিল্লা), মীননাথ (বরিশাল), সহ অনেকেই বাঙালি ছিলেন। কুমিল্লার শালবন বিহারকে আজো এখানকার স্থানীয় লোকেরা বলে হাড়িপা সিদ্ধার বাড়ি। অনেকে বলে গোরক্ষ সিদ্ধার বাড়ি, আবার কেউ বলে চৌরঙ্গী সিদ্ধার বাড়ি। এই সিদ্ধাচার্যরাই বাংলাদেশে অবস্থিত সোমপুরী, শালবন, বিক্রমপুরী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত হিসেবে জ্ঞানচর্চায় নিবেদিত ছিলেন বলে জানা যায়। তৎকালীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য অতীশ দীপঙ্কর সে সময়কার শ্রেষ্ঠ মনীষী ছিলেন। সুদূর তিব্বতে গিয়ে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। বাংলা তথা ভারতকে আন্তর্জাতিক পটভূমিতে দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা নিয়েছিলেন মহাপণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর। সুতরাং, বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করেই ভারত আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে বিশেষ পরিচয়বাহী হয়ে উঠেছিল।

'চর্যাপদ' পরবর্তীতে প্রায় প্রতিটি সাহিত্য কর্মে বৌদ্ধধর্মের অবিসংবাদী প্রভাব রয়েছে। পঞ্চদশ শতকের বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের কবিতাতে মানবের জয়গান করা হয়েছে এইভাবে – "শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য / তাহার উপরে নাই।" বাউল সাধনা অনেকটা বৌদ্ধ প্রভাবিত। বৌদ্ধধর্মের মানবিকতা, ধর্মীয় উদারতা, জাতপাতহীনতা পরবর্তীকালে বাউলগানগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। বাউল গানের প্রধান কবি

লালনের গানে সে প্রভাব বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। প্রায় আড়াই হাজার পর লালন গেয়ে উঠলেন – "মানুষগুরু নিষ্ঠা যার ভবে মানুষগুরু নিষ্ঠা যার / সর্ব সাধন সিদ্ধ হয় তার।" বিশিষ্ট গবেষক আহমদ ছফা বলেছেন, 'এক সময় এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করেছিল, আমাদের ভাষা-সাহিত্য এবং সংস্কৃতির অনেক উৎকৃষ্ট সৃষ্টি বৌদ্ধ উৎস থেকে এসেছে এবং বাউল গান তারই একটি।' প্রাচীন লোককথা, গানে ও পূজাপদ্ধতিতে বাউলগানের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের ধর্মপূজা, গাছপূজা ও চণ্ডীপূজার মধ্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষ করা যায়। বৌদ্ধ সংস্কৃতির আবহমান ধারায় বহু বাঙালি কবি-সাহিত্যিক নিজেদের নিমজ্জিত করেছেন। সাঁতার কেটে ভেসে বেড়াননি, একেবারে তলানিতে ডুব দিয়ে পরশপাথর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। উনিশ শতকীয় নবজাগরণকে বুদ্ধ অনুগত মানবতাবাদ অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র সেন, শরচ্চন্দ্র দেব, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ মনীষীতুল্য ব্যক্তি বুদ্ধদেবের জীবন ও দর্শন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। বুদ্ধকে বাঙালির একান্ত আপন করে তুলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথ না থাকলে বাঙালি হৃদয়ের এতটা নিকটে আসতে পারতেন না গৌতমবুদ্ধ। রবীন্দ্রনাথকে তিনি পৃথিবীর 'সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব' বলেছেন। গানে, কবিতায়, নাটকে ও উপন্যাসে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ করা গেছে। রবীন্দ্রমননে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম একেবারে সিমেন্ট মাখানো ইটের মতো গেঁথে গেছে। সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্য পর্যালোচনা করলে এটা পরিষ্কার হবে যে, রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ভাবনায় আকণ্ঠ ডুবেছিলেন। নিদ্রায়-জাগরণে, শয়নে-স্বপনে ও ভ্রমণে তিনি বুদ্ধকে স্মরণ করতেন। তাঁর নমুনা তাঁর নানা কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক ও উপন্যাসে রয়েছে। বরোবুদুর দেখার পরে, থাইল্যাণ্ডের প্রাচীন সিয়াম দেখার পরে, সারনাথের মৃগলব্ধকুটি-বিহার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে মহামানব বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। বুদ্ধ ছিল তাঁর প্রেরণা, তাঁর সত্যনিষ্ঠার অন্যতম শক্তি। 'কথা ও কাহিনী', 'পত্রপুট', 'জন্মদিনে', 'খাপছাড়া', 'পরিশেষ' ইত্যাদি কাব্যে। মালিনী (১৮৯৬), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), নটীর পূজা (১৯২৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শাপমোচন (১৯৩১) নাটকে বৌদ্ধআখ্যান রয়েছে। বৌদ্ধআখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাস রচনা করেননি। তবে 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসে নিখিলেশের আত্মকথায় এবং 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) উপন্যাসে ১৩শ পরিচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক উক্তিতে বুদ্ধপ্রসঙ্গ রয়েছে। প্রবন্ধগ্রন্থ 'সমালোচনা', 'ভারতবর্ষ', 'বিচিত্র প্রবন্ধ', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্য', 'সমাজ', 'শিক্ষা', 'রাজাপ্রজা', 'ধর্ম',

'সঞ্চয়', 'পরিচয়', 'জাপানযাত্রী', 'লিপিকা', 'জাভাযাত্রীর পত্র', 'মানুষের ধর্ম', 'ভারতপথিক রামমোহন', 'শান্তিনিকেতন', 'কালান্তর', 'পথের সঞ্চয়', 'আত্মপরিচয়', 'সাহিত্যের স্বরূপ', 'বিশ্বভারতী', 'ইতিহাস', 'বুদ্ধদেব', 'খৃস্ট' প্রভৃতি গ্রন্থে একাধিকবার বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃতি ও আখ্যানের উল্লেখ রয়েছে। রবি ঠাকুরের জীবদ্দশাতেই ঘটে গেছে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। চোখের সামনে দেখেছেন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুকে, হিংসার লেলিহান শিখায় দগ্ধ হয়েছে সাধারণ মানুষ। এসব দেখেই রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের গৌরদেহী রাজপুত্র সন্ন্যাসী তথাগতকে স্মরণ করলেন এইভাবে –

"হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী,
নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
লোভ জটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
'কর ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন অমৃতবাণী,
বিকশিত কর প্রেমপদ্ম
চিরমধুনিষ্যন্দ"। (পরিবেশ, 'বুদ্ধজন্মোৎসব' কবিতা)

নজরুল বলেছেন, 'গাহি সাম্যের গান / মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই / নহে কিছু মহীয়ান।' নজরুল আরও বলেছেন, 'হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির-কাবা নাই।' এখানেও মানবতারই জয়গান করা হয়েছে– মানুষের মনুষ্যত্বকে মূল্যায়ন করা হয়েছে। আর এই মানবতার জয়গান ও মনুষ্যত্বের মূল্যায়ন বৌদ্ধ ভাবাদর্শের মূলমন্ত্র। জীবনানন্দ তাঁর কবিতার অনেক জায়গায় বৌদ্ধ সংস্কৃতি-ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে এনেছেন।

মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে শাক্যবংশীয় রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গেরুয়া বসনধারী সন্ন্যাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। একাগ্রতা, নিষ্ঠা, সঠিক, অনুশাসন তাঁকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি পরিণত হয়েছিলেন তথাগত বুদ্ধতে। প্রাচীন ভারতের তাবড় তাবড় রাজার তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। মগধ সম্রাট বিম্বিসার, কোশল অধিপতি প্রসেনজিত গৌড়রাজা হর্ষবর্ধন সকলে ছিলেন মহামতি বুদ্ধের পৃষ্ঠপোষক। সম্রাট অশোকের জীবনচক্রটাই পরিবর্তিত হয়েছিল বুদ্ধের আদর্শে। তথাকথিত আর পাঁচটা ধর্মের মতো আচার-সর্বস্বতা সেখানে নেই। মানব মুক্তির কথা রয়েছে, হিংসা-দ্বেষ নির্মূল করার উপায় বর্ণিত হয়েছে। অহংকার পরিত্যাগ করে সুস্থ মানবজীবনের মন্ত্র বুদ্ধের ধর্মে রয়েছে। আসলে বৌদ্ধধর্ম ঠিক 'ধর্ম' নয়, আদর্শ। এই আদর্শের উত্তুঙ্গ ঢেউ ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে চীন, তিব্বত,

নেপাল, থাইল্যাণ্ড, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ মহামানবেরা বুদ্ধ অনুগত ছিলেন। আমাদের স্বামী বিবেকানন্দ এ দেশে বুদ্ধের মানবতাবাদকে পুনরুদ্রেক করে যেন বললেন 'জীবে প্রেম করে যে জন / সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' মানুষই ঈশ্বর এমন মন্তব্যের প্রথম দৃঢ় প্রবক্তা গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং। আপ্লুত ভারতবাসী, আপ্লুত বাঙালিরা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মুসলিম ধর্মের প্রাধান্যতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে পড়ল। বৌদ্ধ পণ্ডিতরা বিতাড়িত হলেন, এক ঘোরতর সংকটের উপস্থিতি হল। কিন্তু বাঙালি সংস্কৃতিতে ততদিনে বৌদ্ধ দর্শন মজ্জাগত হয়ে গেছে। ফুলটি বৃন্তচ্যুত হলেও তাতে গাছের পরিচিতির তো কোন ক্ষতি হয় না। ফল্গু নদীর অন্তর্বাহী স্রোতের মতোই বৌদ্ধ দর্শন প্রবাহিত।

বহুকাল আগে থেকেই একতাবোধ ও মিলনের যে বীজ রোপিত হয়েছিল তার অনুবর্তন একালেও ঘটেছে। ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৭০, ১৯৭১, ও ১৯৯০-এ বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে সর্বাত্মভাবে। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধে বাঙালির লড়াই ছিল দেখার মতো। বাঙালির সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছিল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষেরা। অনেক বাঙালি বৌদ্ধ এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক জ্যোতিঃপাল মহাথের শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ডে ইত্যাদি দেশগুলি ঘুরে বেড়িয়েছেন আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানের অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে। বাংলাদেশের বৌদ্ধদের আর এক ধর্মীয় গুরু, কর্মবীর, সমাজ সংস্কারক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় অনেক নিরপরাধ বাঙালিকে আশ্রয় দিয়ে, জীবন বাঁচিয়ে অনন্যসাধারণ অবদান রাখেন। মাতৃভূমি রক্ষার জন্য তাঁদের এই অবদান বাঙালি সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। যে বৌদ্ধিক চেতনা বাঙালির হৃদয়ের মানসপটে আসন করে নিয়েছে সে চেতনাই বাঙালি ধারণ ও লালন করে আসছে যুগ যুগ ধরে। খ্যাতিমান গবেষক ও সাহিত্যিক হায়াৎ মামুদ বলেন, 'বাঙালি জীবনের মূলে বৌদ্ধ সংস্কৃতির বীজ নিঃসন্দেহে বর্তমান। তা খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমার বিবেচনায়, এদেশের বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বজ্ঞ ও সমাজতাত্ত্বিকদের উপরেই বর্তায়। জ্ঞানকাণ্ডের এই শাখাটি এদেশে অদ্যাবধি উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বাঙালি বলে যদি কোনো গর্ব আমার থেকে থাকে তবে আমার সংস্কৃতিতে এই বৌদ্ধ বীজের অঙ্কুরোদগম বিষয়ে সম্যক ধারণা না থাকলে সমূহ ক্ষতি। আমার আত্মপরিচয় ও জন্মের ইতিহাস অনেক্ষানি আড়ালেই রয়ে যাবে'।[৬] সুতরাং বাঙালি সংস্কৃতির জন্মলগ্ন থেকেই বৌদ্ধ প্রভাব রয়েছে এবং লালন, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দের হাত ঘুরে বর্তমান কালের বহুমাত্রিক সংস্কৃতির আড়ালে ফল্গুনদীর অন্তঃসলিলা ধারার মতো বয়ে

চলেছে।

তথ্যসূত্র :

১. Albert Einstein, quoted in Madelyn Murray O' Hair, All the Questions You Ever Wanted to Ask American Atheists (1982) vol. ii., p. 29
২. নীহাররঞ্জন রায়, "বাঙালির ইতিহাস" (আদিপর্ব), পৃ. ৪০০।
৩. ড. আশা দাশ, 'বাংলা সাহিত্য বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি', ভূমিকা, পৃ. ৩।
৪. ড. প্রণবকুমার বড়ুয়া, 'বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বঙ্গ সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতিসত্তা' (প্রবন্ধ), "বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধচর্চার পটভূমি", সম্পাদক-জগন্নাথ বড়ুয়া, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।
৫. 'গৌতম বুদ্ধ এবং তারপর......', ইন্টারনেট হতে গৃহীত।
৬. ড. হায়াৎ মামুদ, 'শিকড়ের সন্ধান : বাঙালি জীবনে বৌদ্ধ বীজ' (প্রবন্ধ), "বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধচর্চার পটভূমি", সম্পাদক-জগন্নাথ বড়ুয়া, শোভাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১২।

....

ভগবান বুদ্ধের দিব্যজন্ম : বুদ্ধচরিতের প্রথম সর্গের (আলোকে)

ড. অর্ণব পাত্র*

কালিদাস পূর্বযুগে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রখ্যাত বৌদ্ধ কবি হলেন অশ্বঘোষ। তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মপ্রবক্তা, পণ্ডিত, কবি, দার্শনিক, নাট্যকার ও সংগীত রসিক। প্রাক্ কালিদাসীয় যুগে কাব্যরচনা করে যাঁরা যশোভাজন হয়েছেন তাঁদের মধ্যে অশ্বঘোষই সর্বাগ্রগণ্য। অশ্বঘোষের সময়টি ছিল এক রহস্যময় আবেষ্টনের বেষ্টনে বেষ্টিত। 'কাব্যশাস্ত্র' ও 'শাস্ত্রকাব্য'- এই দুই রচনার ধারায় দ্বিধাবিভক্ত ছিলেন কবিসমাজ। অশ্বঘোষ এই উভয় শ্রেণির ধারায় কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের রাজা কণিষ্কের সমসাময়িক ও কণিষ্কের রাজসভার সভাকবি। তাঁর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু আমরা জানতে পারিনা। প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী তাঁর মাতার নাম সুবর্ণাক্ষী। পার্শ্বভগবৎপাদ ছিলেন তাঁর গুরু। বৌদ্ধ ও সন্ন্যাস গ্রহণের পর সাকেত অর্থাৎ অযোধ্যা নগরী ছিল তাঁর বাসস্থান। তিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও পরবর্তী-কালে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার জন্য তাঁকে মহাকবি, আচার্য, মহাবাদিন্ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।

জনশ্রুতি আছে, তাঁর কন্ঠমাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে অশ্বগণও তৃণভক্ষণ-থেকে বিরত হোত এবং উৎকর্ণ হয়ে তাঁর গান শুনতো। এই ঘটনা দেখে তাঁর সন্ন্যাস দীক্ষাগুরু সুগায়ক এই কবিকে অশ্বঘোষ নামে অভিহিত করেন।

কবিতার টান হৃদয়ের গভীরে। কাব্য বা কবিতা মানব হৃদয়কে এক অদ্ভুত পুলকে পুলকিত করে। আর একারণেই সুপ্রাচীন কাল থেকে ধর্মযাজকেরা সাধারণ মানুষের হৃদয় কন্দর পর্যন্ত দর্শন ও ধর্মের দুরূহ তথ্যরাজিকে উপস্থাপনের জন্য কাব্যের বা কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন, প্রাক্‌কালিদাসীয় লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ কবি অশ্বঘোষও এ কারণে কাব্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। সৌন্দরনন্দ কাব্যের নিম্নোক্ত শ্লোকে আমরা এরই প্রতিফলন দেখি

> "যন্মোক্ষাৎ কৃতমন্যত্র হি ময়া তৎ কাব্যধর্মাৎ কৃতম্।
> পাতুং তিক্তমিবৌষধং মধুযুতং হৃদ্যং কথং স্যাদিতি।।"
>
> (সৌন্দরনন্দ – ১৮ / ৬৩)

অর্থাৎ যেমন কটু তিক্ত ঔষধ সেবনের জন্য মধুর প্রয়োজন হয়, তেমনি পাঠকমনে ধার্মিক তত্ত্বরূপ বীজ বপনের জন্য মোক্ষধর্মরূপ পদার্থকে কাব্যধর্ম দ্বারা প্রকাশিত করাই শ্রেয়ঃ।

*অধ্যাপক ও সংস্কৃত বিভাগীয় প্রধান, আশুতোষ কলেজ।

আর এ কারণেই অশ্বঘোষ সন্ন্যাস গ্রহণের পর কাব্য নাটকাদি রচনার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মে ব্যাপক প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের অভিলাষে তিনি তিনটি অমূল্য কা রচনা করেন- বুদ্ধচরিত, সৌন্দরনন্দ ও শারিপুত্র প্রকরণ। এদের মধ্যে প্রথম দুটি মহাকা ও তৃতীয়টি দৃশ্যকাব্য বিশেষ। বুদ্ধচরিত কবির পরিণত বয়সের রচনা এবং তাঁর কাব্যর নৈপুণ্যের এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

ভগবান বুদ্ধের জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত মহাকাব্য বুদ্ধচরিত। এটি ২৮টি স বিভক্ত, তবে সংস্কৃতে মূল মহাকাব্যটির ১৭টি সর্গ পাওয়া যায়। যার মধ্যে আবার শেষ ৪ সর্গ নেপালী পণ্ডিত জনৈক অমৃতানন্দের রচনা। এটি একটি অলংকারশাস্ত্র সম্মত মহাকা এই মহাকাব্যে কবি কঠোর বাস্তব সত্যকে ভাবগম্ভীর বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশ করতে প্রয় হয়েছেন। কবি জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর নির্দয় রূপকে উদ্‌ঘাটিত করে বিষয় বাসনায় তী আসক্ত জনসাধারণ কে সেগুলি ত্যাগ করে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার উপদেশ দ করেছেন। কবির এই উপদেশ ব্যক্ত হয়েছে মহাকাব্যের 'কান্তাসম্মিত' ভাষায়। তাঁর কা মহনীয় হয়ে উঠেছে বৈদর্ভী রীতি এবং যমকাদি অলংকার প্রয়োগের মধ্য দিয়ে। বৌদ্ধধর্মে যাবতীয় ধর্মীয় বিষয় এবং বৌদ্ধ দার্শনিক-তত্ত্ব এতে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত হওয়ায় এ বৌদ্ধদের নিকট খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। দার্শনিক চিন্তাগুলি সরলও হৃদয়গ্রা হয়েছে।

বুদ্ধচরিত মহাকাব্যের বিভিন্ন সর্গে বিবিধ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 'ভগবৎপ্রসূতি' শীর্ষ প্রথম সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হল - বুদ্ধের দিব্যজন্মবর্ণন। 'ললিতবিস্তর' 'মহাবস্তুবদানে' ভগবান বুদ্ধের জীবনকথার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাতে কবি আপন মন মাধুরী মিশিয়ে অপূর্ব কাব্য সুষমায় মণ্ডিত করেছেন।

'মনুসংহিতা' নামক ধর্মশাস্ত্রের 'রাজধর্ম' শীর্ষক সপ্তম অধ্যায়ে পৃথিবীতে রাজাকে সৃ কারণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

"অরাজকে হি লোকেঽস্মিন্ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভু।" (মনুসংহিতা – ৭ / ৩)

অর্থাৎ এই পৃথিবীতে অরাজকতা দেখা দিলে সবলের ভয়ে দুর্বলেরা সব দিকে পলা করতে থাকলে সেই অরাজকতা দূর করে প্রজাকুলের রক্ষার জন্য জগৎপতি ব্রহ্মা রাজা সৃষ্টি করেন। আর সমাজে ধর্মের অবক্ষয় আর অধর্মের প্রাবল্য দেখা দিলে জগতের ক স্বরূপ স্বয়ং নারায়ণ অবতার পুরুষ রূপে এই ধরায় অবতীর্ণ হন। শুদ্ধোদনের পুত্র 'তথাগ নাম ধারণ করে জগতের হিত বা কল্যাণের জন্যই এই ভারতভূমিতে আবির্ভূত হয়েছিলে

তথাগত বুদ্ধের দিব্যজন্মবৃত্তান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে তৎকালীন সামাজিক অবস্থ

প্রেক্ষিতটা জানা প্রয়োজন। বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় বেদের অপ্রতিরোধ্য প্রভাব ছিল। আর এর সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণকুল বেদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে জনসাধারণের উপর বৈদিক বিধান চাপিয়ে একধরণের অত্যাচার চালাতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল যজ্ঞে যে সকল দ্রব্য আহুত বা উৎসর্গীকৃত হত তা সে ঘৃত হোক বা মনুষ্য, যিনি আহুতি দিতেন সেই যজ্ঞকারী স্বর্গপ্রাপ্ত হতেন। তৎকালীন সময়ে যজ্ঞে পশুপ্রদান একটি বিধান রূপে পরিগণিত ছিল। কিন্তু এই বিধান হিংসার বিধান। সামাজিক এই ঘৃণ্য কার্যাবলী বা নিয়মাবলীকে নিন্দা করার সাথে সাথে দূষিত কলুষিত সমাজকে সংস্কৃত করার জন্যই তথাগতের আবির্ভাব। 'আর্যসত্যচতুষ্টয়' এর প্রবর্তক তথাগতের মূল মন্ত্র হল অহিংসা। কারো মনে দুঃখ কষ্ট না দেওয়া হল তাঁর আদি কথা। তাই তো দেখি মা মায়াকে কোনরূপ কষ্ট না দিয়ে মায়ের পার্শ্বদেশ থেকে সমাগত হয়ে তিনি প্রথম সূর্যালোক অবলোকন করলেন।

বুদ্ধের জন্ম ছিল অলৌকিক। তিনি ছিলেন অযোনিসম্ভূত। তাঁর জন্ম ছিল অনেকটা পুরাণ প্রসিদ্ধ ঔর্ব, পৃথু, মান্ধাতা বা কক্ষীবানের জন্মের ন্যায়।

"উরোর্যথৌর্বস্য পৃথোশ্চ হস্তান্মান্ধাতুরিন্দ্র প্রতিমস্য মূর্দ্ধঃ।
কক্ষীবতশ্চৈব ভুজাংসদেশাত্তথাবিধং তস্য বভূব জন্ম।।"

(বুদ্ধচরিত – ১ / ১০)

তাঁর এই অলৌকিক ও দিব্য আগমনে পুষ্যনক্ষত্র অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিল। তিনি জগতের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হয়ে স্বীয় তেজের দ্বারা ঘোর তমিস্রাকে নিরসন করে সমগ্র জগৎকে সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল করলেন। তাঁকে রক্ষা করার জন্য লোকপালগণের আগমন ঘটল।

সাধারণতঃ শিশু জন্মকালে জন্মায় অবোধ অবস্থায়। কিন্তু যুগ যুগান্তরের ধ্যানের দ্বারা পরিপূর্ণ হৃদয় বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করেছিলেন অবোধ বা মূঢ়ভাবে নয়, সজ্ঞানে –

'কল্পেষ্বনেকেষু চ ভাবিতাত্মা যঃ সং প্রজানন্ সুষুবে ন মূঢ়ঃ।'

(বুদ্ধচরিত – ১ / ১১)

বোধিসত্ত্ব ভগবান, তাঁর জন্ম ছিল ঐশ্বরিক। তিনি ছিলেন সূর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান। দেহের স্বর্ণাভ দীপ্তিতে তাই তিনি চতুর্দিককে আলোকিত করেছিলেন। নবজাতক তথাগত বুদ্ধ ক্রমে ক্রমে বড় হতে লাগলেন। তাঁর প্রথম সাতটি পদক্ষেপ ছিল মরীচাদি সপ্তর্ষিদের মতো অত্যন্ত সমুজ্জ্বল। এর দ্বারা তিনি যে নিজে অলৌকিক মহিমার অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেদিন তিনি প্রথম কথা বলতে শিখলেন, মনে হল তিনি জন্মগ্রহণের কারণ সকলকে জানাচ্ছেন –'আমি বোধির জন্য ও জগতের হিত বা মঙ্গল কামনায় জন্মগ্রহণ করেছি। এবং এটিই আমার অন্তিম বা শেষ জন্ম।

"বোধায় জাতোহস্মি জগদ্ধিতার্থমন্ত্যা ভবোপত্তিরিয়ং মমেতি"

(বুদ্ধচরিত – ১ / ১৫)

যেহেতু জগতের হিতের জন্য তাঁর অন্তিম আবির্ভাব তাই তাঁকে স্বাগত জানানো নিত্য ঔপচারিক। প্রকৃতিমাতা তাঁর জন্য নানাভাবে গাইছে স্বাগত গীতিকা। লুম্বিনীর বনপ্রদেশে বুদ্ধের জন্মদর্শনের জন্য ধর্মের অভিলাষী দিব্য প্রাণী সকল উপস্থিত হলেন এবং তাঁরা ফু ফুটিয়ে সেই ফুলে পুষ্পবৃষ্টি করলেন। বুদ্ধের আগমনে নানা প্রকার অলৌকিক ঘটনা সংঘটি হয়েছিল। 'মহাবস্তুবদান' অনুসারে বুদ্ধের জন্মের পর আকাশে লোকহিতকর, মঙ্গলময় সুখপ্রদ, স্পৃহনীয়, পুণ্যগন্ধবিশিষ্ট শীতল ও উষ্ণ উভয় প্রকার জলধারা আকাশে উত্থি হয়েছিল। ললিতবিস্তরে ও একই কথা বর্ণিত হয়েছে। অশ্বঘোষের ভাষায় –

"খাত্ প্রস্রুতে চন্দ্রমরীচিওভ্রে দ্বে বারিধারে শিশিরোষ্ণবীর্যে।
শরীরসংস্পর্শসুখান্তরায় নিপেততুর্মূর্ধনি তস্য সৌম্যে।"

(বুদ্ধচরিত – ১ / ১৬)

রাজা তিনি – এই দিব্য বাণী প্রচারিত হল। তিনি রাজকীয় শয্যায় মহার্ঘ্য সোনা পালঙ্কে শায়িত ছিলেন, মাথার উপর ছিল সুন্দর চাঁদোয়া আর পালঙ্কের পায়াগুলি ছি অমূল্য বৈদূর্যমণি দিয়ে ঢাকা। এই দিব্য শিশুকে দেখার জন্য দেবতারা নতশির হ আকাশে শ্বেতছত্র ধারণ করেছিলেন এবং বোধির জন্য আশীর্বচন জপ করতে লাগলেন পাতাললোকবাসী মহাসর্পেরা ধর্মবিশেষের তৃষ্ণা বশতঃ তাঁকে ব্যজন করতে লাগলেন এব শুদ্ধাধিবাস দেবতারা দুঃখে জর্জরিত জগতের মঙ্গলের জন্য তথাগতের উৎপত্তির কার অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

"তথাগতোৎপাদগুণেন তুষ্টাঃ শুদ্ধাধিবাসাশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
দেবানন্দদুর্বিগতেহপি রাগে মগ্নস্য দুঃখে জগতো হিতায়।।"

(বুদ্ধচরিত – ১ / ২০)

তথাগতের জন্মকালে পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয় শ্রেষ্ঠ হিমালয়শোভিত ধরণী বায়ুতাড়িত নৌকা মতোই চঞ্চল হয়ে পড়ল এবং মেঘশূন্য আকাশ থেকে চন্দনযুক্ত নীল ও রক্তপদ্মের বৃ শুরু হল। স্পর্শসুখ মনোজ্ঞ বাতাস বইতে শুরু করল, যারা দিব্য বস্ত্র বর্ষণ করছি দিবাকর অধিকতর দীপ্ত হলেন, ইন্ধন ছাড়াই শান্ত শিখাযুক্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হলেন। বাল বুদ্ধের দর্শনের অভিলাষে ধর্মশাস্ত্রে অভিলাষী প্রাণী ও দেবগণের দ্বারা লুম্বিনী উদ্যান পরিপূ হল। কৌতুহলে বৃক্ষসমূহ সুগন্ধিপুষ্পদ্বারা তাঁর পূজা করলেন। অনিষ্টকারী প্রাণীরা হিংসাশূ হল, কারো পীড়া উৎপাদন করল না। বিনা চেষ্টাতেই সকলের রোগমুক্তি ঘটল।

"ভূতৈরসৌম্যৈঃ পরিহীনহিংসৈর্নাকারি পীডা স্বগণে পরে বা।
লোকে হি সর্বাশ্চ বিনা প্রয়াসং রুজো নরাণাং শময়াম্বভূবুঃ।।"

(বুদ্ধচরিত – ১ / ২৫)

ধর্মতৃষ্ণা নিবৃত্তির জন্যই তথাগতের জন্ম। তাই তাঁর অলৌকিক প্রভাববশতঃ রাজপ্রাসাদের বুদ্ধবাসস্থানের পূর্বোত্তর দিকে বিনা খননেই একটি দিব্যকূপের আবির্ভাব হল, যার সুনির্মল বারিকে প্রাসাদবাসী তীর্থের জল বলে মনে করল এবং তাতে স্নানাদি কার্য সম্পন্ন করল। মৃগপক্ষিরা কলনাদ করল। শান্ত জল নিয়ে নদী প্রবাহিত ছিল। মেঘমুক্ত সুনির্মল আকাশে নিনাদিত হল দেবদুন্দুভি।

লোককল্যাণের জন্য তথাগতের আবির্ভাবে জগৎবাসী সকলে শান্তিলাভ করল। একমাত্র মার-ই খুশি হতে পারল না। এতাদৃশ দিব্য ও অদ্ভুত জন্ম দেখে ধীর হলেও রাজা শুদ্ধোদন বিচলিত হলেন। স্নেহবশতঃ রাজার নয়নযুগল থেকে ঝরে পড়ল ভয় ও আনন্দসঞ্জাত দুটি অশ্রুধারা।

বুদ্ধচরিত কাব্যটি তত্ত্বকাব্য রূপে পরিচিত। কিন্তু অশ্বঘোষ প্রথমে বাল্মীকির উত্তরসূরী স্বভাবকবি, পরে তাত্ত্বিক। বস্তুর রূপময় বিশ্লেষণই যে কবিতৃশক্তির আদ্য নিদর্শন তা ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবকালীন বর্ণনাচাতুর্যের মাধ্যমে কবি অশ্বঘোষ বুঝিয়ে দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১। বুদ্ধচরিতম্ (১ম সর্গ) – সম্পা ড.জয়শ্রী চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০৭।
২। সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার – (নবম ও একাদশ খণ্ড) – নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮০ ও ১৯৮১।
৩। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস – ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ২০০০।
৪। মনুসংহিতা (৭ম অধ্যায়) – সম্পা শ্রী বঙ্কিমচন্দ্র প্রধান, কলকাতা, ২০১০।
৫। A History of Sanskrit Literature – A.B Keith, Delhi, 2007.

....

রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধ প্রভাব

ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যে 'বৌদ্ধ প্রভাব' না বলে কেন 'বুদ্ধ প্রভাব' শব্দবন্ধটিকে গ্রহণ করা হল, তা… কিছু যুক্তি আছে। সেই যুক্তি দিয়েই প্রবন্ধের মধ্যে প্রবেশ করা যাক। বৌদ্ধ অর্থে বু… সম্বন্ধীয়। এবং সেই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনকেই বৌদ্ধ আখ্যায় বিশেষি… করা যায়। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বুদ্ধের নিজস্ব ধর্মদেশনা, উপদেশ… কথোপকথন সমূহ তাঁর মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত প্রথম মহাসঙ্গীতি… শ্রুতিনির্ভর আলোচনান্তে সংকলিত হয়েছিল; পরবর্তীকালের একাধিক মহাসঙ্গীতিতে ধর্মত… ও দর্শনবিষয়ক নানা নূতন ব্যাখ্যা ও চিন্তন-উপাদান যুক্ত হয়ে একাধিক মতাদর্শের উদ্ভ… হয়। এগুলিতে সর্বত্রই যে বুদ্ধের মৌলিক স্বচ্ছ ও যুক্তিসিদ্ধ ভাব ও ভাবনা অবিকৃতভা… ক্ষিত হয়েছিল, এমন নয়। কালক্রমে সনাতন হিন্দু সমাজের পৌত্তলিকতাপূ… পূজার্চনানির্ভর আচারসর্বস্বতা, তন্ত্র মন্ত্র গুহ্য সাধনা ইত্যাদির প্রকার ও প্রকরণ বুদ্ধ নির্দেশি… জীবন দর্শনকে অনেকাংশে আচ্ছন্ন করে দিতে লাগল এবং একাধিক মিশ্র, জটিল দুরধিগ… ভাবধারার বিকাশ ঘটলো।

এই সব দিকে নিয়ে বৌদ্ধ নামক বিশেষণটি যে বিশেষ্যের গুণ ও ধর্ম বহন ক… চলেছে, সেই বিশেষ্য (বুদ্ধ)টির সঙ্গে তার যোগসূত্রগুলি বর্তমানে আনুবীক্ষণিক। রবীন্দ্রনা… যে যে সূত্র বা উৎস থেকে বুদ্ধ জীবনের ও তাঁর ধর্মদেশনার পাঠ নিয়েছিলেন, তার মধ্যে… সম্ভবত বুদ্ধত্বের উপাদানগুলিই সমধিক ছিল, বৌদ্ধত্বের নয়। বর্তমান কালের বৌ… শাস্ত্রকারগণ এ বিষয়ে তর্ক উত্থাপন করতেই পারেন, তবে সংস্কারমুক্ত হয়ে বুদ্ধে… তথাকথিত নিরীশ্বরবাদ (atheism), ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism in the true sense o… the term) এবং মানব প্রেম সর্বস্বতাকে (philanthropy) পর্যালোচনা করলেই এ… পার্থক্যের যথার্থরূপ স্পষ্ট হবে। বর্তমান নিবন্ধের শিরোনামে এই কারণেই 'বুদ্ধ-প্রভাব… শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, বৌদ্ধ-প্রভাব নয়।

গৌতমবুদ্ধের উপলব্ধি ও ধর্মদেশনার মূল স্তম্ভগুলির দিকে মনোনিবেশ করলে… আপাতদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের সঙ্গে যেগুলিতে পার্থক্য অনুমিত হয় সেগুলি হ… (১) বুদ্ধের দুঃখবাদ ও জন্মান্তরবাদ (২) নিরীশ্বরবাদ। গৌতমের তপস্যালব্ধ বোধিজ্ঞানে… প্রথম আর্যসত্যটি হলো জগৎ ও মানবজীবন দুঃখময়। রবীন্দ্রনাথ দুঃখবাদী ছিলেন অথ… সুখবাদী বা আনন্দবাদী বা দুর্জ্ঞেয়বাদী ছিলেন, সে সব বিষয়ে অনুপুঙ্খ রাবীন্দ্রি… আলোচনার অভাব নেই, কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায়, দুঃখ থেকেই মহৎ সৃষ্টি জন্ম নে… কিন্তু সেই সৃষ্টি দুঃখকে অতিক্রম করে এক অসীম আনন্দলোকের দিগন্ত উন্মোচিত কর…

রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত এই মতকে সমর্থন করতেন। তিনি বারবার উপনিষদের একটি শ্লোকের প্রতি তাঁর অনুরাগ ব্যক্ত করেছেন, 'আনন্দাদ্ধেব খল্বিমনি ভূতানি জায়ন্তে' .... ইত্যাদি।

জন্মান্তরবাদ বুদ্ধের সাধন উপলব্ধির অন্যতম সোপান। অঙ্গুত্তরানিকায়ের অন্তর্ভুক্ত জাতকের গল্পে 'অতীতবস্তু' নামক কাহিনি অংশে বুদ্ধের অতীত জন্মের নানা কাহিনি বিবৃত হয়েছে। এগুলি জন্মান্তরের স্পষ্ট ইঙ্গিতবহ। তবে হিন্দু জন্মান্তরবাদের সঙ্গে এর সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। এখানে বলা হয় এক জীবনের অতৃপ্ত বাসনা কামনার শিখা পরবর্তী জন্মের জাতকে সঞ্চারিত হয়। এইভাবে বাসনার শিক্ষা জন্ম থেকে জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে চলে। এই শিখাকে নির্বাপিত করতে পারলে আর পুনর্জন্ম হয় না। একেই বলে নির্বাণ।

রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনে এর কোন সজ্ঞান উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় না। নিরীশ্বরবাদ প্রসঙ্গে, গৌতমবুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা দেবদেবীদের আরাধনা বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন ও নিরুত্তর ছিলেন। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদের পূজার্চনা, যজ্ঞ ইত্যাদি আচার অনুষ্ঠানকে তিনি নির্মম বিদ্রূপে নস্যাৎ করেছেন। [দ্রঃ দশব্রাহ্মণজাতক এবং অন্যান্য] এবং শ্রেণিবর্ণনির্বিশেষে সকল মানুষের স্বনির্ভর সাধনায় মৈত্রী, করুণা, সংযম ও শুদ্ধাচারের চর্চার কথা বলেছেন। এই নিরীশ্বরবাদ নাস্তিক্যবাদের সমার্থক কিনা বা গৌতম নাস্তিক্যবাদী ছিলেন কিনা, বৌদ্ধ দার্শনিকদের কাছে হয়ত এর উত্তর আছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু একাধিকবার বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদ বা শূন্যবাদকে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ করেছেন। উক্তি দিয়ে এ প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করার প্রয়োজন নেই কারণ সেটা আমাদের প্রবন্ধের মূল উপজীব্য বিষয়ের বাইরে। তবে তিনি জীবনের কোন পর্বে বা সাহিত্যের কোন সৃষ্টিতে নিরীশ্বরবাদের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেননি। তাঁর জীবনদেবতা যিনিই হোন, তিনি এক পরম প্রেমময় ঐশ্বরিক সত্ত্বা।

এই তিনটি বিতর্কিত বিষয় বাদ দিয়ে, গৌতমবুদ্ধের মুখ নিঃসৃত যে ধর্মদেশনা একাধারে ভিক্ষু ও গৃহপতি (house holder) শ্রাবকদের সমাজনৈতিক চরিত্র্যগঠনে ও মানোন্নয়নে প্রাসঙ্গিক ভূমিকা নিয়েছিল সেইগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে নানা উপলক্ষে নানা রচনায়। সেগুলির বিশ্লেষণধর্মী উল্লেখ এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

'কথা ও কাহিনী' কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতা, যা বঙ্গভাষী শিশুরা বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে পাঠ্য হিসাবে অধ্যয়ন করে সেগুলির উল্লেখ করা যাক। 'নগরলক্ষ্মী' কবিতায় বর্ণিত হয়েছে, শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষের সময় বুদ্ধ তাঁর গৃহী ভক্তদের কাছে আবেদন করলেন, 'ক্ষুধিতেরে অন্নদান সেবা, তোমরা লইবে বল কেবা?' তখন অনেকেই নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করলেন, তখন সেই নীরব সভাঘরে 'ব্যথিত রজনী পরে বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি সন্ধ্যা তারাসম রহে ফুটি'। চিত্রকল্প ও উপমাটি লক্ষণীয়, যাতে বুদ্ধের

করুণাকাতর মূর্তিটি স্পষ্ট হয়েছে।

'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' কবিতায়, বুদ্ধ তাঁর এক ভক্ত শিষ্যকে জনপদে পাঠালেন, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা আনয়ন করবার জন্য। অনেকেই নিজেদের সামর্থ্যমত মূল্যবান ভিক্ষা দান করতে এলেন। শিষ্য সকলের ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করলেন, শেষে এক ভিখারিণী তার একমাত্র বস্ত্র ভিক্ষুকে দান করলেন। সেই বসনটি নিয়ে শিষ্য উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকে বললেন, 'মাতঃ, মহাভিক্ষুকের পুরাইলে সাধ পলকে।' এবং সেই বস্ত্র খণ্ড নিয়ে তিনি বুদ্ধ সমীপে গমন করলেন, সেটিকে, 'সঁপিতে বুদ্ধের চরণ নখর আলোকে'। এই অতি কথনটিতে বুদ্ধের প্রতি কবির বিনম্র শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে।

বহু পঠিত 'পূজারিণী' কবিতায় বুদ্ধ উপাসনার উপলক্ষ্যে নগরনটী শ্রীমতীর আত্মত্যাগের মর্মস্পর্শী বিবরণ রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। এই কাহিনিকে বিস্তারিত করেছেন 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যে। রাজগৃহের মহারাজ বিম্বিসার বুদ্ধের ভক্ত, বুদ্ধ বাস করেছেন রাজধানীর সংলগ্ন গৃধ্রকূট পর্বতে। রাজগৃহের উপবনে বুদ্ধের উপাসনার জন্য এক উপাসনাস্থল আছে। রাজপুত্র অজাতশত্রু বুদ্ধ বিদ্বেষী। রাজপদে অভিষিক্ত হয়েই ঘোষণা করলেন, বুদ্ধের উপাসনা যে করবে তার প্রাণদণ্ড হবে। শ্রীমতী ছিলেন বুদ্ধের ভক্ত, রাজার নিষেধ অগ্রাহ্য করে সে বুদ্ধ উপাসনার আয়োজন করলে যখন, রাজার সৈন্য এসে তাকে উপাসনাস্থলে হত্যা করল। মহৎ আদর্শে আত্মত্যাগের এই ঘটনায় অজাতশত্রুর মানসিক পরিবর্তন ঘটলো, তিনি বুদ্ধের শরণাপন্ন হলেন, তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। এই কাহিনি রবীন্দ্রনাথকে এই দুইটি মহৎ কাব্যসৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

'নটীর পূজা' নাটকে কয়েকটি সঙ্গীত গ্রথিত হয়েছে, এদের ভাষা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ভাবের গভীরতায় ও অর্থবিস্তারে বুদ্ধের প্রতি তাঁর বিনম্র শ্রদ্ধার প্রকাশ ঘটেছে। কেবল তাই নয়, সর্বকালের সর্বদেশের মানুষের ভোগলিপ্সা, হিংসা, স্বার্থ-সংঘাত, দুঃখভোগ, জীবনযন্ত্রণার পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধের উপলব্ধি ও ধর্মদেশনার নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন এই সঙ্গীতগুলির পরম সম্পদ।

ভিক্ষুদের গান, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব' – একটি অতিবিখ্যাত কবিতা যার ছত্রে ছত্রে উপরিউক্ত বক্তব্যের সাক্ষ্য মেলে। ভাবগম্ভীর এরূপ কয়েকটি পংক্তির উল্লেখ করলে আমাদের স্মৃতি উজ্জীবিত হবে –

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।
.....ক্রন্দনময় নিখিল হৃদয় তাপ দহন দীপ্ত,
বিষয়-বিষ-বিকার জীর্ণ খিন্ন অপরিতৃপ্ত,

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি ...

এই পংক্তিগুলির প্রতিটি শব্দবন্ধে কী নিপুণভাবে সর্বমানবের জীবনযন্ত্রণার বর্ণনা করলেন রবীন্দ্রনাথ। বার বার সুরের মায়ায় মগ্ন হয়ে আমরা অনেক সময় এর ভাবসম্পদকে আস্বাদন করতে মনস্ক হই না। [এ ঘটনা বহু রবীন্দ্র সঙ্গীতের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য] এর সঙ্গে সঙ্গে কী প্রার্থনা করলেন তিনি বুদ্ধের কাছে –

কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আনো অমৃতবাণী
বিকশিত করো প্রেমপদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ।
শান্ত হে মুক্ত হে হে অনন্তপুণ্য
করুণাঘন, ধরণীতল কর কলঙ্কশূন্য;
... তব মঙ্গলশঙ্খ আনো তব দক্ষিণপাণি...
এসো দানবীর, দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা,
মহাভিক্ষু, লহো সবার অহঙ্কার ভিক্ষা।

ভিক্ষুদের অন্য একটি গানে, জগতের বাস্তবতা ব্যক্ত হলো, -

মোহ মলিন অতি দুর্দিন শঙ্কিত চিত্ত পান্থ,
জটিল গহন পথসংকট সংশয় উদ্‌ভ্রান্ত,

এবং বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা,

সকল কলুষতামস হর জয় হোক তব জয়
অমৃতবারি সিঞ্চন করো নিখিল ভুবনময়
মহাশক্তি মহাক্ষেম।।..
করুণাময়, মাগি শরণ;

শ্রীমতীর গানে অনুরূপ আত্মনিবেদন ব্যক্ত হলো –

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ।
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা।

'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের প্রাথমিক ঘটনাটি হল, চণ্ডালকন্যা প্রকৃতির কাছে তৃষ্ণার্ত বুদ্ধ শিষ্য আনন্দ পানীয় জল চেয়েছিলেন। প্রকৃতি অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে জানালো, সে অস্পৃশ্য, অস্পৃশ্য। তখন আনন্দ যা বললেন, তা বুদ্ধের শিক্ষারই অনুরণন : 'হে কন্যা, যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ। যে জল তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃষিতকে তৃপ্ত করে সেই জল তীর্থবারি।' প্রকৃতি ক্রমশঃ এই ভাবনায় নিজেকে পরিণত করে তুললো, গানের ভাষায় সে বললে,

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে দয়া করে দাও ভুলিতে।

শ্রেণিবর্ণ নির্বিশেষে সর্বমানবের জন্য এই প্রেম, এই সহানুভূতি, এই করুণা, বুদ্ধের ধর্মদেশনার অন্যতম উপাদান। রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শে আপ্লুত ছিলেন। বৃহত্তর ভারত পরিভ্রমণকালে 'বোরোবুদুর' শীর্ষক কবিতায় জাগতিক ক্রোধ, লোভ, হিংসা অনাচার দুঃখ শোকের পটভূমিতে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' এই মহামন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি করেছেন তিনি। কবিতাটির অংশবিশেষ উল্লেখ করা যায় –

চিত্ত আজি শান্তিহীন লোভের বিকারে
হৃদয় নীরস অহংকারে,
ক্ষিপ্রগতি বাসনার তাড়নায় তৃপ্তিহীন ত্বরা
কম্পমান ধরা ....
অন্তহারা সঞ্চয়ের আহুতি মাগিয়া
সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
.... পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন
.... তাহারে আসিতে হবে যে তীর্থদ্বারে
শুনিবারে ...... যে বাণী রয়েছে চিরস্থির ....
অমেয় প্রেমের মন্ত্র, বুদ্ধের শরণ লইলাম।

এই উদ্ধৃতির প্রথম ৭টি পংক্তিই মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা, দুর্দশা, মোহাচ্ছন্নতা, বাসনা ও ভোগলালসার বর্ণনায় সম্পৃক্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতেই বুদ্ধের বাণী ও উপদেশাবলী প্রাসঙ্গিকতা। সেই কারণেই মানুষের আকুতি – 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

অনুরূপভাবে শ্যামদেশ ভ্রমণের সময় লিখিত 'সিয়াম' কবিতায় 'ত্রিশরণ মহামন্ত্র' (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি) কিভাবে সেই দেশের অধিবাসীদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার উল্লেখ করেছেন কবি। অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হলো –

ত্রিশরণ মহামন্ত্র .... বহুশাখা প্রসারিত কল্যাণে করেছে ছায়াদান,
কত শত শতাব্দীর সংসার যাত্রারে, শুভ আকর্ষণে বাঁধি ....
চরম মুক্তির সাধনাতে
সর্ব জনগণে এক করি .... এক ধর্ম, এক সংঘ,
এক মহাগুরুর শক্তিতে। ......
ভগবান বুদ্ধ হেথা সমাসীন .... চিরদিন ....

মৌন যার শাণিত অন্তহারা
বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।

'পরিশেষ' গ্রন্থে 'বুদ্ধদেবের প্রতি' কবিতায় দুঃখ, শোক, ব্যথা, মোহাচ্ছন্নতা থেকে মুক্তির জন্য বুদ্ধের নিকট কবির ঐকান্তিক প্রার্থনা ব্যক্ত হয়েছে।

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ তুমি অমিতায়ু
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক ... মুক্ত হোক মোহ আবরণ।

এই প্রার্থনায়, বোধিদ্রুমতলে তব মহাজাগরণ অর্থে, বুদ্ধের মূল ধর্মদেশনায় যে চারিটি আর্যসত্যের কথা ব্যক্ত হয়েছিল, সেগুলির প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর পরিচয় ও ভাবসম্মিলন প্রকাশ পেয়েছে।

'পরিশেষ' গ্রন্থের 'প্রার্থনা' শীর্ষক কবিতাটি বিশ্লেষণ করলে উপরিউক্ত ভাবসম্মিলনের স্বরূপ অনুধাবন করা যাবে। আলোচনা দীর্ঘ হলেও কবিতাটির অংশবিশেষ উদ্ধার করা দরকার। কারণ এই কবিতা সম্ভবত রবীন্দ্রসাহিত্যের অনেক পাঠকের কাছেই স্বল্প পরিচিত। এই কবিতায় রেখিত শব্দগুচ্ছগুলি একাধারে সর্বকালের মানুষের হিংসা, দ্বেষ, কামনা, আত্মম্ভরিতা ভোগলিপ্সার কথা বলেছে এবং সে সবের প্রেক্ষিতে বুদ্ধের গভীর উপলব্ধি ও করুণার প্রকাশকেও কবি বিনম্র শ্রদ্ধায় ব্যক্ত করেছেন।

কামনায় কামনায় দেশে দেশে যুগে যুগান্তরে
নিরন্তর নিদারুণ দ্বন্দ্ব যবে দেখি ঘরে ঘরে
প্রহরে প্রহরে, দেখি অন্ধ মোহ দুরন্ত প্রয়াসে
বুভুক্ষার বহ্নি দিয়ে ভস্মীভূত করে অনায়াসে
.... সকল প্রত্যাশা, জীবনের সকল সম্বল ....
নিঃসংকোচ গর্বে বলে আত্মতৃপ্তি ধর্ম হতে বড়ো,
..... দেখি আত্মম্ভরী প্রাণ
তুচ্ছ করিবারে পারে মানুষের গভীর সম্মান
গৌরবের মৃগতৃষ্ণিকায় ......
আত্মজাতি – মাংসলুব্ধ মানুষের প্রাণনিকেতন
উন্মীলিছে নখে দন্তে হিংস্র বিভীষিকা

হেনকালে জ্বলি উঠে .... চিত্তে তার দিব্যমূর্তি
সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা বন্দিশালা হতে। ....
যারা ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, বোসো তাহাদের দুর্গদ্বারে,
তপের আসন পাতি; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।

এই কবিতার প্রথম ১২ পংক্তিতে মানুষের ও সমাজের অনাচার, অত্যাচার, হিংস্রতা, কামনা-বাসনার প্রাবল্য, অহমিকা ইত্যাদির ফলে জীবনের দুঃখ ও যন্ত্রণার কথা বল[া] হয়েছে। শেষ ১০ পংক্তিতে বুদ্ধের মহত্ত্ব, মনবপ্রেম, তপস্যার বিষয়ে কবির সশ্রদ্ধ মিনতি [ও] নিবেদন ব্যক্ত হয়েছে।

সবশেষে প্রবন্ধের কথায় আসা যাক। অনেক প্রবন্ধেই স্বল্প অবসারে ২/[১] পংক্তিতে বুদ্ধের প্রসঙ্গে এসেছে, এইভাবেই, তাঁর মানবপ্রেম, মৈত্রী, ও করুণার বাণী[র] উল্লেখ করেছেন কবি এবং বিশ্বমানবের পটভূমিকায় বুদ্ধের ধর্মদেশনার প্রভাব আলোচ[না] করেছেন যুক্তিবিদ্ধ ভাষায় ও রীতিতে।

'শান্তিনিকেতন' শীর্ষক প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন দিনে প্রাতঃকালীন উপাসনায় পঠি[ত] হয়েছে। অনেকগুলি প্রবন্ধেই বুদ্ধের উপদেশ-বাণীর উল্লেখ আছে। একটিতে সুবিস্তৃতভা[বে] বুদ্ধের ধর্মদেশনার মূল বিষয়গুলি পালিভাষা থেকে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। পুনরু[ক্তি] না করে সেগুলি উল্লেখ করা হচ্ছে, এতে কোন কোন বিষয়ের উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জো[র] দিয়েছেন, তা স্পষ্ট হবে –

'বুদ্ধ বলেছেন, শীলগ্রহণ করাই মুক্তির পথ। শীলের দ্বারা চরিত্র গড়ে ওঠে[।] প্রাণীকে হত্যা করবে না, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি তা নেবে না, মিথ্যা কথা বলবে ন[া,] মদ্যপান করবে না, অবৈধ যৌনসংসর্গ করবে না – এগুলি শীল।

আর্যশ্রাবকেরা প্রতিদিন নিজেদের এই শীলকে স্মরণ করেন। এইগুলিই হল মঙ্গল[।] বুদ্ধদেব কাকে মঙ্গল বলেছেন, তা মঙ্গলসুত্তে কথিত হয়েছে।

বুদ্ধ বললেন, অসতের সেবা না করা, সজ্জনের সেবা করা, পূজনীয়কে পূজা কর[া]

– এগুলি মঙ্গলকর্ম।

যে দেশে ধর্মসাধন বাধা পায় না সেই দেশে বাস, পূর্বকৃত পুণ্যকে বর্ধিত করা, আপনার সৎকর্মে প্রণিধান করা, এই উত্তম মঙ্গল।

বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন, বহু শিল্পশিক্ষা, বিনয়ে সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উত্তম মঙ্গল।

মাতা পিতাকে পূজা করা, স্ত্রী পুত্রের কল্যাণ করা, অনাকুল কর্ম করা, এই উত্তম মঙ্গল। দান, ধর্মচর্যা, জ্ঞাতিবর্গের উপকার, অনিন্দ্যনীয় কর্ম – এই উত্তম মঙ্গল।

পাপে অনাসক্তি এবং বিরতি, মদ্যপানে বিতৃষ্ণা ধর্মকর্মে অপ্রমাদ – এই উত্তম মঙ্গল।

ক্ষমা, প্রিয়বাদিতা, সাধুগণকে দর্শন, যথাকালে ধর্মালোচনা, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য, শ্রেষ্ঠ সত্যকে জানা, মুক্তিলাভের উপযুক্ত সৎকর্ম – এই উত্তম মঙ্গল।'

বুদ্ধের মৈত্রীভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃতি সহযোগে ব্যাখ্যা করেছেন। যখন বুদ্ধ বলছেন, সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসক হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক, সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। বলছেন, পরস্পরকে বঞ্চনা কোরো না, কাউকে অবজ্ঞা কোরো না, কায়মনোবাক্যে ক্রোধ করে অন্যের দুঃখ ইচ্ছা কোরো না।

> 'মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সর্বভূতে সকল প্রাণীতে সেইপ্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে।'

এই শেষোক্ত শ্লোকটি মৈত্রী ভাবনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহু রচনায় বহুবার ব্যবহার করেছেন। আরও একটি বাণী তাঁর খুব প্রিয় ছিল, অত্তদীপো ভব। তিনি অনুবাদ করেছেন, আপনাকে দীপ করি জ্বালো।

গৌতম বুদ্ধের মত একজন কালদর্শী মানবপ্রেমিক মহাপুরুষের চরিত্রশক্তি ও বাকবৈদগ্ধ্য সহজেই জ্ঞানী মানুষদের সশ্রদ্ধ অনুরাগ জাগ্রত করে। সাধারণ শ্রোতা ও গৃহীভক্তগণ, যাঁরা বুদ্ধের সমীপে আগমন করে তাঁর কথোপকথন ও বাণী শ্রবণ করতেন, সেই সব শ্রাবকদের মধ্যে আসীন হয়েই যেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর মূল্যায়ন করেছেন। 'প্রার্থনা' কবিতার শেষ কয়টি পংক্তি আরও একবার স্মরণ করি –

সেই এক রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার

বর্তমান কাল হতে নিক্রমিলা নিত্যকাল মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা বন্দিশালা হতে।

এ শুধু প্রশস্তি নয়, এর মধ্যে বুদ্ধজীবনের পরম সত্যটি বিধৃত আছে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যে উপনীত হতে আমাদের আহ্বান করেছেন।

পরিশেষে, 'চারিত্রপূজা' গ্রন্থের 'বুদ্ধদেব' প্রবন্ধটি পাঠককে পাঠ ও স্মরণ করতে অনুরোধ করি। এই প্রবন্ধের কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করলে সমগ্র প্রবন্ধটি পাঠ করার আগ্রহ জাগবে।

> "আমি তাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি। ......
> বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে, অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্মের নামে আজ রক্তে পঙ্কিল করে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসার চেয়ে সাংঘাতিক পরস্পর ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত। সর্বজীবে মৈত্রীকে যিনি মুক্তির পথ বলে ঘোষণা করেছিলেন, সেই তাঁরই বাণীকে আজ উৎকণ্ঠিত হয়ে কামনা করি এই ভ্রাতৃবিদ্বেষ কলুষিত হতভাগ্য দেশে। .... "

পাশবতার সাহায্যে মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন 'অক্রোধেন জিনে কোধং' আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।

"..... আজ স্বার্থক্ষুধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম রুদ্ধতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।"

....

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রকাশ : একটি আলোচনা

অনুপ বিশ্বাস

৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, কলকাতা। শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমায় এক অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন – "আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। ... তাঁরই শরণ নেব যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন।" অন্তরের বিনম্র চিত্তপ্রকাশ থেকেই এই মহামানবের ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ আপন সাহিত্য-সৃজনে লালন করবেন, তা ব্যক্ত হয়ে পড়ে। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রকাশ আলোচনা করার পূর্বে রবীন্দ্রপূর্ব সাহিত্যিকদের বুদ্ধ চর্চার বিষয়ে একটু আলোকপাত করা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪ – ১৯২২) তাঁর 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৭ খ্রিঃ) ও 'অশোক' (১৯১১) নাটকে বুদ্ধদেবকে অবলম্বন করেন। নবীনচন্দ্র সেনের (১৮৪৭ – ১৯০৯) 'অমিতাভ' কাব্যে বুদ্ধদেব অবতাররূপে বিরাজমান। রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮ – ১৯০৯) তাঁর 'The Civilization of India' (1900) গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন – 'The main doctrines of Buddhism are old Hindu doctrines adapted to a new system – old wine in new bottles'. ঠিক একই রকম মত পোষণ করতেন বিবেকানন্দ। বৌদ্ধধর্মকে তিনি হিন্দুধর্মের একটি সম্প্রদায় বলে মনে করতেন।

বলা যায় যে বাঙালিদের মধ্যে বৌদ্ধসংস্কৃতির আলোচনায় পথিকৃৎ হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২ – ৯১)। তাঁর 'An Introduction to the Lalit Bistar', 'ললিত বিস্তার : (১৮৭৭), 'বুদ্ধগয়া' (১৮৭৮), 'দি হারমিটেজ অব্ শাক্যমুনি' (১১৭) এবং 'The Sanskrit Buddhist Literature' (১৮৮২) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি বৌদ্ধ সংস্কৃতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বুদ্ধদেবকে তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯) গ্রন্থে জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন – "যখন বৈদিক ধর্ম সঞ্জাত বৈষম্য ভারতবর্ষে পীড়িত, তখন ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের উদ্ধার করিয়াছেন। পৃথিবীতে যত প্রকার সামাজিক বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে, ভারতবর্ষের পূর্ব্বকালিক বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখনো কোনো সমাজে প্রচলিত হয় নাই।"(সাম্য)। বৌদ্ধ মাহাত্ম্য নিয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন – অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০ – ৮৬) – 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (২য় ভাগ, ১৮৮৩) বিশেষ উল্লেখের দাবি বহন করে।

পূর্বসূরিদের পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধচর্চায় এসেছেন এমন কথা বলা যায় না। তবে বিশেষভাবে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বলাই যায়। রবীন্দ্রনাথের যখন ৩০ বছর

বয়স তখন কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মহাবোধি সোসাইটি (১৮৯১), 'বুদ্ধিস্ট টেক্সট সোসাইটি' (১৮৯২) ও 'বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভা' (১৮৯২)। পারিবারিক পরিবেশেও তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চার স্পর্শ পান। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৪০ – ১৯২৬) 'আর্যধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পরের ঘাত প্রতিঘাত ও সংঘাত' (১৮৯৯) ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম্ম' (১৯০১) তাঁকে পারিবারিক পরিমণ্ডলে কৌতূহলী করে ও সমৃদ্ধ করে তোলে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবে রবীন্দ্রনাথ ব্যাপকভাবে প্রভাবিত 'জীবনস্মৃতি'র পৃষ্ঠায় তা প্রকটিত – "রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বিবিধার্থ সংগ্রহ বলিয়া একটি ছবিওয়ালা মাসিক পত্র বাহির করিতেন। তাহারই বাঁধানো একভাগ সেজদার আলমারির মধ্যে ছিল। সেটি আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বারবার করিয়া সেই বইখানা পড়িবার খুশি আজও আমার মনে পড়ে।" (জীবনস্মৃতি)।

গৌতমবুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানে রবীন্দ্রনাথ বারবার ভ্রমণ করেছেন। তেমনি ১৯৩৭ সালে শান্তিনিকেতন বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষাদানে তিনি স্থাপন করেন 'চীনভবন'। সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম সংস্কৃতি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল যা তাঁর কাব্য, কবিতা ও নাটকে ছাপ ফেলেছে বারেবারে। 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা'য় তিনি বলেছেন – "এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনী এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল।" সুতরাং রবীন্দ্রসাহিত্যে বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকতর।

রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধসংস্কৃতি

নাম	রচনাকাল	কাহিনি উৎস	মূল গ্রন্থ
মালিনী	১৮৯৬	মালিন্যাবস্তু অবদান	মহাবস্তু অবদান
রাজা	১৯১০	কুশ জাতক	মহাবস্তু অবদান
অচলায়তন	১৯১২	চূড়াপক্ষাবদান	দিব্যাবদান
গুরু	১৯১৮	চূড়াপক্ষাবদান	দিব্যাবদান.
অরূপরতন	১৯২০	কুশজাতক	মহাবস্তু অবদান
নটীর পূজা	১৯২৬	কুশজাতক	অবদান শতক
শ্যামা	১৯৩৯	জাতক	মহাবস্তু অবদান
চণ্ডালিকা	১৯৩৩	শার্দূলকর্ণাবদান	দিব্যাবদান
নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা	১৯৩৮	শার্দূলকর্ণাবদান	দিব্যাবদান
শাপমোচন	১৯৩৯	কুশজাতক	মহাবস্তু অবদান

রবীন্দ্রকবিতায় বৌদ্ধসংস্কৃতি

কবিতা	কাব্য	রচনাকাল	বৌদ্ধ আখ্যান
শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা	কথা	১৩০৪	অবদান শতক
মস্তক বিক্রয়	কথা	১৩০৪	মহাবস্তু অবদান
পূজারিণী	কথা	১৩০৬	অবদান শতক
অভিসার	কথা	১৩০৬	বোধিসত্ত্বাবদান
পরিশোধ	কথা	১৩০৬	মহাবস্তু অবদান
সামান্য ক্ষতি	কথা	১৩০৬	দিব্যাবদান
মূল্যপ্রাপ্তি	কথা	১৩০৬	অবদান শতক
নগরলক্ষ্মী	কথা	১৩০৬	কল্পদ্রুমাবদান

আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা মূলত রবীন্দ্র নাটক ও আখ্যানমূলক কাহিনি কবিতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং দেখা যায় যে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বা ধর্ম নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক 'মালিনী' স্বপ্নে পাওয়া কাহিনিসূত্রের সাথে তিনি জুড়ে দিলেন মহাবস্তু অবদানের আখ্যান। মালিনীর আত্মঘোষণার মধ্যদিয়েই ধ্বনিত হয়েছে গৌতম বুদ্ধের গৃহত্যাগের ছায়া –

"আসিয়াছি আজ
প্রথমে শিখাও মোরে কী করিব কাজ
তোমারে। জন্ম লভিয়াছি রাজকুলে,
রাজকন্যা আমি – কখনো গবাক্ষ খুলে
চাহিনি বাহিরে, দেখি নাই এ সংসার
বৃহৎ বিপুল – কোথায় কী ব্যথা তার –
জানি না তো কিছু। শুনিয়াছি দুঃখময়
বসুন্ধরা, সে দুঃখের লব পরিচয়
তোমাদের সাথে।"

মালিনী চরিত্রের মধ্যদিয়েই বুদ্ধের আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে এবং 'ক্ষম ক্ষেমংকরে' এর মধ্যদিয়ে ক্ষমাসুন্দর বাণীময় সংলাপে ধরে পড়েছে বুদ্ধের আদর্শ। ব্রাহ্মণ্যবাদের আঘাত করার পাশাপাশি বৌদ্ধধর্মের জয়গান গেয়েছেন কবি এখানে।

'অচলায়তন' নাটকে পঞ্চক মানবাত্মার প্রতীক। 'জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক' – এই বাণীই অর্থাৎ প্রথা বিরোধিতার পথ দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার 'নটীর পূজা' নাটকে –

"বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি
ধম্মং সরণং গচ্ছামি
সংঘং সরণং গচ্ছামি

নটীর শ্রীমতীর আত্মোৎসর্গের মধ্যদিয়ে বৌদ্ধ ধর্মের ত্যাগের আদর্শ উচ্চারিত হয়েছে 'চণ্ডালিকা' ও 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'র মধ্যদিয়ে কবি সুন্দরভাবে বৌদ্ধসংস্কৃতির বিকা ঘটিয়েছেন। সেখানে জাতিভেদ বিরোধী বক্তব্য প্রকাশের জন্য রচিত। হিন্দুসমাজে জাতপাতের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী এক সুরকে রবীন্দ্রনাথ ধ্বনিত করে তুলেছেন 'চণ্ডালিক নাটকের মধ্যে। নাটকের শেষে সাহসোচিত সাম্যের বাণী –

"বুদ্ধো সুসুদ্ধো করুণা মহাণ্ণবো,
যোচ্চ সুদ্ধব্বর এতানলোচনো।
লোকসস পাপুপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধং অহমাদরেণ তং।।

'শ্যামা' নাটকে বিচলিত বজ্রসেনের সংলাপ –

"জানিগো তুমি ক্ষমিবে তারে
যে অভাগিনী পাপের তরে
চরণে তব বিনতা।
ক্ষমিবে না, ক্ষমিবে না
আমার ক্ষমাহীনতা
পাপীজন শরণ প্রভু।"

বুদ্ধের কাছে বজ্রসেনের শরণ ও আত্মসমর্পণের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অজস্র কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের বাণী ও দর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন – তবে মূলত কথা কাব্য গ্রন্থের কবিতার মধ্যদিয়ে বৌদ্ধসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য প্রকাশ ঘটেছে নারীর লজ্জাশীলতাকে অতিক্রম করে নারীর আভরণ দানই এখানে 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা' হয়ে উঠেছে। 'পূজারিণী' কবিতায় শ্রীমতি তার জীবনের বিনিময়ে বুদ্ধের পূজার সংকল্পে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা; ভক্তি ও অবিচল আস্থার মধ্য মহীয়সী হয়ে উঠেছেন। 'অভিসার' কবিতায় মানবজীবনের নশ্বরতা ও বুদ্ধের কল্যাণময় ধর্ম সম্পর্কে উপদেশ ধ্বনিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম তিনি গ্রহণ না করলেও তিনি বুদ্ধের বাণী হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন এবং তার সাহিত্য সেই কল্যাণময় বাণীর প্রচার করেছেন। বুদ্ধকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মানব বলে মনে করেছেন। বিশ্বায়ন-উত্তর আধুনিক কালপর্বে শক্তির অসম প্রতিযোগিতার অজস্র হিংস্র উন্মত্ততার আশঙ্কা মাথায় রেখে তিনি বুদ্ধদেবকে আশ্রয় করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তেমনি হিংসা কবলিত পৃথিবীকে ক্ষমাসুন্দরের পেলবতায় সাজাতে সেই দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ভারতবর্ষে বুদ্ধের আদর্শ মুছে যেতে বসলেও রবীন্দ্রনাথ তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন, সৃজন সাহিত্যে। রবীন্দ্রসৃজনে বৌদ্ধসংস্কৃতি আজও ভিন্নমাত্রা বহন করে বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. রবীন্দ্রনাথ : বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১০।
২. রবীন্দ্রনাথ : বৌদ্ধ আখ্যান, তপন বাগচী, ঢাকা, ২০১১
৩. বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম – স্বামী বিদ্যারণ্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৯।
৪. ভগবান বুদ্ধ – ধর্মানন্দ কোসম্বী, সাহিত্য আকাডেমী, ২০১২।

....

বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত রবীন্দ্রনাথ

প্রদীপকুমার সেনগুপ্ত

তথাগত বুদ্ধের চিন্তাধারা ভারতীয় চিন্তাপ্রবাহের একটি উজ্জ্বল পরিণতি। প্রখ্যাত দর্শনের অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী লিখেছেন – "অনেকে বলেন, খ্রিস্টধর্ম যেমন পাশ্চাত্য দেশে সংস্কৃতির বাহনের কাজ করেছে, প্রাচ্যে বৌদ্ধধর্মও তাই করেছে। কথাটি খুবই সত্য। আসলে বৌদ্ধধর্ম শেষপর্যন্ত একটি বিশ্বধর্মেও পরিণত হয়েছে। বুদ্ধদেব পরিণত বয়সে দেহরক্ষা করেন। মানবজাতির ধর্মের ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় কীর্তিদের অন্যতম। তাঁর জীবন ও বাণী সমস্ত মানবজাতির কাছে অনন্ত অনুপ্রেরণা ও আশার উৎস।"

বুদ্ধদেব প্রকৃতপক্ষে মানুষের ধর্মের কথাই বলেছেন। বৌদ্ধধর্ম আসলে মানুষের ধর্ম। বুদ্ধির মুক্তি ঘোষণা করেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। আমাদের ভারতবর্ষের নানা মনীষী কালে কালে বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ মনীষীরা বৌদ্ধধর্মের মূল সত্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছেন। তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'পশ্বাবলী' রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেবেলা' ও 'আত্মপরিচয়'-এ স্বীকার করেছেন। এমনকি সরকারিভাবে না হলেও রাজেন্দ্রলাল নেপাল থেকে বহু মূল্যবান বৌদ্ধ নথি আবিষ্কার করে 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' নামে একটি বই এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি থাকা কালে প্রকাশ করেন। যা অবশ্যই রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

হীনযান বৌদ্ধ সংস্কৃত বই-য়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাসাঙ্ঘিক লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত বই 'মহাবস্তু' বা 'মহাবস্তাবদান'। এটাই বুদ্ধজীবনী ও বুদ্ধ জীবনাদর্শের মহাকোষ। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন, "A Cyclopaedia of Buddhist legends and doctrines". এটি একাধারে নিদান কথা, জাতক অবদান (বৌদ্ধ আচার্য ও ভিক্ষুগণের অতুলনীয় কীর্তি), বুদ্ধবচন ও ভিক্ষু-ভিক্ষণীদের আচরণীয় ধর্মের মহাগ্রন্থ। পণ্ডিত E'Senart তিনটি খণ্ডে সম্পাদনা করে এটি প্রকাশ করেছেন। প্রথম খণ্ডকে বলা যায় 'দুরেনিদান' - অতীত বুদ্ধদেবের কীর্তিকাহিনি, সুমেধতাপসের প্রণিধান; দ্বিতীয় খণ্ড 'অবিদূরেনিদান' - বুদ্ধের জন্ম থেকে বুদ্ধত্বলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ ও তৃতীয় খণ্ড 'সন্তিকেনিদান' অর্থাৎ বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবর্তন। এই নিদান কথাগুলি জাতক ও অবদান কাহিনিতে পূর্ণ। এটি একাধারে নিদান কথা, জাতক, অবদান - এতে গদ্য ও পদ্য দুইই ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষা সর্বত্রই ভাঙা সংস্কৃত। মহাবস্তুতে অঙ্কিত বুদ্ধজীবন হীনযান বৌদ্ধগ্রন্থের ওপর প্রতিষ্ঠিত। নালক, প্রব্রজ্যা, পধান, ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্তগুলিই এই গ্রন্থোক্ত বুদ্ধজীবনের মূলভিত্তি।

বুদ্ধবচনগুলিও মূল পালির ভাঙা সংস্কৃত অনুবাদ। 'জীবনস্মৃতি'তে পাই , রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থ পড়েছিলেন। এরই কাহিনি অবলম্বনে বেশ কিছু কবিতা ও নাটক লিখেছেন। 'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী', 'মূল্যপ্রাপ্তি' কবিতার উৎস যথাক্রমে অবদান শতকের 'বস্তাবদান', 'শ্রীমতী-অবদান' ও 'পদ্মাবদান'। 'পরিশোধ' ও 'মস্তকবিক্রয়' কবিতার মূল যথাক্রমে 'মহাবস্তু'র অন্তর্গত 'শ্যামাজাতক' এবং 'অজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতক', 'অভিসার' কবিতার বিষয়বস্তু 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র উপগুপ্ত-অবদান, 'সামান্যক্ষতি' হল 'দিব্যাবদানমালা' ও 'নগরলক্ষ্মী' – 'কল্পদ্রুমাবদান' থেকে গৃহীত। তাছাড়া, 'মালিনী', 'রাজা', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' ইত্যাদি কাব্যনাট, নাট্য, গীতিনাট্যের মূল কাহিনিও বৌদ্ধজাতক কাহিনি। এছাড়াও বেশকিছু প্রবন্ধ, অভিভাষণ, কবিতা ইত্যাদিতে তিনি হীনযান বৌদ্ধসূত্তের মঙ্গলসূত্ত, মেত্তসূত্ত আবার ধম্মপদের শ্লোক উদ্ধার করে বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন, 'শান্তিনিকেতন প্রবন্ধমালার 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধ। যদিও রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের হীনযান ও মহাযান এই দুইয়ের মিলিত রূপকেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন। কারণ হীনযানে আত্মশক্তির প্রাধান্য আর মহাযানে দেববাদ ও ভক্তিবাদের প্রকাশ। জ্ঞান ও প্রেম, আত্মশক্তি ও ভক্তিবাদের সমন্বয়ে যে বৌদ্ধধর্মে পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রচারক, রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন।

'রবিজীবনী' থেকে জানতে পারা যায় যে রাজেন্দ্রলালের উপরোক্ত গ্রন্থটি রবীন্দ্র সংগ্রহে ছিল। রবি জীবনীকার লিখেছেন – 'রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত সংগ্রহে – 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal / By Rajendralal Mitra, LL.D.C.I.E., Calcutta, Printed By J.W. Thomas Baptist Mission Press, and Published By The Asiatic Society of Bengal, 57, Park Street, 1882', যার আখ্যাপত্রের ওপরে কালিতে লেখা 'Adi Brahmo Samaj / Calcutta. 6 / 2 / 1883' দেখে মনে হয় গ্রন্থটি আদি ব্রাহ্মসমাজ গ্রন্থাগারের জন্য কেনা হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত এটি রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।' রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে করে এই বইটি নিয়ে ঘুরতেন অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে। ৩রা মার্চ ১৮৯৩ উড়িষ্যার তীরতল থেকে একটি চিঠিতে ইন্দিরা দেবীকে লিখেছেন – 'মফস্বলে যখন যাই তখন অনেকগুলো বই সঙ্গে নিতে হয় – তার সবগুলোই যে প্রতিবার পড়ি তা নয়, কিন্তু কখন কোনটা দরকার বোধ হবে আগে থাকতে জানবার জো নেই, তাই সমস্ত সরঞ্জাম হাতে রাখতে হয়।.. ... সেই জন্যে আমার সঙ্গে 'নেপালীজ বুদ্ধিষ্টিক লিটারেচার' থেকে আরম্ভ করে শেকস্‌পীয়র পর্যন্ত কত রকমেরই যে বই আছে তার আর ঠিকানা নেই।' এইভাবেই বোঝা যায় যে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধসাহিত্যের আগ্রহী পাঠক

উদয়ন জানতে পারেন, শ্যামাবতী পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলেই অগ্নিদগ্ধ হয়েছেন। আগের জন্মে শ্যামাবতী ছিলেন রাজা ব্রহ্মদত্তের অগ্রমহিষী। একদিন পাঁচশো পরিচারিকাসহ তিনি উদ্যান ভ্রমণে গিয়ে স্নানের পর প্রবল শীত অনুভব করেন এবং এক সাধুর কুটীরে অগ্নিসংযোগ করে শীত নিবারণ করেন। এই দুষ্কৃতির ফল স্বরূপ এজন্মে তাঁকে অগ্নিদগ্ধ হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই কবিতায় কাহিনির অতীত দিকটিকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ রাজধর্মের একটি উজ্জ্বল চিত্র এঁকেছেন। সন্ন্যাসীর কুটীরে অগ্নিসংযোগে সমগ্র গ্রাম জ্বলে যায় এবং গৃহহীন প্রজা রাজদ্বারে অভিযোগ জানায়। রাজা তখন রাণীকে প্রশ্ন করলে রাণী বলেন –'কতটুকু ক্ষতি হয়েছে প্রাণীর?' রাজার বিচারে রাণীকে সমুচিত শাস্তি / শিক্ষা দেবার জন্য আভরণহীনা করে রিক্ত বেশে পথের ভিখারিণী করে দেন এবং 'হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষতি জীর্ণ কুটীর নাশিয়া' – বছর খানেক পরে তার জবাব দিতে বলেন।

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ মানস অবলম্বনে 'রাজা' নামে একটি নাটক লেখেন। এর কাহিনি উৎস মহাবস্তাবদানের কুশ জাতক। কুশ রঙের দিক থেকে কালো ও কুৎসিত। তাঁর বিয়ে হয় কনৌজরাজ মহেন্দ্রকের 'প্রাসাদিকা দর্শনীয়া' কন্যা সুদর্শনার। পাশে কুশকে দেখে সুদর্শনা বিরক্ত হয়, সেজন্য কুশ-জননী এক 'অজ্যোতিক গর্ভগৃহ' নির্মাণ করে সেখানে পুত্র-পুত্রবধূর মিলনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সুদর্শনা স্বামীকে দেখার জন্য ক্রমে এত উৎকণ্ঠিত হলে তাঁকে ছল করে দেখান হয় কুশের অন্যভাই রূপবান কুলক্রমকে। সুদর্শনা জানেন তাঁর স্বামী সুন্দর। কিন্তু একদিন হাতীশালায় আগুন লাগায় তাঁর ভুল ভেঙে যায়। তিনি বোঝেন তাঁর স্বামী অতি কদাকার। সুদর্শনা ক্ষুব্ধ হয়ে পিতৃগৃহে চলে আসেন। সুদর্শনাকে লাভ করবার জন্য দুর্মতি মহেদ্রক ভবন অবরুদ্ধ করে। এই ভয়ঙ্কর বিপদে কুশের বীর্যবত্তায় সুদর্শনা বিপন্মুক্ত হন এবং স্বামীর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে সুদর্শনা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সঙ্গে থাকে 'প্রেমেন চ গৌরবেণ চ' এই ভাবনা।

মূল কাহিনির ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা করেছেন, তা মৌল উদ্ভাবনায় অভিনব। এই নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনকে লিখেছেন – "মনে করিয়াছিলাম শিশিরোৎসব লিখিব – সময় এবং আমার বয়স অনুসারে সেইটেই সঙ্গত হইত কিন্তু বিধাতা পরিহাস করিয়া আমাকে বসন্তোৎসব লেখাইতেছেন।" ২২ কার্তিক, ১৩১৭, মঙ্গলবার ৮ নভেম্বর, ১৯১০। পরে ৩০শে কার্তিক, ১৩১৭, বুধবার, ১৬ই নভেম্বর, এই নাটক সম্পর্কে বিস্তারিত লিখেছেন অজিতকুমার চক্রবর্তীকে – "রীতিমত নাটক যাকে বলে তা নয় – শারোদৎসব জাতের জিনিসটা। গল্পের সূত্রটি সূক্ষ্ম। তারি দ্বারা কতকগুলি গান গাঁথা। একটি পুরাতন বৌদ্ধ গল্প নিয়ে সেটাকে রূপকে পরিণত করে এইটে লিখেছি। ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা ঠিক করে বলতে পারিনে – কিন্তু প্রতিদিন এই যে কল্পনার সূত্র

নিয়ে মন নির্জনে বসে ভাবের মালা গাঁথছিল তাতে এখানকার দিনগুলি আরো বেশি রাঙিয়ে উঠছিল – অন্তরে বাইরে যেন একটা প্রেমালাপের আদান প্রদান চলছিল। লেখাটি শেষ করেছি – এখন সেটাকে কপি করার ছলে আবার সেটার উপর মন বুলিয়ে চলেছি।"

এই নাটকের অনেক চরিত্র রবীন্দ্রসৃষ্ট, যেমন দাসী সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, রাজবেশধারী সুর্বণ ইত্যাদি। ঘটনাতেও নতুনত্ব আছে, যেমন রাজার দর্শন উপলক্ষে বসন্ত পূর্ণিমায় উৎসব, কাঞ্চীরাজের চক্রান্তে করভোদ্যানে অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি। এছাড়াও এই নাটক বিশ্বরাজার রাজ্যের প্রতীকে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় রাজা হলেন সে প্রভু – 'যে প্রভু কোনো বিশেষরূপে বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়।' 'অরূপরতন' নাটকের ভূমিকা (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)। আর সুদর্শনার রূপচেতনায় অস্থির জীবসত্তা, যে রাজাকে দেখতে চায় স্থূলরূপে বিশিষ্ট সুন্দরের মধ্যে, সুদর্শনা অহং-তবুনুবিদ্ধ অভিমান। যতদিন এই অভিমান, ততদিন তো নির্বিশেষকে উপলব্ধি করা যায় না, ততদিন মন বহির্মুখী। যেদিন নিদারুণ আঘাতে এই অভিমানের ক্ষয়, সে দিন নির্বিশেষ সত্যের উপলব্ধিতে সত্যিকার আত্মদর্শন ও আত্মসমর্পণ। এই 'অরূপরতন' 'রাজা' নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আবার এই নাট্যকাহিনিই ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেন। বিভিন্ন অভিনয়ে গান ও নাট্যাংশের ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছিল।

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন ১৩০২ বা ১৩০৩ বঙ্গাব্দে, ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে 'মালিনী' নাটক লেখেন। তাঁর লেখায় – "উত্তরবঙ্গ হইতে জমিদারি সংক্রান্ত কার্য উপলক্ষে চলিয়াছেন উড়িষ্যা (১৩ বৈশাখ, ১৩০৩ এর পর)। রবীন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লিখিয়াছেন যে ভ্রমণকালে তিনি বিস্তর বই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। এইসব গ্রন্থের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal', তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই থাকিত। ... ... এবার এই গ্রন্থ হইতে 'মহাবস্তু অবদান' অন্তর্গত এক উপাখ্যান অবলম্বনে 'মালিনী' নাট্যকাব্য রচনা করিলেন। (রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ৪৪৪।)

যদিও 'রবিজীবনী'–কার প্রশান্ত পাল ক্যাশবই বা অন্যান্য সূত্র থেকে কবির উড়িষ্যা যাত্রার সত্যতা পাননি। তাই এখন এই বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। এই নাটিকার উৎস মহাবস্তুবদানের অন্তর্গত মালিনী কাহিনি। মূলের কাহিনি রবীন্দ্রনাথে পরিবর্তিত। প্রত্যেক বুদ্ধকে মালা দিয়ে ভূষিত করার সুকৃতিস্বরূপ মালিনী নাম, রবীন্দ্রনাথে সে ইঙ্গিত নেই। মূলগল্পে ভগবান কাশ্যপ অলৌকিক শক্তিবলে ব্রাহ্মণদের পরাজিত করেছিলেন। রাজমহিষীর চরিত্র সম্পূর্ণ নতুন, সুপ্রিয়-মালিনীর প্রেমবৃত্তান্তও কল্পনালব্ধ।

নাটিকায় মালিনী চরিত্রে প্রকট হয়েছে ভগবান বুদ্ধের অপরিমেয় 'মেত্তি' ভাবনার আদর্শ। রচনাবলি সংস্করণে 'মালিনী'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন – 'মালিনী নাটিকার উৎপত্তি স্বপ্নে। ১৮৯০তে (১২৯৭ বঙ্গাব্দে) লণ্ডনে থাকার সময় প্রিমরোজ হিলে তারকনাথ পালিতের বাসায় অবিল ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখেন; 'যেন আমার সামনে একটি নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা বিদ্রোহের চক্রান্ত। দুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস করে দিয়েছেন রাজার কাছে। বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্যে তাঁর বন্ধুকে যেই তাঁর কাছে এনে দেওয়া হল দুই হাতের শিকল তাঁর মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন ভূমিস্যাৎ করে'। এই স্বপ্নবৃত্তান্ত 'মালিনী' নাটকের পরিণাম দৃশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মূল কাহিনিটি রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেছেন। বৌদ্ধসাহিত্য মহাবস্তুবদানের 'মালিন্যবস্তু' থেকে। অবশ্য মূল মহাবস্তাবদান রবীন্দ্রনাথের পড়া ছিল না – পড়ার সুযোগও ছিল না তখন, তিনি কাহিনিটি সংগ্রহ করেছেন ড. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের, 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের অন্তর্গত Mahavastu Avadana–এর হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত সংক্ষিপ্তসার 'The Story of Malini (p – 121)' থেকে। উৎস "রবিজীবনী – প্রশান্তকুমার পাল, ৪র্থ খণ্ড, তৃতীয় মুদ্রণ – শ্রাবণ ১৪১৩ থেকে, পৃঃ ১১৭ – ১১৮।

বৌদ্ধ অবদান সাহিত্যের আর একটি কাহিনি অবলম্বনে 'চণ্ডালিকা' লেখা হয়েছে। এই নৃত্যনাট্যে পূর্বোক্ত ১৮৮২ সালে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের অন্তর্গত শার্দুকর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গ্রহণ করেছেন। চণ্ডালিকায় মুখ্য হয়ে উঠেছে উদার মনের স্পর্শে এক অস্পৃশ্য চণ্ডালকন্যার হৃদয়ের জাগরণ এবং তার দুর্দম প্রণয় তৃষ্ণা। মূল কাহিনির বিষয়বস্তু যাদুমন্ত্রের ওপর সম্বুদ্ধমন্ত্রের বিজয় এবং প্রেমের জন্য প্রকৃতির বৌদ্ধধর্মে দীক্ষাগ্রহণের ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে বাদ দিয়েছেন, এমনকি প্রকৃতির কাছে আনন্দের তৃষ্ণার জল প্রার্থনার দৃশ্যও পরিত্যক্ত হয়েছে। 'চণ্ডালিকা' নাট্যের শুরুতে প্রকৃতি বলেছে, 'আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জলদাও' ... ... কেবল একটি গণ্ডূষ জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল। সাতসমুদ্র এক হয়ে গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম।' মায়াদর্পণের উদ্ভাবনা সম্পূর্ণ নতুন। এই দর্পণেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে আনন্দের প্রচণ্ড হৃদয় দ্বন্দ্বের প্রচণ্ড সংঘাতচিত্র, নাটকে সবশেষে জয় যে কার হয়েছে, প্রকৃতির না আনন্দের, সেটা বলা শক্ত। নাটকের শেষে এসে আনন্দের মুখে একটি বাণী ধ্বনিত হল, -

"বুদ্ধো সুবুদ্ধো করুণো মহান্নবো
যোচ্চন্ত সুদ্ধব্বর-ঞানলোচনা।
. লোকস্স পাপুপকিলেসঘাতকো
বন্দামি বুদ্ধম্ অহমাদরেণ তম্।।"

এই বন্দনা-শ্লোক গভীর তাৎপর্যবোধক, যা সমস্ত জয়-পরাজয়কে ছাপিয়ে রহস্যময় সংকেতের দিক্‌নির্দেশ করে।

১৩১২ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'ধম্মপদং' এর ভূমিকা লিখেছেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের কাছে 'ধম্মপদ' অন্যতম প্রধান বলে গৃহীত। বৌদ্ধসাহিত্যে 'ধর্ম' ও 'পদ' শব্দদুটি একাধিক অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকে। অভিধান প্রদীপিকার অনেকার্থ প্রকরণের ৭৮৪ নং শ্লোকে 'ধম্ম' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হল প্রজ্ঞা, সত্য, পুণ্য, জ্ঞেয়, ন্যায় প্রভৃতি। আবার উক্ত অভিধানের ৮১৯ নং শ্লোকে 'পদ' শব্দটি বিভিন্নার্থে যেমন স্থান, কারণ, পথ ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত। অতএব 'ধম্মপদ' বলতে পুণ্যের পথ, ধর্মের পদাঙ্গ, সত্যের পথ ইত্যাদি বোঝায়। ভগবান বুদ্ধদেবকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব রূপে দেখেই রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ের অর্ঘ তাঁর চরণে নিবেদন করেছেন। ধম্মপদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা অন্তরের টান এই কারণেই ছিল। রবীন্দ্রনাথ হয়ত সেইজন্য বলেছেন – "ধর্মপদের প্রতি আমার এত টান কেন তা জানি না। সকালে গীতা ও ধর্ম্মপদ নিয়ে প্রায়ই বসি।" এই গ্রন্থের উল্লিখিত গাথাগুলির মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা, ধর্মপরায়ণতা ও সৎচরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্য প্রদত্ত উপদেশগুলি যেভাবে আলোচিত হয়েছে, তাকে রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানিয়ে মনের থেকে গ্রহণ করেছিলেন। নিজে 'ধর্ম্মপদ' বইয়ের চতুর্থ বর্গের দশম শ্লোক পর্যন্ত পদ্যে অনুবাদও করেছিলেন।

'ধম্মপদ'-এ উল্লিখিত সমস্ত নীতিবাক্য বুদ্ধদেবের নিজের রচনা কিনা, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায় না। কারণ এই নীতিগুলি ভগবান বুদ্ধের সময়ে এবং তাঁর জন্মের আগে থেকেই ভারতবর্ষের বুকে প্রচলিত ছিল। আবার 'ধম্মপদ' গ্রন্থের একাধিক শ্লোকের অনুরূপ শ্লোক মহাভারত, পঞ্চতন্ত্র, মনুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থেও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্র-অভিমত অত্যন্ত সুস্পষ্ট – 'ভগবদ্‌গীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে যেমন একস্থানে একটি সংহত মূর্তি দান করিয়াছেন, ধর্ম্মপদং গ্রন্থেও ভারতবর্ষের চিত্তের একটি পরিচয় তেমনি ব্যক্ত হইয়াছে। এইজন্যই কি ধর্ম্মপদে, কি গীতায়, এমন অনেক কথাই আছে ভারতের অন্যান্য নানা গ্রন্থে যাহার প্রতিরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।' ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের উক্তি – "ধর্ম্মগ্রন্থকে যাঁহারা ধর্ম গ্রন্থরূপে ব্যবহার করিবেন তাঁহারা যে ফললাভ করিবেন এখানে তাহার আলোচনা করিতেছি না। এখানে আমরা ইতিহাসের দিক হইতে বিষয়টাকে দেখিতেছি – সেই জন্য ধর্ম্মপদং গ্রন্থটিকে বিশ্বজনীনভাবে না লইয়া আমরা তাহার সহিত

ভারতবর্ষের সংগ্রবের কথাটাই বিশেষ করিয়া পড়িয়াছি।" এইজন্যই লুপ্তপ্রায় পুরাতত্ত্বের পুনরুদ্ধারে বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রকাশকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন। প্রাচীন ভারতের গৌরবগাথা প্রকাশে তিনি নিজে বৌদ্ধ কাহিনির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন।

বৌদ্ধধর্ম তাঁর মতে শুধু সন্ন্যাসের ধর্ম বা সংসার বিরাগের ধর্ম বা নীতিকথা নয়। তাঁর তাই সংযোজন – "যারা বলে ধর্মনীতিই বৌদ্ধধর্মের চরম, তাঁরা ঠিক কথা বলে না।" তাঁর মতে মহাপরিনির্বাণও শেষ কথা নয়। তাঁর মতে এই ধর্মে 'যে প্রেম স্বতই আনন্দ, স্বতই পূর্ণতা', আবার আমরা পূর্বোক্ত 'ব্রহ্মবিহার' প্রবন্ধের শরণাপন্ন হলে দেখি – "এতো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এতো বিশ্ব হতে বিমুক্ত হবার প্রণালী নয়, এযে সকলের অভিমুখে আত্মাকে ব্যক্ত করবার পদ্ধতি। এই প্রণালীর নাম 'মেত্তি ভাবনা' – 'মৈত্রী ভাবনা'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ইত্যাদির বিপরীতে করুণাকান্ত বুদ্ধের আদর্শকেই শরণযোগ্য মনে করেছিলেন। একদিকে অত্যাচারী শাসকের নিষ্ঠুর শাসন ও নির্মম দমননীতি, অন্যদিকে অসহায় দুর্বলের দ্বিধাচিত্ততা – এর মধ্যেই প্রয়োজন সত্যের জন্য সুকঠিন আত্মত্যাগ। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ বা ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে কবির বিখ্যাত 'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্য আগে প্রকাশিত 'পূজারিণী' কবিতার রূপভেদ। বৌদ্ধ আদর্শের সত্যের জন্য নটী শ্রীমতীর দুর্জয় সাহসে মৃত্যুবরণ এই নাটকের মূল বিষয়। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি' গানটিও বুদ্ধ জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত। ঐ বছরেই কবি সপার্ষদ পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ তথা যবদ্বীপ, বোরোবুদুর ও সিয়াম যান। নানাভাবে পীড়িত মানবাত্মার তীর্থদ্বার হিসাবে কবির শ্রবণ –

"পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির –
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র, বুদ্ধের শরণ লইলাম।" (বোরোবুদুর)

আবার, 'স্যিয়াম' কবিতাতেও শান্তির মূর্তির জয়ধ্বনি –

"মৌন যার শান্তি অন্তহারা
বাণী যার সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।"

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করে, ১৯৪১ পর্যন্ত যে বিশ্বযুদ্ধ ধ্বংসের লীলায় সভ্যতার সংকট ঘনিয়ে তোলে, সেখানে লোভ, ধ্বংস, মৃত্যু, বিভীষিকার মাঝে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবের অহিংসা নীতি ও অপরিমেয় মৈত্রীভাবনাকেই সুদূর প্রসারিত প্রকৃত বিশ্বপন্থারূপে লক্ষ্য করে লিখেছেন, "পাশবতার সাহায্য মানুষের সিদ্ধিলাভের দুরাশাকে যিনি নিরস্ত করতে চেয়েছিলেন, যিনি বলেছিলেন, 'অক্কোধেন জিনে

কোধং', আজ সেই মহাপুরুষকে স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। ... আজ স্বার্থক্ষুব্ধান্ধ বৈশ্যবৃত্তির নির্মম নিঃসীম দুর্দ্রতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি, যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ করে আবির্ভূত হয়েছিলেন।" (বুদ্ধদেব, ১৩৪২ বঙ্গাব্দ)।

....

রবীন্দ্রনাটক : বৌদ্ধ আখ্যানের নবনির্মাণ

ড. সুরঞ্জন মিদ্দে

যে ভারতবর্ষ একদিন বুদ্ধদেবের মৈত্রী-শান্তির বাণীতে বিশ্ব জয় করেছিল, সেই ভারতবর্ষের আজ বড়োই সংকটময় দুর্দিন। সেই ভারতবর্ষ আজ অন্ধকারে অপমানিত। ভারতবর্ষের পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করলেন –

"সেই নামে আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান কর তুমি।
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক, মুক্ত হোক মোহ-আবরণ।"

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১ – ১৯৪১) মননে, চেতনায় বুদ্ধদেবের অনন্ত প্রভাব সর্বদা কার্যকরী হয়েছে। বুদ্ধদেবের মহানুভবতা, বৌদ্ধযুগের মহৎ ঘটনাবলী, বহির্ভারতে তাঁর বিস্ময়কর প্রভাব – রবীন্দ্রসাহিত্যে বিচিত্ররূপে সৃজিত হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর – বুদ্ধদেবের জীবন-বাণী যেভাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে, তা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয় ভারতীয় সাহিত্যে এক বিরলতম ঘটনা। আজীবন কবি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধের ভালোবাসার স্পর্শ অনুভব করেছেন।

আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব পৃথিবীতে এক ধর্মীয় বিপ্লব আনলেন। তিনি কোনো দৈববাণী শুনে বা স্বপ্ন দেখে ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আনেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষই প্রথম এবং শেষ কথা। সব মানুষ সমান। মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। ব্রাহ্মণ-চণ্ডালে কোনো পার্থক্য দেখেননি। শুধু সব মানুষ সমান নয়, বিশ্বমৈত্রীতে সবাইকে ভালোবাসতে হয়। ক্রোধ দিয়ে বিশ্বকে জয় করা যায় না। সমস্ত বিশ্বই তোমার ঘর –

"আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।"

তুমি শুধু একা নও। তোমার সঙ্গে তোমার ভাই আছে। সেই ভাই থাকে তোমার ঘরে নয়, সেই ভাই বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে।

বুদ্ধদেবই প্রথম মানুষ যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে মেনে নেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন মানুষের শরীরই শেষ কথা। সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে বুদ্ধদেবই ছিলেন প্রথম 'গণদেবতা'। শেষপর্যন্ত মৌলবাদী হিন্দুরা তাঁকে বিষ্ণুর অবতাররূপে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব কখনও নিজেকে 'দেবতা' ভাবেন নি। 'দেবতা'র অস্তিত্বও বিশ্বাস করেননি। এই শ্রেষ্ঠ মহামানবকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ মনে-প্রাণে বরণ করেছিলেন। তাঁর লেখনীর পরতে পরতে প্রকাশ করে বুদ্ধের বিশ্বপ্রেমকে প্রচার করেছেন। বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের প্রতি

রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তার প্রমাণ তাঁর সাহিত্যে বিভিন্ন ধারায় বৌদ্ধের প্রভাব পড়েছে। বৌদ্ধ-ধর্মের মৈত্রী, জীবে অহিংসা এবং করুণা গুণের মধ্যে তিনি মানবপ্রেমের প্রতি সুগভীর টান অনুভব করেছেন। তিনি কবিতায় ও প্রবন্ধে বৌদ্ধধর্মের প্রেম ও অহিংস নীতির কথা বললেও নাটকে সবচেয়ে বেশী বলেছেন। ছোট বড় মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ ৫০-এর বেশি নাটক লিখেছেন। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনি নিয়ে তিনি কম নাটক লেখেননি। কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্মের ভাবগুলি নিয়েই সবচেয়ে বেশি নাটক লেখেন। নাটকের মধ্যদিয়ে বৌদ্ধধর্মের ভাবগুলি অধিকতর সার্থকতার সঙ্গে রূপায়ন করেছেন। তাছাড়া বৌদ্ধধর্মের ভাব নিয়ে রচিত প্রায় সবকটি নাটককেই তিনি বিভিন্ন সময়ে রূপান্তর সাধন করেন। পৌরাণিক কাহিনির নাটককে এমনভাবে রূপান্তর করেননি। শুধু 'রাজা' নাটকটি তিনি ৪বার পরিবর্তন করেন। আবার সুদীর্ঘ ৪০ বছর পরেও 'পরিশোধ'-এর পূর্ণাঙ্গ নাট্যরূপ দিয়েছেন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে। এর থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুরাগ লক্ষ করা যায়।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'দ্য সংস্কৃত্ বুদ্ধিস্ট লিটেরেচার্ অফ নেপাল' (১৮৮২) গ্রন্থটি প্রকাশের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ আগ্রহী হয়ে ওঠেন। বৌদ্ধের বিভিন্ন কাহিনি অবলম্বনে ১৮৯৬ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনেক নাটক ও আখ্যান-কবিতা লেখেন। বৌদ্ধধর্মের কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও নাটকে যে সাহিত্যরস সৃষ্ট করেছেন তা এককথায় অনন্য। কি এদেশে – কি বিদেশে এমন অসাধারণ সৃষ্টি অন্য কেউ করেন নি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও নাটকগুলির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। বস্তুত আমাদের দেশে বৌদ্ধ কাহিনির জনপ্রিয়তার জন্য রবীন্দ্রনাথের দান সর্বাপেক্ষা বেশি।

রবীন্দ্রনাথের এই নাটকগুলিতে একটা বিশেষত্ব খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রায় সমস্ত আখ্যানগুলি গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধদের সংস্কৃত সাহিত্য থেকে। কিন্তু তিনি সেই কাহিনিকে নিজের মত করেই নিয়েছেন। তার ফলে আঙ্গিকের দিক্ থেকে আধুনিকীকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধন হয়েছে। তবে শুধু রূপ ও রসের দিক থেকে নয়, ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার দিক থেকেও এই নাটকগুলির বিশেষ সার্থকতা আছে। আর সেই সঙ্গে তৎকালীন ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের পরিচয় পাওয়া যায় এই নাটকগুলিতে। তবে রাষ্ট্র ও সমাজের ঊর্ধ্বে এসে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই চিরন্তন মানবপ্রেমের কালজয়ী মহিমা প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ আখ্যানমূলক নাটকগুলির মধ্যে 'মালিনী', 'নটীর পূজা' ও 'চণ্ডালিকা' প্রধান। এই তিনটি নাটকেই তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের আচারনিষ্ঠার ঊর্ধ্বে উঠে বৌদ্ধধর্মের মানবপ্রেমকে প্রকাশ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম কি করে মাতৃভূমি ভারতবর্ষ থেকে একেবারে বিস্মৃত হয়ে গেল; একথা নিয়ে অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ দেখালেন বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়নি। উত্তরে তিব্বত, পূর্বদিকে চীন, জাপান ও

দ্বীপময় ভারতে বুদ্ধমূর্তির পদতলে দীপ জ্বালিয়ে আজো লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তি পেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের যুক্তিবাদী মন আড়াই হাজার বছর আগের বুদ্ধের যুক্তিবাদী মনকে বিস্ময়ে প্রণাম জানিয়েছে। বুদ্ধদেব মানব প্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথও মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী। মহামানব বুদ্ধদেবকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মুগ্ধ অন্তরের প্রণতি নিবেদন করেছেন। কারণ তিনি নিজেও জানেন 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'।

বৌদ্ধধর্ম কি ভারতবর্ষের মাটি থেকে ক্ষয়িষ্ণু হয়ে গেল? বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ দেখালেন – বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে মুছে যায়নি। বৈচিত্র্যের ভূমি ভারতবর্ষে বৈষ্ণব, নাথপন্থী, ধর্মঠাকুরের নানান স্তরে নানা নামে বৌদ্ধধর্মের মননশীলতা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বুদ্ধদেবের মানবতার বাণীকে কবি বিস্ময়ে নতি জানিয়েছেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব বুদ্ধদেবকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

'মালিনী'[১] (১৮৯৬)

'মালিনী' নাটকটি বৌদ্ধ-আখ্যান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটক।

বারাণসীরাজ কৃকির কন্যা মালিনী ভিক্ষু কাশ্যপের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মালিনী একদিন ভিক্ষু কাশ্যপকে সদলবলে নিমন্ত্রণ করেন। ফলে ব্রাহ্মণদের রোষে মালিনীর নির্বাসন দণ্ড হয়। মালিনী তার পিতার কাছে এক সপ্তাহের সময় চান। এর মধ্যেই মালিনীর ভাই, অমাত্যবর্গসহ জনগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। এরা একযোগে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। এরপরেও ব্রাহ্মণেরা রাজার আশ্রয় নিয়ে ভিক্ষু কাশ্যপকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যায়।

ভাব ও ভঙ্গিতে বৌদ্ধ কাহিনির সঙ্গে 'মালিনী' নাটকের অনেক পার্থক্য আছে। সুপ্রিয় ও ক্ষেমঙ্কর চরিত্র দুটি রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি। মালিনীর প্রতি সুপ্রিয়র অনুরাগও কবিকল্পিত। মূল কাহিনিকে প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখে কবি নাটকে বৈচিত্র্য ও রস সঞ্চার করেছেন। 'মালিনী' নাটকের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মালিনী চরিত্র। মালিনী এখানে বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের প্রতিরূপ বসুন্ধরার দুঃখে আকুল মালিনীর কথা করুণাসাগর বুদ্ধদেবকে স্মরণ করিয়ে দেন। মালিনী চরিত্রে বুদ্ধদেবের বিশ্বজয়ী মহিমা রবীন্দ্রনাথ উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করেছেন। মালিনীর মধ্যে সুপ্রিয় ধর্মের এক জীবন্ত আদর্শ দেখতে পেয়েছে। এতদিন এত শাস্ত্র অধ্যয়ন করে সে তা পায় নি। একেই বলে সে নবজন্ম।

"শুধু জানি বলি দিয়া আত্ম-অভিমানে
বাসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা
আপন করিতে হবে – যে কিছু বাসনা
শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়।

যজ্ঞে যাগে তপস্যায় কভু মুক্তি নয়,
যুক্তি শুধু বিশ্বকাজে।"

সত্যের পরীক্ষায় সুপ্রিয় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর এই জয় হিংসার মধ্যে অহিংসার, নিষ্ঠুরতার মধ্যে প্রেমের। 'মালিনী' নাটকের উপসংহারেও মালিনীর মধ্যদিয়ে বৌদ্ধধর্মের ক্ষমার আদর্শই জয়লাভ করেছে।

'রাজা' (১৯১০)

'রাজা' নাটকটি 'সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটেরেচার অফ্ নেপাল' গ্রন্থের কুশ জাতক অবলম্বনে রচিত। এই নাটকের অভিনয়যোগ্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ 'অরূপ রতন' (১৯২০) নাট্যরূপক। রবীন্দ্রনাথ পরে এই কাহিনির আভাসে 'শাপমোচন' (১৯৩১) কবিতা ও 'শাপমোচন' কথিকা (১৯৩১) রচনা করেন।

বারাণসীরাজ ইক্ষ্বাকুর প্রধানা মহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে কুশ। সে অসাধারণ প্রজ্ঞাবান কিন্তু চেহারা ছিল কদাকার। পরমাসুন্দরী রাজকন্যা সুদর্শনার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। কুশের মা কুশ ও সুদর্শনাকে এক অন্ধকার ঘরে রেখে দিয়েছিল। একদিন ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় স্বামীকে দেখে লজ্জায় ঘৃণায় বাপের বাড়ি চলে যায় সুদর্শনা। বিরহী কুশ ছদ্মবেশে রাজকন্যার রন্ধনশালায় নিযুক্ত হয়। পরিশেষে সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী ৭জন রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে সুদর্শনার অন্তর জয় করেন।

এরপরে মহাবস্তু অবদানে বলা হয়েছে পূর্বজন্মে বুদ্ধদেব ছিলেন কুশ, যশোধরা ছিলেন সুদর্শনা। সুদর্শনার পাণিপ্রার্থী ৭জন রাজা ছিল মার। আসলে এই কাহিনি লেখা হয়েছে বুদ্ধদেবের মার-বিজয় প্রসঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ অপরূপ কাব্যসুষমায় এক অধ্যাত্মরসের রূপকনাট্য সৃষ্টি করেছেন। সে দিক থেকে বিচার করলে 'রাজা' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সৃষ্টি। রূপে, রসে ও ভাবে 'রাজা' নাটকটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। 'রাজা' নাটকে মানবহৃদয়ের ভগবৎ উপলব্ধি প্রকাশ ঘটেছে। সুরঙ্গমা ও ঠাকুরদা রবীন্দ্রনাথের নতুন সৃষ্টি। সুরঙ্গমা ভক্ত-সাধিকার প্রতীক। ঠাকুরদা হল একজন আত্মনিবেদিত রসসাধক।

'রাজা' নাটকে রাজা চরিত্রে একের মধ্যে দুই গুণ প্রকাশ পেয়েছে – প্রথমত তাঁর প্রেমশক্তি, দ্বিতীয়ত নিষ্ঠুরতার শক্তি। তিনি সুদর্শনার প্রতি যেমন ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন, তেমনি সুদর্শনার ভুল পথের জন্য শাস্তিও দিয়েছেন। যথার্থ ঐশ্বরিক শক্তি বলতে রবীন্দ্রনাথের মতে তাঁর ভালোবাসার তুলনা নেই। রবীন্দ্রনাথের রাজা অরূপরতন। সুনির্দিষ্ট কোন রূপকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় না। 'রাজা', 'অরূপরতন' ও 'শাপমোচন' নাটকের মূল গল্পটি জাতক কথার মধ্যেও পাওয়া যায়। গল্পটি কুশ জাতক নামে খ্যাত। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকের মধ্যে এক গভীরতর অর্থ দিয়েছেন যা কুশ জাতক গল্পের মধ্যে নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচনে'র রাজা, 'রাজা' কিংবা 'অরূপরতনে'র রাজার মত আলোকচারী নহেন, বরং মর্ত্যচারী; তিনি অপার্থিব নন, সাধারণ পার্থিব চরিত্র। সেজন্য এই চরিত্রের মধ্যে নাটকের যথার্থ গুণ অধিকতর বিকশিত হয়েছে।

'অচলায়তন' (১৯২২)

'অচলায়তন' নাটকটি 'সংস্কৃত বুদ্ধিস্ট লিটেরেচার অফ নেপাল' গ্রন্থের পঞ্চকের কাহিনি থেকে রচিত। সহজভাবে অভিনয় করার জন্য নাটকটি 'গুরু' (১৯১৮) নামে ছোট আকারে প্রকাশিত হয়।

এক ব্রাহ্মণের সমস্ত সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর মারা যায়। পরিশেষে একটি শিশু অনেক কষ্টে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের আশীর্বাদে মৃত্যুর থেকে রক্ষা পায়। কালক্রমে একজন মহাজ্ঞানী মহাপঞ্চক সন্ন্যাস গ্রহণ করে অর্হত্ব লাভ করে। কিন্তু আরও একজন পঞ্চক সন্ন্যাস হয়েও মূর্খ হয়ে রইল। তাই মহাপঞ্চক তাকে তাড়িয়ে দেয়। ভগবান বুদ্ধ তাকে বিহারে নিয়ে আসেন। তার শিক্ষার ব্যবস্থা করলে তিনি অর্হত্ব লাভ করেন। এই কাহিনির ভাব হল – দৃঢ় সংকল্প থাকলে জীবনে সফলতা আসে। বৌদ্ধ পরিভাষায় একে বলা হয় বীর্য-পারমী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পঞ্চকের কাহিনি নিয়ে নতুন আলোক 'অচলায়তন' নাটক রচনা করেছেন। নাটকের অন্তর্নিহিত ভাব রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ বিকৃত মহাযান বৌদ্ধধর্মের মন্ত্রতন্ত্র ব্রত-উপবাস বোধহীন শুকনো আচার দেখেছেন। 'অচলায়তন' নাটকটির পটভূমি হচ্ছে – সামগ্রিকভাবে দেশের জড়তাগ্রস্ত ও আচারসর্বস্ব ধর্মের বিধান।

'অচলায়তন' নাটকটি প্রকাশিত হবার পর সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। অভিযোগের তীর উঠেছিল রবীন্দ্রনাথ হিন্দুধর্মের মন্ত্র ও আচার অনুষ্ঠানকে বিদ্রুপ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জরাজীর্ণ পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুন করে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন।

'নটীর পূজা' (১৯২৬)

বৌদ্ধধর্মের অবদান-শতকের কাহিনি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ 'পূজারিণী' (১৮৯৯) কবিতা লেখেন। আবার দীর্ঘ ২৭বছর পর সেই কাহিনি নিয়ে 'নটীর পূজা' নাটিকা লেখেন।

মগধরাজ বিম্বিসার তাঁর প্রাসাদে বুদ্ধের এক স্তূপ নির্মাণ করেন। পরিচারিকারা প্রতিদিন যেখানে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেয়। অজাতশত্রু রাজা হয়ে তা বন্ধ করে দেন। এর এই আদেশ অমান্য করলে মৃত্যুদণ্ড হবে। একদিন দাসী শ্রীমতী জীবনের মায়া বিসর্জন দিয়ে বুদ্ধের স্তূপে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন।

দেশের জন্য দেশপ্রেমিকদের আত্মদানের কাহিনি ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু ঈশ্বর ভক্তির জন্য নারীর জীবনদান জগতে নেই। কিন্তু – 'নটির পূজা'তে শুধু আত্মত্যাগের কাহিনি নয়, তৎকালীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মকে কেন্দ্র করে ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়া নাট্যরসের দিক থেকে 'নটীর পূজা' শুধু রবীন্দ্র সাহিত্য নয়, সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অপূর্ব সৃষ্টি।

সমগ্র নাটকটি একদিনের ঘটনা নিয়ে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ভগবান বুদ্ধের জন্মোৎসবের দিন। সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষু উপালি রাজপুরীতে এসে প্রভু বুদ্ধের নামে ভিক্ষাপ্রার্থী, তখন একমাত্র জেগেছে নটী শ্রীমতী। ভিক্ষু জানান, ভগবান শ্রীমতীকে দয়া করেছেন। এইভাবে নাটকের শুরুতে শ্রীমতীর আত্মদানের ইঙ্গিত আছে। শ্রীমতী নৃত্যের তালে তালে অঙ্গের সমস্ত অলংকার একে একে আবর্জনার মধ্যে বিসর্জন দেয়। নটির বেশ ফেলে দিয়ে ভিক্ষুণীর বেশে শ্রীমতী জানু পেতে বুদ্ধের স্তবমন্ত্র উচ্চারণ করে। সেই সময়ে ঘাতকের অস্ত্রাঘাতে শ্রীমতীর দেহ পূজার আসনে লুটিয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লেখেন – "বুদ্ধদেবকে নটী যে অর্ঘ্য দান করতে চেয়েছিল সে তার নৃত্য। অন্য সাধকেরা তাঁকে দিয়েছিল যা ছিল তাদেরই অন্তরতর সত্য, নটী দিয়েছে তার সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকে। মৃত্যুকে দিয়ে সেই সত্যের চরম মূল্য প্রমাণ করেছে। এই নৃত্যকে পরিপূর্ণ করে জাগিয়ে তুলেছিল তার প্রাণমনের মধ্যে তার প্রাণের প্রাণ।"

'নটীর পূজা' নাটিকার প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের মহিমাকে রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। 'নটীর পূজা' নাটিকাটি একদিনের ঘটনা হয়েও একটি সমগ্রযুগের হৃদস্পন্দনে ধ্বনিত হয়েছে।

'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩)

'চণ্ডালিকা' নাটকটি শার্দূলকর্ণ-অবদান কাহিনি অবলম্বনে রচিত। পাঁচবছর পরে রবীন্দ্রনাথ এর পরিবর্তন করে 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৮) প্রকাশ করেন।

কাহিনি ঘটনাস্থল শ্রাবস্তী। একদিন বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দ বিহারে ফেরার পথে পিপাসিত হলেন। পথে দেখতে পেলেন তিনি প্রকৃতি নামে এক চণ্ডালের মেয়ে কুয়ো থেকে জল তুলছে। তার কাছ থেকে জল পান করলেন আনন্দ। জল দেওয়ার সময় মেয়েটি তাঁর রূপ দেখে মুগ্ধ হন। কিন্তু তাঁকে পাবার কোনো উপায় না পেয়ে তার মায়ের যাদুবিদ্যার সাহায্য নিলেন। রাত্রে আনন্দ তার বাড়িতে আসেন। তিনি বেদীর উপর আসন গ্রহণ করলে প্রকৃতি তাঁর জন্য বিছানা করলেন। আনন্দ এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের জন্য ভগবান বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধদেব তার শিষ্যের অবস্থা জেনে একটি বৌদ্ধমন্ত্র আবৃত্তি

করলেন। সেই মন্ত্রের জোরে চণ্ডালিনীর জাদুবিদ্যা দুর্বল হয়ে গেলে আনন্দ মঠে ফিরে এলেন।

কাহিনিটিতে মূল বিষয় জাতিভেদের অসারতা। তবে জাতিভেদের মধ্যে অস্পৃশ্যতাই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। ভারতবর্ষে অস্পৃশ্য মজ্জাগত অভিশাপ রবীন্দ্রনাথ 'চণ্ডালিকা' নাটিকায় তা এক নতুন ব্যঞ্জনায় অপরূপ নাট্যরূপের মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। চণ্ডাল কন্যা হয়েও সে আনন্দের প্রেমাকাঙ্ক্ষী। এখানে প্রকৃতি নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করেছে মানবাত্মার মর্যাদা। এখানে প্রকৃতির মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিদ্রোহীসত্তাই প্রকাশ পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের প্রধান কারণ মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও মানুষের বন্ধনমুক্তি। বৌদ্ধধর্মের এই আদর্শ 'চণ্ডালিকা' নাটিকায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। নারীর ক্ষুধার্ত প্রেম প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়ল পুরুষের পায়ে। এমনিভাবে অসীম দুঃখের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে মোহ থেকে কল্যাণকে জয়ী করলেন।

নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' (১৯৩৯)

বৌদ্ধধর্মের কাহিনি নিয়ে 'পরিশোধ' (১৮৯৯) কবিতা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। দীর্ঘ ৪০ বছর পর আবার সেই কাহিনি নিয়ে তিনি 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রচনা করেন।

তক্ষশিলার বণিক বজ্রসেন বারাণসীতে এসে একরাতে চোর বলে ধরা পড়েন। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় বারাঙ্গনা শ্যামা তাকে দেখে প্রেমাসক্ত হয়। পরে কৌশলে বজ্রসেনকে মুক্ত করে আনে। শ্যামা বজ্রসেনের প্রেমে আত্মহারা। একদিন নৌ-বিহারের সময় বজ্রসেন শ্যামাকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে পালিয়ে যায়।

মূল কাহিনিতে বজ্রসেন প্রাণের ভয়ে কিংবা পাপবোধে শ্যামাকে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যাগ করেছে। রবীন্দ্রনাথ বজ্রসেনের মনে পাপবোধ জাগ্রত করেছেন। কিন্তু এই পাপবোধকে অতিক্রম করে এক অপরূপ করুণরস সৃষ্টি করেছে –

"ক্ষমিতে পারিলাম না যে,
ক্ষমো হে মম দীনতা
পাপী জন শরণ প্রভু।। ...."

নাটিকার সমাপ্তিতে শেষপর্যন্ত এই ক্ষমার আদর্শই করুণ রসের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধ আখ্যানমূলক নাটক, কবিতা ছাড়া আরো কয়েকটি নাটকে ও উপন্যাসে বৌদ্ধ ভাবনার কথা আছে। যেমন – রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' (১৯২৬) নাটিকা 'নটীর পূজা'র সমকালীন।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় – নাটক রচনায় সংস্কৃত কিংবা ইংরেজি সাহিত্য অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি ছিল। বৌদ্ধধর্মের মৈত্রী ও করুণাগুণের মধ্যে মানবিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু নির্বাণ ও নিবৃত্তির প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানেও মৌলিক, অভিনব। বজ্রসেন চরিত্রের মধ্যে কবি দেখালেন – 'পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিও না।' পাশাপাশি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'শ্যামা নৃত্যনাট্যে' (১৯৩৯) ভারতীয় চারটি নৃত্যধারার এক অপূর্ব সম্মিলন ঘটালেন। বজ্রসেনের অভিনয় ভারতনাট্যম্ , উত্তীয় কথকের আদর্শে, শ্যামার অভিনয় মণিপুরীতে আর প্রহরীর নাচ কথাকলি আঙ্গিকের মাধ্যমে এক অভিনব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। যা এককথায় অভাবনীয়।

নাট্যনাম	রবীন্দ্রনাটক : বৌদ্ধভাবনার নবায়ন	প্রকাশ সাল
১। 'মালিনী'	(রোমান্টিক ট্রাজেডি)	১৮৯৬
২। 'রাজা'	(রূপক-সাংকেতিক)	১৯১০
৩। 'অচলায়তন'	(রূপক-সাংকেতিক)	১৯১২
৪। 'গুরু'	(রূপক-সাংকেতিক)	১৯১৮
৫। 'অরূপরতন'	(রূপক-সাংকেতিক)	১৯২০
৬। 'নটীর পূজা'	(সামাজিক নাটক)	১৯২৬
৭। 'চণ্ডালিকা'	(নৃত্যনাট্য)	১৯৩৮
৮। 'শ্যামা'	(নৃত্যনাট্য)	১৯৩৯

'বিসর্জন' (১৮৯০) থেকে 'নটীর পূজা' (১৯২৬) পর্যন্ত রবীন্দ্রনাটকে বৌদ্ধ প্রসঙ্গ এসেছে নানাভাবে। বৌদ্ধকাহিনি, রবীন্দ্রনাথের কাছে পেয়েছে নতুন মাত্রা। বৌদ্ধকাহিনি নব নব রূপ পেয়ে নতুনভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ এখানেও ঋণ গ্রহণ করেও নতুনের দিশারী হয়ে উঠেছেন। কখনও বৌদ্ধকাহিনিকে বিয়োজন আবার কখনও সংযোজন করে বৌদ্ধকাহিনিকে এক অভিনব মাত্রায় নতুন দিগ্‌দর্শনের অভিমুখ খুলে দিয়েছেন।

'বিসর্জন' (১৮৯০) নাটকের ভাব ও বিষয় 'মালিনী' (১৮৯৬) নাটকে আরো সংযত, শিল্পসম্মত হয়ে উঠেছে। 'বিসর্জন' নাটকে বৌদ্ধভাবনা ছিল – কিন্তু সেই ভাবনা ছিল প্রচ্ছন্নভাবে। প্রচ্ছন্ন ভাবনা প্রত্যক্ষ হয়েছে 'মালিনী' নাটকে। 'বিসর্জনে'র রাজা গোবিন্দমাণিক্য শুধু নিজের কথা, রাজ্যবাসীর কথা ভাবেননি – ভেবেছেন অসহায় মানবেতর প্রাণীর প্রাণের কথা। 'বিসর্জন' নাটকে অপর্ণা যেন আইডিয়ার প্রতিমূর্তি – ভাবজগতের অধিকারী। রাজা গোবিন্দমাণিক্য এবং অপর্ণা দুজনেই যেন রক্তমাংসের মানব মানবী নয়। কিন্তু 'মালিনী'তে মালিনী অনেকাংশে মানবী – রক্ত মাংসের নারী।

'বিসর্জন'-এর কাহিনি এসেছে ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে, 'মালিনী'-র বিষয় এসেছে কল্প-ইতিহাসে ভর করে। বৌদ্ধধর্মের প্রসারের প্রথম যুগের কথা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের

বুদ্ধজীবনকথা মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'তথাগত' : ইতিহাসের পুনর্জন্ম

সনৎকুমার নস্কর

রক্তস্নাত, হিংসাজর্জর পৃথিবীকে যিনি সর্বপ্রথম অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে নতুন আলোকতীর্থে উপনীত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন, তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা করুনাঘন গৌতম বুদ্ধ। এক জ্যোতির্ময় অনন্য বোধি তিনি প্রাপ্ত হয়ে তা সারা বিশ্বের মানুষের কাছে বিতরণ করে গেছেন, যা সকলের জীবনকে শান্তি, প্রীতি ও মৈত্রীতে ভরে দিতে সক্ষম। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শাক্যমুনি তথাগত হয়ে উঠেছিলেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ মানব', যাঁর পাদপদ্মে তিনি তাঁর অন্তরের বিনম্র প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। বস্তুত, ঐতিহাসিক বিচারে গৌতম বুদ্ধ কেবল মানব নন, তিনি এক সুমহান আদর্শের প্রতীক। অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রীর মূর্তিমান বিগ্রহ। আত্মসংযম, কর্মনিষ্ঠা এবং ত্যাগব্রতই ছিল তাঁর বিশ্বজয়ের গোপন রহস্য। না. কোনো দৈববাণী তথা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ নয়, সম্পূর্ণ নিজের জীবনাভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে এবং একটি স্পষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তাঁর মানবতাবাদী দর্শন গড়ে তুলেছিলেন। যেকালে তাঁর আবির্ভাব (খ্রিস্টপূর্ব ৫৭৩ অব্দ), সেসময় সারা ভারতবর্ষে আর্যপ্রণীত বৈদিকধর্মের জয়জয়কার। চতুর্বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, সংহিতা ইত্যাদির আশ্রয়ে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ্যবাদ পাকাপোক্তভাবে স্থায়ী হয়েছে। তারই সূত্রে গড়ে উঠেছে চারবর্ণের ভেদ তথা জাতব্যবস্থা; অশুচিতার অবৈজ্ঞানিক ধারণার হাত ধরে জায়গা জুড়েছে ঘৃণ্য অস্পৃশ্যতা, যাগযজ্ঞ পূজার্চনার আড়ম্বর, আর পুণ্য মোক্ষ পারলৌকিক সুখ, ইহলৌকিক সম্পদ লাভের কামনায় হয়ে চলেছে অসংখ্য জীবহত্যা। সে এক নারকীয় পরিবেশ। উচ্চবর্গের শাসনে ও শোষণে নিম্নবর্গদের তখন নাভিশ্বাস ওঠার যোগাড়। ঠিক এমন এক অন্ধকার সময়ে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সমস্ত রাজসিকতা পরিহার করে আত্মনিরীক্ষণের পথ ধরে করলেন সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা। তাঁর উন্নত বোধি সৃষ্টি করল একবিন্দু আলোক, যা ক্রমে ক্রমে দীপ্ত হয়ে উঠল কোটি সূর্যের উজ্জ্বলতা নিয়ে। দূর হল অন্ধকার, মানবতার নতুন বিশ্বে পদার্পণ করতে সমর্থ হল অসহায় ব্যথিত যন্ত্রণাকাতর মানুষ। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অধীনে মানুষে মানুষে গড়ে উঠেছিল যে ছুঁৎমার্গের ব্যবধান, বিশুদ্ধ মানবতা হয়েছিল ধূল্যবলুণ্ঠিত, গৌতম বুদ্ধের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সেই বৈষম্য ও অপমান বিদূরিত হল। বিশ্ব-ইতিহাসে সম্ভবত তথাগত বুদ্ধই ছিলেন প্রথম গণনায়ক, যাঁর আহ্বানে লক্ষ লক্ষ মানুষ পথে ভিড়েছে, যিনি 'গণ' তথা সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-সমৃদ্ধির কথা ভেবেছেন নিতান্ত সহজ পথে। দেশের সমৃদ্ধি, জাতির সমৃদ্ধি বিষয়ে যাঁর স্পষ্ট একটি দিশা ছিল। তিনি সকল

মানুষকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন, তোমার সামনে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, সেখানে তোমাকেই জ্বালাতে হবে আলো, দূর করতে হবে ঘন তমিস্রা। সুতরাং 'আত্মদীপ ভব'। কবির কথায় :

"আপনারে দীপ করি জ্বালো
আপনার যাত্রাপথে আপনারে দিতে হবে আলো।"

গৌতম বুদ্ধের নিজের জীবনে এই পথপ্রদর্শক আলো এসেছিল তাঁর আত্মজয়ের সাধনা থেকে। তিনি রাজার সন্তান, কিন্তু স্বেচ্ছায় রাজসুখ ও ভোগবিলাস ত্যাগ করেছেন। তিনি বিবাহিত, কিন্তু অবহেলায় দাম্পত্যসুখের মোহ এড়িয়েছেন। তিনি সন্তানের পিতা, তবু কোনো বাৎসল্য স্নেহ তাঁকে সংসারে বেঁধে রাখতে পারেনি। নিরীশ্বরবাদী ধর্মদর্শনের প্রবক্তা হিসাবে অদৃশ্য অলৌকিক ঈশ্বরের সত্তা তো বটেই পাপপুণ্য, অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ, কর্মফলবাদ কিছুই মানেননি। এমনকি অস্বীকার করেছেন আত্মাকেও। তাঁর ধর্মচিন্তায় পরকালের অস্তিত্ব শূন্য। তাঁর ভাবনা কেবল দৃশ্যমান জগৎ ও সেই জগতের বাস্তব দুঃখ নিয়ে; সমাজের অসাম্য বৈষম্য, শ্রেণিভেদ, জাতিবর্গের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে। যে সামাজিক অসাম্য তাঁর আবির্ভাবকালে বিরাজ করছিল, তিনি তার মূলীভূত কারণ হিসেবে দায়ী করেছিলেন যাগযজ্ঞ-প্রধান বৈদিক ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক আচার-বিচারকে। এদের মূলোচ্ছেদে তাঁর সংগ্রাম ছিল একক ও অনমনীয়। সকল জীবের প্রতি সমদৃষ্টি ও করুণা প্রদর্শনের মধ্যদিয়ে তিনি নির্মাণ করতে চাইলেন এমন এক সর্বাতিশায়ী দর্শন, যা পূর্বের ধর্মাচরণে কোথাও ছিল না। মুক্তির ধারণাও তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু যে মুক্তি কর্মত্যাগের বৈরাগ্যে নয়, সাধুকর্মের মধ্যে আত্মত্যাগে। কর্মই তাঁর জীবনের ধর্ম, চঞ্চল মনের উপর আত্মনিয়ন্ত্রণই তাঁর ধর্মের সারকথা।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষীদের মধ্যে অন্যতম গৌতমবুদ্ধের জীবন-কথা নিয়ে লেখা একালের বাংলা নাটক 'তথাগত' সম্পর্কে দু'চারটে মামুলি কথা বলতে গিয়ে এই অগোছালো ভূমিকাটুকু করতে হল এই জন্য যে, নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় এই মহামানবের জীবন ও বাণীকে যেভাবে রূপ দিয়েছেন, তার অন্তরের সার কথাটি হল তথাগতের আত্মবোধ ও জনকল্যাণে সেই বোধের স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণ। আমাদের বঙ্গদেশে মনীষী, মহাত্মা, মহামানবদের নিয়ে লেখালেখি কম নেই। সাহিত্যের নানা সংরূপের মধ্যেদিয়ে তাঁরা ব্যক্ত। জীবনীগ্রন্থ ছাড়া লেখা হয়েছে গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক। মূলত তাঁদের প্রচারিত আদর্শ তুলে ধরাই এ জাতীয় রচনার লক্ষ্য। মহামানব গৌতম বুদ্ধ যে ধর্মাদর্শ ও জীবনদর্শন প্রচার করেছিলেন, তা দীর্ঘদিন ধরে কেবল ভারতবর্ষেই নয়, সমস্ত পৃথিবীর অনুসরণীয় আদর্শ হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর জীবনকথা যে রসসাহিত্যের

উপজীব্য হয়ে উঠবে – এ নিয়ে সংশয় নেই। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, সংস্কৃত সাহিত্যের যুগে একমাত্র অশ্বঘোষ ছাড়া সেদিকে আর কেউ পা বাড়ালেন না। তাঁর 'বুদ্ধচরিত' হয়ে রইল প্রাচীন যুগের বুদ্ধচর্চার একমাত্র দৃষ্টান্ত। গুপ্তরাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের পরিপোষক। তাই তাঁদের কালে তো নয়ই, এমনকি বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক পাল রাজাদের আমলেও শাক্যমুনিকে নিয়ে কিছু লিখতে কোনো সাহিত্যিককেই এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। এই রাজবংশের অবক্ষয়ের কালে দশম শতকে বাংলা সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছিল যে বিষয় নিয়ে সেখানেও সরাসরি বুদ্ধ ছিলেন না, ছিল তাঁর মূল ধর্মমত থেকে নানা যুগে চোলাই হয়ে আসা তান্ত্রিক সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্মকে যে হিন্দুধর্ম গিলে ফেলেছিল তার পাথুরে প্রমাণ জয়দেবের গীতগোবিন্দে বিধৃত দশাবতার স্তোত্র। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অন্যতম পৌরাণিক 'আইকন' বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে তিনি সেখানে স্তুত। হতে পারে, গুপ্তরাজারা যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়েছিলেন, তার প্রবল দাপটে বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধপ্রভাব ধীরে ধীরে মুছে যায়। তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি রূপে দেখা দিয়েছিলেন কর্নাটের ব্রহ্মক্ষত্রিয় সেনেরা। ফল : বৌদ্ধধর্মের উৎসাদন ও বঙ্গদেশ থেকে বৌদ্ধপ্রভাবের পুরোপুরি অবলুপ্তি। তাই সারা মধ্যযুগে একজনও কেউ আঁচড় কাটেননি গৌতম বুদ্ধ কিংবা তাঁর ধর্মমত নিয়ে। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী মানসিকতা সঞ্চারিত ছিল আধুনিক যুগের প্রারম্ভেও। চলতও হয়তো আরো দীর্ঘকাল, যদি না স্যার উইলিয়াম জোন্সের দ্বারা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্তন হত এবং বিদেশিদের উদ্যোগে প্রাচীন পুথি আবিষ্কারের হিড়িক পড়ে যেত। বাঙালিদের মধ্যে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন পণ্ডিতপ্রবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও তাঁর সুযোগ্য সহযোগী মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এঁদের মতো আরও কয়েকজনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপের নিচে ঢাকা পড়া বুদ্ধ ও তাঁর ধর্ম আধুনিক বাঙালি তথা ভারতবাসীর কাছে আত্মপ্রকাশ করল।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দিকে বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকালে দেখা যায়, কবিরা গৌতম বুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে যতটা নাড়াচাড়া করেছেন, অন্যান্য ধারার লেখকরা ততটা অগ্রসর হননি। একটু পরিসংখ্যানগত তথ্য পেশ করি। উনিশ শতকে নবীনচন্দ্র সেন অন্তত একটি কাব্য লিখলেন 'অমিতাভ' নামে। তাঁর সমকালে রামদাস সেন লেখেন 'শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়'। সময়ের হিসেবে এরপর রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর চেতনায়, মননে, দর্শনে বুদ্ধের প্রভাব চিরজাগরূক ছিল। তথাগতের মানবতাবাদী ধর্ম, সকল জীবের প্রতি মহানুভবতা, প্রেম-মৈত্রী-করুণার আদর্শ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর মতো মহৎ স্রষ্টার লেখনী থেকে বুদ্ধ-সম্পর্কিত যে সব রচনা নির্গত হয়েছে তার সমতুল রচনা আগে-পরে খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। সবাই জানেন, 'কথা ও কাহিনী'র আট-দশটি কবিতায় বুদ্ধপ্রসঙ্গ নানা

বিভঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। এছাড়া জন্মদিনে, নবজাতক, পরিশেষ প্রভৃতি কাব্যের কোন কোনো কবিতায় চকিতে স্পর্শ করে গেছেন সেই পরম কারুণিককে। রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিকেরা বিভিন্ন কবিতায় স্মরণ করেছেন অহিংসা, ত্যাগ ও সেবার প্রতীক বুদ্ধকে। রবীন্দ্র-পরবর্তীদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের কবিতাতেও করুনাঘন তথাগত মূর্ত হয়ে উঠেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালে বাংলা আধুনিক কবিতার আর একটা যে পর্ব শুরু হল, সেখানেও এ ধারা রইল অব্যাহত। কল্লোলযুগের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'র মতো কবিতা। এই একই শিরোনামে কবিতা লেখেন 'কাস্তে-কবি' দিনেশ দাস। ব্যাপ্ত ইতিহাস চেতনায় খুব আলতোভাবে জীবনানন্দ ছুঁয়ে যান বুদ্ধকে। অমিয় চক্রবর্তী, নরেন্দ্র দেব, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, অরুণ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী, রাম বসুর মতো আরও অনেক সাম্প্রতিক কালের কবি শান্তির বার্তাবাহী গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে কেউ গোটা, কেউ কবিতার চূর্ণাংশ রচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় শাক্যমুনি তত চর্চিত নন। ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকরা অনেক বিষয়ে দৃকপাত করলেও সরাসরি গৌতম বুদ্ধকে উপজীব্য করে কিছু লেখেননি। এক্ষেত্রে একমাত্র ব্যতিক্রম হলফিলের লেখিকা বাণী বসু। তাঁর 'মৈত্রেয় জাতক' এ বিষয়ের একতম দৃষ্টান্ত। আর বুদ্ধকে নিয়ে নাটক লেখায় প্রথম এগিয়ে আসেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর লেখা জীবনী নাটকগুলির মধ্যে একটি হল 'বুদ্ধদেব চরিত'। সরাসরি বুদ্ধ-প্রসঙ্গ নয়, তবে বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' ও 'চণ্ডালিকা'য়। এই ধারাতেই লেখা হয়েছিল মন্মথ রায়ের 'রাজপুরী' নামের একাঙ্কটি। আর তারপর দীর্ঘ কয়েক দশক পেরিয়ে গৌতম বুদ্ধের আলোকিত জীবন, প্রজ্ঞালব্ধ ব্যক্তিত্ব, তাঁর বাণী ও জনকল্যাণের আদর্শ নিয়ে লেখা হল সর্বার্থেই একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক 'তথাগত' – লিখলেন একালের শক্তিমান নাট্যকার অধুনা-প্রয়াত মোহিত চট্টোপাধ্যায়।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাট্যকার হয়ে ওঠবার আগে ছিলেন কবিতাকার। ১৯৫২ – ৬২ এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর কবিতা-যাপন। এই সময়টায় বেরুচ্ছে 'কৃত্তিবাস'। তিনিও সঙ্গ ধরবেন সুনীল-শক্তি-সন্দীপনের। ১৯৬৩ সাল। কলম ঘুরল ছন্দ থেকে সংলাপে। মোড় ঘুরল মোহিতের স্রষ্টা-জীবনের। 'কণ্ঠনালীতে সূর্য' লেখার পর তিনি আর ফিরবেন না তাঁর ছেড়ে আসা গলিতে। পাকাপাকি বাসিন্দা হবেন বাংলা নাট্যজগতের। তাঁর হাত দিয়েই একের পর এক বেরবে নীলরঙের ঘোড়া, বাইরের দরজা, গন্ধরাগের হাততালি, ক্যাপ্টেন হুররা, মৃত্যু সংবাদ-এর মতো অনেকগুলো কিমিতিবাদী নাটক।

লিখবেন আরো - লিখতেই থাকবেন, আর এইভাবে সংখ্যার গুনতিতে শতকিয়া পেরোবেন। সবশেষে থামবে তাঁর কলম 'তথাগত'-এ এসে — মৃত্যু থেকে মাত্র কয়েকমাস দূরে।

বাহ্যিক বিচারে 'তথাগত' একটি জীবনী-নাটক, সেই মানুষের জীবন অহিংসামন্ত্রের যিনি উদ্গাতা, সর্বজীবের প্রতি করুণা প্রদর্শনই যাঁর ধর্ম। যে ধর্মের সামাজিক উদ্দেশ্য 'বহুজন হিতায় চ বহুজন সুখায় চ'। কিন্তু কেবল কি সেই খ্রিস্টপূর্ব সময়ের ইতিহাসের কঙ্কালটাকেই ফিরিয়ে আনলেন মোহিত চট্টোপাধ্যায় তাঁর নাটকে? নাকি, এ নাটক রচনা করে ধরিয়ে দিতে চাইলেন আড়াই হাজার বছর পেরোনো এক মহান ব্যক্তিত্বের জীবনমুখী দর্শনের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা? এ প্রশ্নগুলোকে সামনে রেখে এবার নাটকটির ভেতরে ঢুকবো আমরা।

তথাকথিত জীবনী-নাটক হিসেবে যদি একে বিবেচনা করি, তাহলে দেখব যে, শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধের জীবনের সমগ্র তথ্যকে নাট্যকার ঘটনার নির্দিষ্ট সময়-বন্দি ফ্রেমে ধরেননি। ধরা এক অর্থে অসম্ভব এবং সম্ভবত অবান্তরও বটে। কেউই ধরেন না এমন করে, এমন কি সেলুলয়েডেও না। সত্যি সত্যি কোনো জীবনকে ধরা যায় না সেভাবে। জীবন বরং ধরা পড়ে নির্বাচিত ঘটনাপুঞ্জে, চয়ন করা কতকগুলি মুহূর্তে। বুদ্ধের জীবনের সে মৌহূর্তিক উদ্ভাসন এতে আছে এবং অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে আছে। তবে নাট্যকার রাজপুত্র সিদ্ধার্থের আরো কিছু টুকরো ছবি তুলে আনতে পারলে হয়তো জৈবনিক তথ্য আর একটু সম্পূর্ণতা পেত। আমরা দর্শক-পাঠক ইতিহাসের পটে গাঁথা গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম মঞ্চের পরিসরে মেলে ধরা মানুষটিকে।

এ নাটকের যবনিকা উঠছে যখন সিদ্ধার্থ তখন পরিপূর্ণ যুবক। তিনি বিবাহিত, এক সন্তানের পিতা। কিন্তু স্বেচ্ছায় সংসার পরিত্যাগ করে এসেছেন মহত্তর কিছু প্রাপ্তির জন্য। ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থ স্নিগ্ধ সুঠাম দেহকান্তি নিয়ে বোধিদ্রুমের তলদেশে উপবিষ্ট। তাঁর পরিচিত শ্রমণেরা আসেন। নিরীক্ষণ করেন মেদ-মাংসে পুষ্ট তাঁর সতেজ শরীর। উপবাসে ক্লিষ্ট শ্রমণেরা বিস্মিত হন। কেননা কিছুকাল আগে যিনি নিরতিশয় কৃচ্ছ্রসাধনায় শীর্ণ, শুষ্ক, বিবর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর শরীরে এত লাবণ্য এল কোথা থেকে? কৌতূহলী হয়ে সেকথা জিজ্ঞাসা করেন সিদ্ধার্থের সতীর্থরা। উত্তর মেলে :

সিদ্ধার্থ । অন্নই প্রাণ, মহানাম। যা না থাকলে, আর কিছুই নেই। অন্ন স্বব্বং, অন্ন প্রাণং।

ভদ্দীয় । তবে থাকো তুমি তোমার অন্নচিন্তা নিয়ে। আমরা এই মুহূর্তে ঋষিপত্তনের দিকে যাত্রা করছি। এমন ভোগসর্বস্বের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

মহানাম । যাকে সাগরতুল্য ভেবেছি, এখন দেখছি সে একবিন্দু শিশির মাত্র। ছিঃ! চলো।

এই অবজ্ঞা, অবহেলা আর প্রত্যাখ্যান দিয়েই শুরু হয় সিদ্ধার্থের ধর্মপথের যাত্রা। কিন্তু এই প্রত্যাখ্যানই হয়ে ওঠে শেষ অব্দি প্রত্যাবর্তনের সোনালি সড়ক। একদিন সিদ্ধার্থকে যারা 'ভোগসর্বস্ব' বলে ছেড়ে গিয়েছিল, পরে গৌতম 'তথাগত' হয়ে ফিরে এসেছেন তাদের কাছে। ঘটেছে তাঁর নবজন্ম। এই নবজন্মই তাঁর বোধিলাভ। পরম জ্ঞানের আকর বুদ্ধ হয়ে ওঠা। 'তথাগত' নাটকের ঘটনাগত বিস্তার রাজপুত্র সিদ্ধার্থের বোধিলাভের স্বল্পকাল আগে থেকে আশি বছরে তাঁর মহাপরিনির্বাণ লাভ। বৎসরের হিসেব ধরলে কম-বেশি পঞ্চাশ বৎসর। কেননা ইতিহাস বলছে, সিদ্ধার্থ তাঁর ২৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন এবং ৮০ বছর বয়সে কুশীনগরে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। একটি নাটকের আলোচনায় এ জাতীয় সন-তারিখের হিসেব অনেকের কাছে অবান্তর বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নাটকটি যদি হয় জীবনী নাটক তাহলে সেখানে পাঠকের প্রয়োজন থাকে প্রকৃত জীবনের সঙ্গে নাট্যায়িত জীবনের সঙ্গতি বা অসঙ্গতির দিকগুলিকে বুঝে নেবার। এ ধরনের নাটকে তথ্যবিভ্রাট থাকলে তা আখ্যানের প্রয়োজনে কতখানি অগ্রাহ্য করা যায়, তারও পর্যালোচনা হওয়া জরুরি। সেই কারণে এখানে খুব সংক্ষেপে গৌতম বুদ্ধের জীবনেতিহাস বলে নেওয়া প্রয়োজন, যাতে নাটকটির ঐতিহাসিক বাস্তবতা সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা গড়ে উঠতে পারে।

খ্রিস্টপূর্বে ৫৬৩ অব্দের এক বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে নেপালের লুম্বিনী বনে তাঁর জন্ম। পিতা শাক্যবংশীয় রাজা শুদ্ধোদন কপিলাবস্তুতে রাজত্ব করতেন। জননী মহামায়া ছিলেন কোলিয় নৃপতি অঞ্জনের কন্যা। সিদ্ধার্থের জন্মের পর মহামায়ার মৃত্যু হলে তাঁর ভগিনী মহাপ্রজাবতী গৌতমী তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। শোনা যায়, বিপত্নীক শুদ্ধোদন গৌতমীকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন। গৌতমীর সূত্র ধরে সিদ্ধার্থের অপর নাম গৌতম।

বাল্যকাল থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন দয়ালু প্রকৃতির। বিপন্নের জন্য তাঁর অন্তর সর্বদা ব্যথিত হত। রাজপুত্র হিসাবে কখনো কখনো মৃগয়া যাত্রায় তিনি আহূত হতেন। কিন্তু সে আহ্বানে সাড়া দিতেন না। কেননা নিরীহ প্রাণীদের হত্যা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। হত্যাকারীকেও মন থেকে ঘৃণা করতেন। বাল্যবয়সে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা দেবদত্ত যখন একটি পাখিকে শরবিদ্ধ করেছিল এবং পাখিটি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছিল, সিদ্ধার্থ তা দেখতে পেয়ে কাতর হন এবং তার শুশ্রূষায় যত্ন নেন। পরে দেবদত্ত এসে পাখিটিকে দাবি করলে দুইয়ের মধ্যে পাখির অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধে। পাখিটি শিকারীর, না পাখিটি রক্ষাকর্তার?

প্রাজ্ঞজনের বিচারে শেষ অব্দি সিদ্ধার্থের জয় হয়। সেই থেকে দেবদত্ত সিদ্ধার্থের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে।

ষোল বৎসর বয়সে সিদ্ধার্থের বিবাহ হয় দণ্ডপাণি নামে এক শাক্যবংশীয়ের কন্যা যশোধরা বা গোপার সঙ্গে। স্বয়ম্বর সভায় যশোধরা উপস্থিত যুবকদের মধ্যে সিদ্ধার্থকেই বেছে নেন। যদিও এতে দণ্ডপাণি খুব একটা খুশি হননি। বিবাহের কয়েক বৎসর পরে তাঁদের একমাত্র সন্তান রাহুলের জন্ম হয়।

সিদ্ধার্থ কী কারণে সংসার ত্যাগ করেছিলেন সে বিষয়ে বিভিন্ন উৎস বিভিন্ন কথা বলে। কেউ বলেন, তিনি একদিন তাঁর প্রিয় অশ্ব কন্থকের পিঠে চড়ে রাজপুরী পরিভ্রমণ কালে ব্যাধি-জরা-মৃত্যু ইত্যাদি দেখে ব্যথিত হয়ে মানবজীবনের সেই দুঃখসমূহ থেকে পরিত্রাণ খোঁজার জন্য রাজ্যসুখ ছেড়ে কঠিন কঠোর তপস্যার পথে বেরিয়ে পড়েছিলেন। আবার কেউ বলেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে তিনি গৃহত্যাগ করেন। রাজনৈতিক কারণটি ছিল রোহিণী নদীর জলবণ্টন বিষয়ে। শাক্য না কোলিয় – কোন রাজ্যের অধিবাসীরা রোহিণীর জল প্রথম ব্যবহার করবে এবং কতটা পরিমাণ করবে তা নিয়ে বিবাদের জেরে শাক্য সংঘ যখন যুদ্ধের প্রস্তাব দেয়, যুবক সিদ্ধার্থ তার বিরোধিতা করেন। তাঁর বক্তব্য, যুদ্ধ কোনো মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সমাধান নয়, বরং বিপুল ধ্বংসের কারণ। কিন্তু উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা গরিষ্ঠের দ্বারা সিদ্ধার্থের যুক্তি নাকচ হয়ে যায়। তাঁর নির্বাসন দণ্ড তিনি মাথা পেতে নেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।

গৌতমের ধর্মজীবনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল সে বিষয়ে ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু তথ্য পাওয়া যায়। গৃহত্যাগের পর ভরদ্বাজ মুনির কাছে সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষা পান। এরপর কপিলাবস্তু ছেড়ে পদব্রজে যাত্রা করেন মগধের দিকে। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁকে সংসারে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেন, কিন্তু জগতের দ্বন্দ্ব-কলহে বিব্রত মর্মাহত যে মানুষটি অপর শান্তির অন্বেষণে বেরিয়েছেন তিনি আর ফিরবেন কেন। তাই অবিচল চিত্ত গৌতম এবার চললেন বৈশালীর প্রখ্যাত ধর্মসাধক অরাড় কালামের কাছে ধর্মোপদেশ গ্রহণ করতে। পথে পড়ল ভৃগুমুনির আশ্রম। ভৃগু ছিলেন কৃচ্ছ্রসাধনায় সুপণ্ডিত। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে গৌতমের প্রাপ্তি ঘটল কৃচ্ছ্রসাধনার নিয়মকানুন ও তার ফলাফল। পরে বুঝলেন এ জাতীয় সাধনা সাধকের ব্যক্তিগত স্বর্গলাভের উদ্দেশ্যে, তাতে সমষ্টির লাভ নেই। তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে পৃথিবীতে জীবনের অশুভ বিষয়গুলিকে বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা এবং তার প্রকৃত সমাধান খুঁজে বের করা। সেই অন্বেষণে গেলেন অরাড় কালামের কাছে।

এই গুরুর কাছে সিদ্ধার্থের প্রথম শিক্ষা ছিল সাংখ্যদর্শনের। দ্বিতীয় শিক্ষা ধ্যানমার্গের, যার সপ্তম তথা শেষস্তরটি হল সমাধি। ধ্যানমার্গে আরও উঁচুতে ওঠার বাসনায়

এরপর তিনি গেলেন উদ্দক রামপুত্তের কাছে। তাঁর কাছে শিখলেন ধ্যানমার্গের চূড়ান্ত স্তর, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করে কীভাবে মনঃসংযোগ করতে হয়। এরপর শুরু হল গৌতমের আত্মপীড়ন। এর জন্য তিনি বেছে নিলেন গয়ার নিকটস্থ উরুবিল্ব স্থানটিকে। এইখানে পাঁচজন পরিব্রাজকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, যাঁরা তাঁর সাধনার সঙ্গী হলেন। স্বাভাবিক আহারকে প্রত্যাহার করার কারণে গৌতমের শরীর এত রুগ্ন ও দুর্বল হল যে, তাঁর পঞ্জরাস্থিগুলি বাইরে থেকে গোনা যেত। উদর অনুভব করতে গিয়ে হাতের মধ্যে শিরদাঁড়া ধরা পড়ত। এমন অবস্থায় তাঁর ছ'বছর কেটেছিল। কিন্তু তিনি তখনও কোনো জীবনসত্য উপলব্ধি করেননি। পরে তিনি নিজে নিজেই ভাবলেন, নির্লিপ্ততা পূর্ণজ্ঞান কিংবা মুক্তিলাভের জন্য এটি কোনো আদর্শ পথ নয়। শরীরের উপর পীড়ন চালালে দৈহিক শক্তির বিনাশ ঘটে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা শরীরকে ক্লান্ত করে – যা মনকে আত্মস্থ হতে দেয় না। সুতরাং সুস্থ ও একাগ্র রাখতে গেলে দেহের চাহিদার সম্যক তৃপ্তিসাধন দরকার। শরীর নয়, মনের চিন্তা-ভাবনাগুলি নিয়ন্ত্রণ করাই যুক্তিযুক্ত কাজ। এই সিদ্ধান্তের পর কৃচ্ছ্রতার পথ ছেড়ে গৌতম নিলেন মধ্যপথ। নিরঞ্জনা নদীতীরে উরুবিল্ব গ্রামের শ্রেষ্ঠী সেনানীর কন্যা সুজাতা-প্রদত্ত পায়েসান্ন ভক্ষণ করে আত্মপীড়নের সমাপ্তি ঘটালেন গৌতম। তাঁর পাঁচ সাধনসঙ্গী গৌতমের এই সিদ্ধান্তের কথা জানতেন না। তাঁর বিশুষ্ক শীর্ণ শরীরে লাবণ্যময় পরিবর্তন তাই তাঁদেরকে বিস্মিত করে এবং গৌতমকে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে উপহাস করে তাঁরা অন্যত্র চলে যান। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের ‘তথাগত’ নাটকের সূচনাবিন্দু গৌতম বুদ্ধের জীবনের ঠিক এই বিশেষ ঘটনা।

নাটকটির প্রথম দৃশ্যে ভদ্দীয় ও মহানামের সঙ্গে বাক্যালাপে গৌতম অন্নকেই ‘প্রাণ’ বলে নির্দেশ করেছেন, দেখতে পাই। কেননা দীর্ঘ কৃচ্ছ্রসাধনের পর তিনি উপলব্ধি করেছেন, অন্নই জীবনের চালিকাশক্তি – ‘যা না থাকলে আর কিছুই নেই।’ গৌতমের এই ভাবান্তর তাঁর সঙ্গীসাথীদের বিস্মিত করছে। এ তাঁরা আজ কী শুনছেন গৃহত্যাগী, রাজ্যত্যাগী, সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের মুখে? এ কি তাঁর অনুশোচনা, না চিত্তবিকার? যিনি কৃচ্ছ্রতার সকল কঠিন পথ অতিক্রম করেছেন, জেনেছেন আত্মদহনের পারমার্থিক সুখ, তিনি কিনা অন্নপ্রাণতা সপক্ষতা করছেন! বিরক্তি, ক্ষোভ, ঘৃণা উগরে দিয়ে চীবর পরিহিত পাঁচ শ্রমণ বারাণসীর ঋষিপত্তনের দিকে যাত্রা করেন সিদ্ধার্থকে পরিত্যাগ করে। আর পরম প্রশান্তি নিয়ে সিদ্ধার্থ কেবল তাঁদের উদ্দেশে বলেন : ‘চক্ষুষ্মান হও মিত্রগণ, তোমাদের চক্ষু উৎপন্ন হোক।’ ‘তথাগত’-র কাহিনি এই চক্ষুরুন্মীলনের নাট্য-আখ্যান। এর মেধাবী নাট্যকার সারা নাটক জুড়ে গৌতম বুদ্ধের পূত জীবন ও মানবতাবাদী দর্শনের উপস্থাপনার

ভিতর দিয়ে আমাদের দৃষ্টিকে উন্মীলিত করেছেন। এ নাটক কেবল একটি জীবনী-নাট্য নয়, একটি দার্শনিক নাট্য-আখ্যানও বটে।

সিদ্ধার্থের গৌতম বুদ্ধ হয়ে ওঠা আসলে দার্শনিক প্রত্যাভিজ্ঞার ফল। বৃহত্তর তাৎপর্যে, দর্শন মানে জীবনকে দেখার সমগ্র দৃষ্টি; পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে মননের দ্বারা বিশেষ রূপে উপলব্ধি। বেদের কাল থেকে গৌতমের সময় পর্যন্ত সে দার্শনিকতার চর্চা হয়েছে সেখানে বিশ্বপ্রকৃতির পিছনে খোঁজার চেষ্টা চলেছিল কোনো-না-কোনো অদৃশ্য শক্তিকে। ঈশ্বর, আত্মা, মুক্তি, মোক্ষ, পাপ-পুণ্য প্রভৃতির ধারণাও গড়ে উঠেছিল সে সময়। যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকর্ম দ্বারা প্রকৃতির নানা শক্তিকে উপাসনার মধ্যদিয়ে ধর্মপ্রত্যাশীরা ব্যক্তিগত সুখ লাভের চেষ্টাই করে গিয়েছেন। তাঁরা তাকাননি বাকি বিশ্বের দিকে, জগতের অনন্ত পার্থিব দুঃখের দিকে। তাঁদের সাধনা ছিল সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক ও স্বর্গমুখী। সিদ্ধার্থ এগুলির অসারতা বুঝতে পারলেন, তাই প্রত্যাখ্যান করলেন ঈশ্বর, আত্মা কিংবা ব্যক্তিমুক্তির ধারণা। দূরে ঠেললেন বর্ণাশ্রম, বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, কৃচ্ছ্রসাধনা, পৌরোহিত্যবাদ। পরিবর্তে তিনি উপলব্ধি করলেন জগতের প্রধানতম সমস্যা – মানুষের বাস্তব দুঃখ ও কষ্টকে। সুজাতার দেওয়া পায়েসান্ন গ্রহণ করে একটি বৃক্ষের তলে বসে মনন করতে করতে এই সম্যক বোধিতে (জ্ঞান) এলেন যে জীবের জীবনে দুঃখের অস্তিত্বই প্রথম আর্যসত্য। জন্ম দুঃখ, দেহের বৃদ্ধি দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, দুঃখ মৃত্যুতে। যা অকাম্য তার সঙ্গে মিলিত হওয়াও দুঃখের। প্রিয় বস্তুর সঙ্গে বিচ্ছেদের বেদনা গভীরতর দুঃখ। যা দুষ্প্রাপ্য তার আকাঙ্ক্ষা দুঃখ ডেকে আনে। সুতরাং জীবন দুঃখময়। প্রতিটি দুঃখের পিছনে রয়েছে কোনো-না-কোনো কারণ। অতএব দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হল সেই কারণগুলি সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা। এর আগে বেদনির্ভর চিন্তায় দুঃখগুলির পিছনে দৈব বা অদৃষ্টের প্রভাবকে দায়ী করা হয়েছিল, যা অলৌকিকতা-মণ্ডিত। সেই দুঃখ থেকে ত্রাণ পেতে কেউ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ যাগযজ্ঞ পূজা-হোম মন্ত্র-তন্ত্রাদির আশ্রয় নিতেন. কেউ ক্রিয়াহীন হয়ে সন্ন্যাস নিয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করতেন ব্রহ্মদর্শন করবেন বলে। সমাজের অবতলে পড়ে থাকা দুঃখী মানুষরা তাদের দুর্গতির জন্য দায়ী করত অদৃষ্টকে। গৌতম বুদ্ধই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রথম দার্শনিক যিনি অদৃষ্টবাদকে সরিয়ে প্রতিষ্ঠা ঘটালেন হেতুবাদের। জগতের সব কিছুকে ব্যাখ্যা করলেন কার্য-কারণের সূত্রে। কারণটি অদৃশ্য হলে কার্যরূপ ঘটনাটি আর থাকে না। সুতরাং উৎপত্তির মতোই অবসানও জগতের অপরিবর্তনীয় এক ঘটনা। এই সূত্র ধরেই গড়ে উঠল তাঁর প্রতীত্যসমুৎপাদতত্ত্ব, যা চারটি আর্যসত্যের ধারণা লাভে তাঁকে সাহায্য করল। দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুসরণ করলে দুঃখের পরিপূর্ণ নিবৃত্তি ঘটে – এই চারটি প্রধান উপলব্ধি গৌতম বুদ্ধের মহৎ অবদান। দুঃখের নিবৃত্তিই নির্বাণ। যে পথে দুঃখের নির্বাণ হয় তারই সন্ধান

দিয়েছিলেন শাক্যসিংহ। এই মহান জ্ঞানের আবিষ্কারক হিসেবে গৌতম বুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী বস্তুব ঘনিষ্ঠ এক দার্শনিক। মহাবোধি লাভের কারণে তিনি 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী বলে পরিচিত হন। কালক্রমে তিনি দেখা দেন বিশ্বের এক অনন্য শিক্ষাগুরু হিসেবে।

কোনো পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নিয়ে নাটক রচনার আয়োজন তখনই সফল হয়ে ওঠে, যখন নাট্যদৃশ্যের মধ্যদিয়ে সে ব্যক্তিত্বকে সমগ্রভাবে স্পর্শ করা যায়। অথচ লম্বা একটা জীবনে, জীবনের বহুকৌণিকতাকে বাঁধা সময়ের ফ্রেমে আটকে রাখতে গেলে সমস্যা আসে নানা দিক থেকে। নাট্যকারের কাছে এটা একটা চ্যালেঞ্জ, শিল্পগুণ অক্ষুণ্ণ রেখে তিনি কতটা বলবেন, অথবা বলবেন না। তাছাড়া পুরাণ কিংবা ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনা তো কেবল চেনাগল্পের পুনঃকথন হতে পারে না। একালের নাটকের কাছে আজকের দর্শক-পাঠকের প্রত্যাশা অনেক। সে চায় চেনা আখ্যানকে কেউ উপস্থাপন করুক সাম্প্রতিকের অনুষঙ্গে। এই যে পরিচিত আখ্যানের আড়াল দিয়ে অচেনা কিংবা সদ্যতন সময়ের কোনো ভাবনাকে ব্যক্ত করা, তাতেই ঘটে পুরাণ কিংবা ইতিহাসের পুনর্জন্ম। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের হাতে এমনই নবজন্ম ঘটেছে গৌতম বুদ্ধের, তাঁর সময়কালের প্রাচীন ইতিহাসের। কিংবা বিপরীত পক্ষে, 'তথাগত' নাটকে নাট্যকার তাঁর নিজের সমকাল ও তার সমস্যাকে আড়াই হাজার বছর আগের ইতিহাসের ধূসর পাতায় গেঁথে দিয়েছেন তির্যকভাবে এবং অত্যন্ত শিল্পসঙ্গত ভঙ্গিমায়।

কথাটা যে একটুও অতিরঞ্জিত করে বলা নয়, তার প্রমাণ এ নাটক রচনার সময়পর্বে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। 'তথাগত' ২০১২-তে লেখা শেষ হলেও নাট্যকার এর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন তার বছর দুয়েক আগে। ততদিনে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত। কণ্ঠনালীতে সেই মারণরোগের সংক্রমণ। তবুও জীবনের আয়ুশেষের প্রহরগুলিতে তিনি তাঁর সৃজনীসত্তাকে উজাড় করে দিয়ে এঁকে গেছেন প্রেম-মৈত্রী-করুণার জীবন্ত বিগ্রহ ভগবান বুদ্ধকে। তথাগত তাঁর সমকালে ও পরবর্তী এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় ধরে আর্ত, বিপন্ন, নির্যাতিত মানুষের কাছে হয়ে উঠেছিলেন ঈশ্বরকল্প এক ব্যক্তিত্ব। মোহিতবাবু কিন্তু তাঁকে ঈশ্বররূপে দেখেননি, দেখেছেন মহামানব রূপে। কেননা নাট্যকার ব্যক্তিজীবনে নিজেই ছিলেন একজন নিরীশ্বরবাদী। যতটুকু তাঁকে দেখেছি, বারুইপুরে তাঁর নিকট প্রতিবেশি হিসেবে, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁর কখনো আস্থা ছিল না। তার চেয়ে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেই তিনি বোধহয় ঈশ্বরের স্বয়ংপ্রকাশ বলে মনে করতেন। সেজন্য মানবতাবাদী দর্শনে তাঁর পরিপূর্ণ বিশ্বাস তৈরি হয়েছিল। ছিল সামাজিক সাম্যে আস্থা। মানতেন না জাতিভেদও। রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে তিনি সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ উপাসক। সেজন্য সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস পোষণ

করতেন। বামপন্থী মিছিলে পা না মেলালেও তিনি ছিলেন বামপন্থী রাজনীতির সমর্থক। [তার] দর্শনের প্রতি নিষ্ঠা থাকলেও নেতৃত্বের প্রতি সবক্ষেত্রে অন্ধ আনুগত্য দেখাননি। এ [ব্যাপারে] তিনি নিজের বুদ্ধি, বিবেচনা ও বিবেকের দ্বারা চালিত ছিলেন। সেজন্য প্রয়োজনে [বিগত] বাম সরকারের কঠোর সমালোচনা করতেন কখনো সখনো। সবাই জানেন, বিগত [সাত-আট] বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য-রাজনীতি নানা কারণেই উত্তাল। 'কৃষি আমাদের ভিত্তি, [শিল্প] আমাদের ভবিষ্যৎ' – এই শ্লোগানের ওপর ভর করে রাজনীতির নীতি-নির্ধারকেরা [যেভাবে] চলবার চেষ্টা করেছিলেন, তা আমজনতার সর্বাংশ মেনে নিতে পারেনি। এর ফলে [শিল্পের] জন্যে জমি অধিগ্রহণের সূত্রে কৃষকদের সঙ্গে সরকারপক্ষের সংঘর্ষ বেঁধেছে। চলেছে [লাঠি,] গুলি-বোমা-বন্দুক, ঝরেছে রক্ত। সেই আন্দোলন, রক্তপাত, হত্যা, মৃতদেহ নিয়ে [পাল্টা] রাজনীতিও হয়েছে। এমনকি জমি আন্দোলনের সূত্র ধরে তৎকালীন বিরোধী দল [বর্তমান] প্রশাসন-ক্ষমতা অধিকার করেছে। সাধারণ মানুষ থেকে নানাস্তরের নেতা, মন্ত্রী, [সুধী] সমাজ তাঁদের মতো করে এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, নিজেদের [মতাদর্শ] কিংবা অবস্থান অনুযায়ী পক্ষে-বিপক্ষে গিয়েছেন। এই সমস্ত জ্বলন্ত বাস্তবের ওপর দিয়ে [হেঁটে] গিয়েছেন মোহিত চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি তো শুধু অধ্যাপক-কবি-নাট্যকার নন, [একজন] সংবেদী নাগরিকও। শিল্পকে তিনি কেবল উপভোগের সামগ্রী হিসেবে দেখেন না। [যথার্থ] মার্কসিস্টের মতো সাহিত্য তাঁর চোখে সমাজবদলের অন্যতম হাতিয়ার। [অন্যত্র] সেরকমভাবেই লেখা হয়েছে তাঁর অন্যান্য নাটক। একজন সমাজ-সচেতন শিল্পীর [কলম] তাঁর হাতে। এর আগে তাঁর প্রতিটি নাটকই কোনো-না-কোনোভাবে ছুঁয়ে গেছে [প্রচ্ছন্নভাবে] রাজনীতি, মানুষ, সমকাল। আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার এক [ঐতিহাসিক] গৌরবময় ব্যক্তিত্ব গৌতম বুদ্ধের জীবনকে নাটকের উপজীব্য হিসেবে বেছে নেওয়ার [পিছনে] তাঁর এমনই কোনো সামাজিক তাগিদ কাজ করেছিল বলে মনে করি। সেই [অতীত] ইতিহাসের ধূসর প্রচ্ছদের আড়ালে হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন কোনো সমাজ-[বাস্তবতাকে।] তাঁর প্রখর শিল্পদৃষ্টিতে হয়তো ধরা পড়ে গিয়েছিল সার্ধ-দ্বিসহস্রাব্দ পূর্বের ধূসর [ইতিহাসের] চূর্ণ কিছু ঘটনা, চরিত্র, ভাবনার সঙ্গে এসময়ের কোনো কোনো সমস্যার নিবিড় [ঐক্য ও] সাদৃশ্য। সর্বোপরি, যন্ত্র ও প্রযুক্তি-কবলিত বিশ্ব দ্রুত যেভাবে আত্মকেন্দ্রিক, [ভোগসুখসর্বস্ব] হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, হিংসা আর বর্বর সন্ত্রাসবাদের শিকার হয়ে প্রতিদিন নিরীহ মানুষের [তাজা] রক্তে রঞ্জিত হচ্ছে কোনো-না-কোনো দেশের মাটি তখনই তো তাঁকে সবচেয়ে [বেশি] প্রয়োজন যিনি সংকীর্ণ স্বার্থ, জাত-পাত, হিংসা, অসূয়াকে বলি দিয়েছেন বৃহতের [সাধনায়।] সময়ের এই অসুখ নিরাময়ে শুভচেতনায় ঋদ্ধ নাট্যকার বেছে নিয়েছেন প্রেম ও [করুণা,] অহিংসা ও মৈত্রীর মূর্ত প্রতীক পরম কারুণিক গৌতম বুদ্ধকে। যাঁর উদ্দেশে [আধুনিক]

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'Lord Buddha.. whom I regard in my inmost being as the greatest man even born on this earth.' বিশ্বমানবতার সেই সেরা অভিজ্ঞান গৌতম বুদ্ধকে সন্ত্রাস-কবলিত পৃথিবীতে, কূট রাজনীতির দ্বন্দ্বেও মথিত ভারতবর্ষে, 'আমরা-ওরা' বিভাজনে দীর্ণ পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে নামিয়ে এনে যে সকল ক্ষুদ্রতা-নীচতা-তুচ্ছতা-হিংসা-স্বার্থপরতা-ভোগপরায়ণতার বিরুদ্ধে এক শুভৈষী নাট্যকার অনন্য মানবিক আদর্শ স্থাপন করবেন – এতে আর বিস্ময়ের কী। সৎ লেখক-শিল্পী মাত্রেই মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষী, সুন্দরের উপাসক, সত্যের পূজারি। 'তথাগত' নাটক সাহিত্যিক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই শুভ হৃদয়বৃত্তির শ্রেষ্ঠ সারস্বত অভিজ্ঞান এবং একই সঙ্গে তা তাঁর নাট্যকার জীবনের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার তীর্থশেষে লব্ধ অমৃতের এক অনুপম পরমান্ন।

মোট উনিশটি দৃশ্যে বিভাজিত এ নাটক। নাটকটিতে গৌতম বুদ্ধের পূর্ণালোকিত জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালপর্বটিকে তুলে ধরা হয়েছে, যে অংশে তিনি কৃচ্ছ্রসাধনার পথ পরিহার করে জগতের পরম জ্ঞান লাভের মাধ্যমে জ্ঞানী তথা 'বুদ্ধ' হয়ে উঠেছেন; দিকে দিকে তাঁর ধর্মাদর্শ প্রচার করছেন; দলে দলে সাধারণ মানুষ এসে তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করছে; তিনি তাদের নিয়ে বৌদ্ধ সংঘ গড়ে তুলেছেন; দেশের রাজনৈতিক শক্তিগুলিকেও তাঁর অহিংস ধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত করছেন; তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন প্রজাকল্যাণের আদর্শ এবং সবশেষে সংঘ পরিচালনার ভার বিশ্বস্ত অনুগামীদের উপর ন্যস্ত করে ধীরে ধীরে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিচ্ছেন। এই স্থূল কাহিনি-কাঠামোর মধ্যে নাট্যকার আরো নানা কথার মেদ-মাংস সংযুক্ত করে ভরে তুলেছেন এর অবয়বিক শূন্যতা। সব মিলিয়ে, 'তথাগত' একটি সার্থক জীবনী-নাটক হয়ে ওঠার সকল সম্ভাবনায় দীপ্ত এক রচনা।

এবার আসা যাক এর বৃত্ত ও চরিত্র-কেন্দ্রিক সংক্ষিপ্ত কিছু পর্যালোচনায়। প্রথম দৃশ্যটি মূল নাট্যবিষয়ের উন্মোচক হিসেবে কিছুটা আকস্মিক হলেও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। সিদ্ধার্থের জীবনে এই সেই বিশেষ মুহূর্ত যখন তাঁর সঙ্গী শ্রমণেরা তাঁকে ভোগসর্বস্ব ভণ্ড তপস্বী জ্ঞানে পরিত্যাগ করে যাচ্ছেন। সিদ্ধার্থ কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্তে অনড় অটল। তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা প্রতিপাদক এ আখ্যান। এই স্থৈর্য্য তাঁর সমগ্র জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তিনি একান্তে পেয়েছেন সেই সত্যের সন্ধান যা স্বেচ্ছাবৃত আত্মদহনের দুঃখকে পরিহার করে জীবনযাপনে মধ্যমপন্থা (মজ্‌ঝিম) গ্রহণে উৎসাহিত করে। তিনি অনন্যাপেক্ষী। এরপর স্বর্ণথালে পায়েসান্ন হাতে সুজাতার প্রবেশ ঘটে। সুজাতা ও তার দাসী পূর্ণার ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তিনি যেন হয়ে ওঠেন বৃক্ষদেবতা। সম্যক ধ্যানের ক্ষেত্রে বাধাদানকারী ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য গৌতম সাদরে

গ্রহণ করেন সুজাতার অযাচিত দান। পুরুষের কঠোর সাধনায় নারীর যে সেবা সাহচর্য তথ্য তার ইতিবাচক ভূমিকা আমরা বারেবারেই দেখেছি, এ যেন তারই পুনরাবৃত্তি। গৌতম চিরকাল স্মরণে রেখেছিলেন সুজাতার এই অন্নদানকে। তাঁর বোধিলাভের এই স্ব পূর্বপ্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতিতে সম্পূর্ণতা দিল দরিদ্র শ্রমজীবী ঘেসেড়া সোণ্ডিয়। আট মুঠো তৃণ দিয়ে গৌতমের ধ্যানের কোমল আসন গড়ে তুলতে সে সাহায্য করল। পরিবর্তে সে পেল সুজাতার রেখে যাওয়া স্বর্ণপাত্রটি। এতে সোণ্ডিয় বিস্মিত, অভিভূত। কিন্তু তাকে বিস্মিত করার জন্য যে এ দান নয়, সিদ্ধার্থ বুঝিয়ে দিলেন তাকে :

সিদ্ধার্থ । এ বস্তু নিয়ে আমি কী করবো? তুমি না নিলে এ পাত্র আমি
নৈরঞ্জনা নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

সত্যই তো, সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মণিকাঞ্চনে কোন প্রয়োজন। বরং তা কাজে লাগবে একজন দরিদ্র গৃহস্থের, এ দিয়ে হয়তো তার কষ্টের সংসারের কিছু সুরাহা হবে। এই বাস্তববুদ্ধি ও মানবিক সহানুভূতি করুণাঘন বুদ্ধকে চিরদিন চালিত করেছে। তিনি পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দুর্গত আর্তের। নাট্যকারের আর একটু বোধ হয় বাকি ছিল সোণ্ডিয় চরিত্রের উপস্থিতি থেকে গৌতমের চরিত্রগুণ নিংড়ে নেবার। সিদ্ধার্থ তাকে অনুরোধ করেন তার হাতটি তাঁর মাথায় ওপর রাখতে। চমকে ওঠে সোণ্ডিয়, কুঁকড়ে যায় তীব্র কুণ্ঠায়। সে যে চণ্ডাল! অস্পৃশ্য। সুদর্শন এক সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করবে কোন স্পর্ধায়! নিরতিশয় ভয়ে পালিয়ে যায় সে। সিদ্ধার্থ সেদিকে তাকিয়ে করযোড়ে প্রণাম জানায়। গৌতম বুদ্ধ যে জাতিবর্ণের ভেদ অস্বীকার করতেন এই খণ্ডদৃশ্য তো সেদিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এরপর শুরু হয় ধ্যানের উত্তুঙ্গমার্গে বিচরণশীল সিদ্ধার্থের চরম সাধনা : *মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।*

দ্বিতীয় দৃশ্যে আসে মার। সে রিপুশক্তির অধীশ্বর। ধ্যানী সিদ্ধার্থকে আসন থেকে বিচলিত করার জন্য তার সঙ্গিনী হয় লাস্যময়ী তিনটি নারী। তন্বী দেহে লীলায়িত ভঙ্গি তুলে সাধককে প্রলুব্ধ করতে চায় তারা। কিন্তু মার হুঙ্কার ছেড়ে সিদ্ধার্থের ধ্যানভঙ্গ করতে চাইলেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। বলা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে, বুদ্ধের জীবনচরিতে মারের আবির্ভাব আসলে এক ধরণের রূপক উপস্থাপনা। নাট্যকার একে দেখিয়েছেন সিদ্ধার্থের ভিতরকার পঙ্কিল প্রবৃত্তির জান্তব মূর্তি হিসেবে। সব মানুষের ভিতরেই রয়েছে এই মারের কুটিল অবস্থান। যে প্রলোভিত করে, ভয় দেখায়, শুভ চেতনাকে গলা টিপে হত্যা করে আমাদের বোধিকে মেরে ফেলে। কিন্তু সিদ্ধার্থ তাঁর সংকল্পে অনড়, অটল। সুতরাং মার ব্যর্থ, নিরাশ হয়ে ফিরে চলে যায়। অবশেষে সিদ্ধার্থ লাভ করলেন পরমজ্ঞান, 'বোধি'। বৈশাখী পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত ধরিত্রীকে প্রণাম করে তিনি বললেন তাঁর এই অপূর্ব

উপলব্ধির কথা :

"হে মাতা ধরিত্রী, আমার সম্মুখে এই দুর্লভ মুহূর্তে কেউ উপস্থিত নেই – কেবল তুমিই রয়েছো – একমাত্র জাগ্রত সাক্ষী। তোমাকে স্পর্শ করে বলছি, তুমি শোনো, এই বুদ্ধপূর্ণিমায় নিশান্তে, এইমাত্র আমি বুদ্ধরূপে উদিত হলাম। আমার মহাজ্ঞান প্রস্ফুটিত হয়েছে। আমি আর শ্রমণ সিদ্ধার্থ নই, আমি বুদ্ধ। হে মাতা, পূর্বে যাঁরা মহাজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ হয়েছিলেন, আমি তাঁদের পথ ধরেই এসেছি। আমি তথা থেকে এসেছি, তাই আমি তথাগত। আমি সত্যকে সম্যকভাবে চিনেছি, তাই আমি সম্যক বুদ্ধ। আমার চিত্ত সম্পূর্ণরূপে বিকশিত, তাই আমি জাগ্রত। আমার চারদিক থেকে অন্ধকার সরে গেছে, তাই আমি আলোকিত। আমি নির্বাণের মহাসুখ অনুভব করছি – নিব্বানং পরমং সুখং।"

শ্রমণ সিদ্ধার্থের বুদ্ধ তথা তথাগত হয়ে ওঠার অপূর্ব রহস্যটি এভাবে নাট্যপটে ধরেছেন শিল্পকুশলী নাট্যকার। দৃশ্যশেষের আগে আরও একবার মারের প্রবেশ ঘটে। সে এসে জেনে যায়, এভাবে প্রবৃত্তির হাত থেকে বুদ্ধ একাই মুক্ত হবেন না, এরপর সংঘ গড়ে সেই পথে দলে দলে নিয়ে আসবেন যত যন্ত্রণাকাতর মানুষকে, শোনাবেন তাদের দুঃখ থেকে চিরমুক্তির উজ্জীবনী মন্ত্র। নাট্যকার পরবর্তী কয়েকটি দৃশ্যে করেছেন তারই সুনিপুণ আয়োজন।

যারা একদিন নিরতিশয় ঘৃণা ও অবজ্ঞায় দূরে সরে গিয়েছিল, তাদের চোখে বোধিলাভে স্বস্থ গৌতম এবার অন্যভাবে প্রতিভাত হলেন। সেই পঞ্চশ্রমণ প্রবুদ্ধ গৌতমের মধ্যে আবিষ্কার করলেন স্বর্গীয় প্রশান্তি, কমনীয় স্নিগ্ধতা, মহাপুরুষ হয়ে ওঠার বত্রিশটি দুর্লভ লক্ষণ। বুদ্ধ তাদেরকে জানালেন তাঁর অনন্য তপস্যার কথা, সিদ্ধির কথা, আর ব্যাখ্যা করলেন তাঁর উপলব্ধ নতুন দর্শন। এই দর্শনে কার্যকারণতত্ত্বকে দেওয়া হয়েছে মূল্যবান স্থান। এ দর্শন দাঁড়িয়ে আছে চারটি সত্যের উপর। প্রথম তিনটি তাত্ত্বিক ধারনা, আর চতুর্থটি দুঃখনিবৃত্তির উপায় বলেই অনুশীলননির্ভর। দুঃখ নিবৃত্তির পথ হিসেবে বুদ্ধ ঘোষণা করলেন পঞ্চশীল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও দশটি পারমিতা। হত্যা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার ও মদ্যপান না করা – এই হল পঞ্চশীল। অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হল – সৎ দৃষ্টি, সৎ বাক্য, সৎ কর্ম, সৎ সংকল্প, সৎ জীবিকা, সৎ ব্যায়াম, সৎ স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এছাড়া রয়েছেন দশটি পারমিতা। সেগুলি যথাক্রমে - শীল, দান, উপেক্ষা, ক্ষেম, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, করুণা ও মৈত্রী। বুদ্ধ তাঁর সহযোগী শ্রমণদের আরও জানালেন জীবনযাপনে মধ্যপন্থানুসরণের কথা। মধ্যপন্থা হল অতি কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন ও অতি শিথিল ভোগলিপ্ত জীবনের মধ্যবর্তী পথ, যা নির্বাণ লাভের সেরা সরণী। তাঁর এ মানবমুখীন ধর্ম বেদাচার মানে না, মানে না জাতিভেদ, অস্বীকার করে পুরাণের ঈশ্বরবাদ, অদৃষ্টবাদ, কর্মফলবাদ

কিংবা শূদ্র ও নারীর প্রতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা শাস্ত্রানুশাসন। পুরাণ কাশ্যপ, পাকুধ
কচ্চায়ন, মখ্খলি ঘোষাল, অজিত কেশ কম্বলিন, সঞ্জয় বেলটিপুত্ত, নিগন্থ নাথপুত্তদের মতো
পূর্বের ধর্মপ্রবক্তাগণের দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে বুদ্ধ সেগুলিকে বর্জন করেছেন। তাঁর ধর্ম
দণ্ডায়মান ত্রিশরণের উপর – বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘ। আর সবচেয়ে বড় কথা, এ ধর্ম কখনো
কেবল নিজের মুক্তি অন্বেষণ করে না, চায় জগতের সর্বজীবের আন্ত্যন্তিক দুঃখের বন্ধন
থেকে চিরমুক্তি। এইভাবে বুদ্ধ তাঁর উদার মতাদর্শ পূর্বের ধর্মসঙ্গীদের কাছে প্রকাশ করার
পর কোজন্য তাঁর কাছে প্রথম শিষ্যত্ব লাভ করলেন। তাঁকে উপসম্পদা প্রদান করে তিনি
জানালেন ঋষিপত্তনের এই মৃগদাব থেকে শুরু হবে তাঁদের ধর্মপ্রচার। সেই প্রচারের
অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে তথাগতের দ্বারা প্রবর্তিত হল ধর্মচক্র – যা দুর্দমনীয়, অভেদ্য,
সর্বত্রগামী। একই সঙ্গে শুরু হল বৌদ্ধ ধর্মসংঘের পত্তন, সেখানে হাজার হাজার দীক্ষাপ্রাপ্ত
শ্রমণেরা অবস্থান করবেন।

এরপর বুদ্ধ ও তাঁর পাঁচ শিষ্য গেলেন মগধের রাজধানী রাজগৃহে। সেখানে তখন
রাজত্ব করছেন ধার্মিক রাজা বিম্বিসার। বিম্বিসারের হৃদয়টি স্ফুটনোন্মুখ পদ্মের মতো।
ভগবান বুদ্ধের চরণস্পর্শ লাভে তিনি আনন্দিত, ধন্য। বুদ্ধের এই ধর্মমত তাঁর কাছে অত্যন্ত
হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এর আশ্চর্য সরলতায়, সাধনপথের অনাড়ম্বরতায়। যে
উপাচারহীন ধর্মে মানুষ নিজের চেষ্টায় মহত্ত্বে উন্নীত হতে পারে, করতে পারে অপরের দুঃখ
দূর – তার চেয়ে মহান আর কী হতে পারে। নাট্যকার এই অংশে অবতারণা করেছেন সেই
প্রশ্নের, যেখানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মৌল পার্থক্যগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে। রাজা
বিম্বিসার প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে জেনে নিচ্ছেন এই জরুরি তথ্য যে, শ্রেণিস্বার্থ রক্ষাকারী
ব্রাহ্মণরাই সমাজকে ভাগ করেছেন চারটি শ্রেণিতে। থাক-বিন্যস্ত এই সমাজব্যবস্থায়
বর্ণবৈষম্যের কারণে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত শিথিল হয়ে গেছে। সবচেয়ে নীচে
পড়ে থাকা শূদ্ররা সর্বাধিক দুর্গতি ভোগ করে এসেছে এতদিন। কেননা কর্ম নয়, জন্মের
পরিচয়ই সেখানে বড়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধসংঘে জাতিভেদ প্রথার শোষণ ও বঞ্চনার স্থান নেই
কোথাও। সব ভিক্ষু সেখানে সমান। কর্মই শ্রমণদের একমাত্র পরিচিতি। অস্তিত্ব নেই সাকার
কিংবা নিরাকার ঈশ্বরেরও। এই সংঘের একটাই মুখ্য সম্পাদ্য – দুঃখ বিনাশের উপায়গুলি
ব্যবহার করে দুঃখতাপিতদের চিরপরিত্রাণ করা। লক্ষণীয়, নাট্যকার তাঁর নাটকের তৃতীয় ও
চতুর্থ দৃশ্য দুটি প্রধানত ব্যয় করেছেন বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি, আদর্শ ও চরিত্রকে তুলে ধরার
জন্য। গৌতম বুদ্ধের জীবন ও তাঁর ধর্মপ্রচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এগুলি। কিন্তু অস্বীকার
করার উপায় নেই যে, পুরো বিষয়টাই ভীষণ তাত্ত্বিক, আর সেই কারণেই কিছুটা
নীরস। অথচ নাট্যকারের মেধাবী পরিকল্পনায় প্রশ্নোত্তরের কৌশলে গ্রন্থিত হওয়ায় নাটকের

গতিকে তা কোথাও দুর্বল করে না।

তবে এখানে একটা কথা বলার অপেক্ষা রাখে। ভারতীয় ধর্মের বিবর্তনের
ইতিহাসে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবের যে বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় পটভূমির কথা আমরা
জানি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অমানবিক অত্যাচার ও বৈদিক যাগযজ্ঞ, পশুবলি, আত্মনিগ্রহ
ইত্যাদি নানাবিধ আড়ম্বরের বিরুদ্ধে মানবতাবাদী ও সাম্যাবতার শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধের
প্রাতিস্বিক উত্থান, তা নাটকে আলাদা দৃশ্যের সংযোজনায় পরিস্ফুট হয়নি। অথচ এটা তো
ঘটনা যে, সেকালে হীনবর্ণ ও ঘৃণ্যবৃত্তির মানুষেরা এক টুকরো আত্মসম্মান ফিরে পাবার
কারণেই গোঁড়ামি-দুষ্ট হিন্দুসমাজ ছেড়ে দলে দলে বৌদ্ধ সংঘে সমবেত হয়েছিল।
ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধই ঘটান প্রথম সামাজিক বিপ্লব প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তিনিই ছিলেন বেদবিহিত ধর্মের শিকলি-কাটা প্রথম মানুষ, যাঁর
নেতৃত্বে সমাজের জল-অচল শূদ্ররা মানবত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে
পেরেছিল। একটুও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যদি এই প্রসঙ্গে দলিতের মুক্তিসূর্য ভারতরত্ন ড.
বাবাসাহেব আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের তথ্য উল্লেখ করি। বর্ণবাদী হিন্দুসমাজের নিরন্তর
অপমান, অবজ্ঞা, অত্যাচার থেকে নিজেকে ও কয়েকলক্ষ অনুগামী তফসিলিকে মুক্ত করার
জন্য তিনি অন্য কোনো ধর্ম নয়, সাম্যাদর্শের প্রতীক বৌদ্ধধর্মকেই তাঁর শেষ জীবনে বেছে
নিয়েছিলেন। এ ঘটনা তাঁর কাছে কোনো ধর্মান্তর ছিল না, ছিল সদ্ধর্মে 'প্রত্যাবর্তন'।
কেননা ইতিহাস-সচেতন আম্বেদকর জানতেন বৌদ্ধধর্মই সেই ধর্ম যা সাম্যবাদের নীতির
ওপর প্রতিষ্ঠিত, দলিত-শোষিত-বঞ্চিত-আর্ত-দুঃখী মানুষের একদা নিশ্চিন্ত অশ্রয়স্থল।
সুতরাং বৌদ্ধধর্মের এই সামাজিক বিপ্লবের দিকটি পরিস্ফুট করার জন্য শাক্যসিংহ
গৌতমের সঙ্গে বিরুদ্ধবাদী হিন্দু ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের ধর্মদর্শনকেন্দ্রিক বিরোধ কিংবা
পর্যালোচনার যদি একটি দৃশ্য সংযোজন করা যেত, তাহলে ধর্মের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকা
নাটকে আরও উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সম্ভাবনা তৈরি হত।

সিদ্ধার্থ বুদ্ধত্ব লাভের পর একবার কপিলাবস্তুতে এসেছিলেন – এ ঘটনা
ইতিহাসসিদ্ধ। তাঁর ধর্মাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন তাঁর পিতৃরাজ্যের অধিবাসীরা। দীক্ষা নেন
সদ্ধর্মেও। সিদ্ধার্থ-পুত্র রাহুলও ছিলেন উপসম্পদা প্রাপ্তির তালিকায়। ভিক্ষুণী হিসাবে সংঘে
যোগদান করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন গৌতমী ও যশোধরা। কিন্তু এই ধর্মীয় অনুষঙ্গের বাইরে
নাটকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ দৃশ্য আরও একটি তাৎপর্য বহন করে। প্রত্যাবর্তিত তথাগতের সঙ্গে
তাঁর পরিবার-পরিজনের এই সাক্ষাৎকার ভীষণ আবেগঘন দৃশ্যের জন্ম দেয়। গৌতমের মনে
পড়ে যায় তাঁর গৃহস্থাশ্রমের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি। পিতা শুদ্ধোদন ও পালিকা মাতা
মহাপ্রজাবতী গৌতমী কত যত্নে কীভাবে বড়ো করে তুলেছেন তাঁকে। কমপক্ষে দশ বছর

যশোধরার সঙ্গে যাপন করেছেন মধুর দাম্পত্য। জন্ম নিয়েছে তাদের একমাত্র সন্তান রাহুল, যে এখন সপ্তম বর্ষীয়। সুতরাং আজ সেখানে তাঁর ফিরে আসা উভয়পক্ষের মধ্যে ঘনীভূত করে বাৎসল্য ও দাম্পত্যপ্রেমে মাখা আবেগোদ্বেলিত কিছু মুহূর্ত। কিন্তু তবু স্মৃতিবেদনায় অন্তরে কাতর হয়েও গৌতম আত্মসম্বিত ও গাম্ভীর্য হারাননি। এ বংশের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি যে আজ রাজপুরীতে পদার্পণ করেননি, এ বোধ তাঁর আছে। একদা জন্ম-পরিচয়ে রাজপুত্র হলেও আজ তিনি কুলধর্মে ভিক্ষু, ভিক্ষান্ন সংগ্রহই তাঁর জীবিকা। তাঁর এই বাক্য পিতা শুদ্ধোদনের অন্তরে মর্মঘাতী শেলের মতো বিদ্ধ হলেও গৌতম ভ্রষ্ট হতে পারেন না তাঁর আদর্শ থেকে। সুতরাং আদর্শের সঙ্গে বাৎসল্যের একটা চাপা লড়াই এখানে আছে। আর আছে পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাতের মুহূর্তে গৌতমের অন্তরের গভীরে ক্ষীণ অপরাধবোধ। গৃহ পরিত্যাগের নিশীথে পত্নীকে কোনো বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি। এর একটা ব্যাখ্যা দেন বটে গৌতম, তবে যশোধরার দিক থেকে শুধু দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শোনা যায়। এরপর রাহুল এসে ছোট্ট হাত পেতে যখন তার পিতৃধন দাবি করে, তখন সৃষ্টি হয় সেই অপূর্ব স্নেহঘন মর্মবিদারী দৃশ্য, যার কোমল আবেগ সব কিছুকে ছাপিয়ে যায়। গৌতম তাঁর শিশুপুত্রকে সত্যিই দেন পিতৃধনের নিরঙ্কুশ অধিকার। রাহুল অচিরে চীবর পরিধান করে ধর্মসংঘে নবীন ভিক্ষু হয়ে যোগদান করে। গৌতমের দাম্পত্যের একটি বৃত্ত পূর্ণ হয়। অগ্রবর্তী দৃশ্যে আছে শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর গৌতমী ও যশোধরার সংসার পরিত্যাগ ও তথাগতের ধর্মপথ অনুসরণ। আর এভাবেই গৌতম বুদ্ধের ধর্ম পুরুষ-নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলের কাছে অবারিত হয়। প্রাচীন ইতিহাসের এমন জীবন্ত নাট্যরূপায়ণ অনেকদিনই দেখেনি বাংলার নাট্যমঞ্চ।

নাট্যতাত্ত্বিকরা বলেন, দ্বন্দ্বই নাটকের প্রাণ। 'তথাগত' নাটকে এই প্রাণস্বরূপ দ্বন্দ্বকে প্রথম থেকে সেভাবে খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম দৃশ্যে কৃচ্ছ্রসাধনে বিশ্বাসী পাঁচজন শ্রমণের সঙ্গে সিদ্ধার্থের আদর্শগত যে বিরোধ ঘটে তা ঠিক নাটকীয় দ্বন্দ্ব নয়। দ্বিতীয় দৃশ্যে মার-এর আবির্ভাবও একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, কিন্তু তাকেও যথার্থ নাট্যদ্বন্দ্বের মর্যাদা দেওয়া যায় না। কারণ বুদ্ধের মার-বিজয়ের মধ্যদিয়ে তার আপাত সমাপ্তি ঘটেছিল। তাছাড়া মার কোনো বাস্তব চরিত্রও নয়, সে আমাদের ভিতরকার পঙ্কিল সত্তার বাহ্যমূর্তি। পক্ষান্তরে, নাট্যরসিকরা সেই দ্বন্দ্বকেই প্রকৃত নাট্যদ্বন্দ্ব হিসাবে মর্যাদা দেন, যা ঘটনার নিজস্ব গর্ভ থেকে উৎপন্ন হয় এবং প্রধান চরিত্রের বিরুদ্ধে তীব্র এক নেতিবাচক শক্তির সংঘর্ষের ফল হিসাবে দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকে। দ্বন্দ্বের এই স্বরূপ বিচার করে নাটকের দেবদত্ত চরিত্রকে বরং সেই বিরুদ্ধ শক্তির আশ্রয় হিসেবে গণ্য করা যায়, যে স্বচ্ছন্দগামী শান্ত ঘটনাস্রোতের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘনীভূত করে তোলে জটিল দ্বন্দ্বের পঙ্কিল আবর্ত।

গৌতম বুদ্ধের বিরুদ্ধে তার ক্রমশ প্রবল হয়ে ওঠা কণ্ঠস্বর, সংঘের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির অপচেষ্টা, নিজস্ব অনুগামীদের নিয়ে ষড়যন্ত্রজাল বুনে চলা, এমনকি ক্রূর চক্রান্তের মাধ্যমে ধ্যানরত গৌতমকে হত্যা করার চেষ্টা করা – এই দ্বন্দ্বের ক্রমোচ্চ প্রকাশ হিসেবে গণ্য হতে পারে। খেয়াল রাখতে হবে, দেবদত্তের এই গৌতম-বিরুদ্ধতার সূচনা নাটকে নবম দৃশ্যে উপস্থাপিত হলেও তথাগতের একটি সংলাপ বুঝিয়ে দেয় এই বিরোধিতা আচমকা নয়। এর বীজ পোঁতা হয়েছিল তাদের বাল্যকালে একটি তিরবিদ্ধ পাখির অধিকার নিয়ে, যে প্রসঙ্গ পূর্বেই বলা হয়েছে। সেই ছোট্ট পাখির উপর অধিকারের অন্যায্য দাবি যেন আজ রূপ নিয়েছে সংঘের উপর কর্তৃত্ব করার অন্যায্য দাবিতে। একই সঙ্গে নাট্যকার এ প্রসঙ্গের ভিতরে অপূর্ব কৌশলে বুনে দিয়েছেন বুদ্ধের আর এক বিরুদ্ধ শক্তি মারের সংঘাতকে, যে ধ্যানাসনে অটল উপবিষ্ট সিদ্ধার্থের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যায়, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সুযোগ খুঁজতে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করার। মারের অশুভ শক্তি যে দেবদত্তের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, নবম দৃশ্যে মারের আকস্মিক আবির্ভাবে তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন নাট্যকার। যেন অশরীরী মার-এর মূর্তিমন্ত রূপ হল এই দেবদত্ত, যে প্রচণ্ড বিরোধিতা ও ব্যক্তি-হিংসার পথ ধরে বুদ্ধের সাধনা ও স্বপ্নকে বিনষ্ট করতে চাইছে। লক্ষ করলে এটাও দেখা যাবে যে, নাট্যকার খুব সূক্ষ্মভাবে দেবদত্তকে সপ্তম দৃশ্য থেকেই কুটিল ও সুযোগসন্ধানী চরিত্ররূপে উপস্থাপিত করার প্রয়াস পেয়েছেন, যখন সে কপিলাবস্তুর অন্যান্য ভিক্ষুর সঙ্গে বেনুবন বিহারে অবস্থান করছে। দেবদত্ত সহজ সিদ্ধির অভিলাষী। তাই অল্প কিছুদিনের শ্রমণবৃত্তি অবলম্বন করে তথাগতের কাছ থেকে লাভ করতে চাইছে অলৌকিক প্রদর্শন বিদ্যা, যা সাধকের অদ্ভুত ক্ষমতার নিদর্শন হিসেবে অন্যকে বিস্মিত ও প্রলুব্ধ করতে পারে। বৌদ্ধ সংঘ যে জাতিবর্ণহীন সাম্যনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দেবদত্ত বোধহয় সে নীতিরও বিরোধী। নইলে সে স্বার্থের প্রয়োজনে পূর্বাশ্রমে ক্ষৌরকার বলে পরিচিত উপালিকে তার শ্মশ্রু ও মস্তকমুণ্ডনের নির্দেশ দিত না। গৌতম ও অন্যান্য ভিক্ষুরা তাকে এ বিষয়ে সচেতন করে দেন। এতে বোধহয় হিতে বিপরীত হয়। দেবদত্ত সংশোধিত না হয়ে ক্রমশ আরও জটিল কুটিল প্রতিহিংসাময় চরিত্রে পরিণত হয়। এ নাটকের পরবর্তী অংশে অনেকগুলি দৃশ্য ও খণ্ডদৃশ্যের আয়োজন করা হয়েছে গৌতম বুদ্ধের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে দেবদত্তের উত্থানকে ঘিরে। আর তার উত্থানের একটি বিশেষ স্তম্ভ হিসেবে দেখা দিয়েছেন মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু তথা যুবরাজ কুনিয়।

যে সপ্তম দৃশ্যে দেবদত্তের কুটিল চরিত্রের উন্মোচক, সেই দৃশ্যের অপরাংশে মহাভিষক জীবকের উপস্থিতি ঘটিয়ে নাট্যকার কালোর পাশে আলোকে আরো বেশি উজ্জ্বল করে তুলেছেন। জীবক চরিত্রটি এ নাটকে এসেছে মূলত তথাগতের মানব-মহিমাকে

পরিস্ফুট করার আয়োজনে। তৎকালীন ইতিহাসে জীবকের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। তিনি অনন্যসাধারণ এক চিকিৎসক, মগধের রাজবৈদ্য। তাঁর নিদান অভ্রান্ত, চিকিৎসা অব্যর্থ। কিন্তু বৃত্তিতে সফল এই মানুষটির জীবনে রয়ে গেছে একটুকরো গাঢ় কালিমার প্রলেপন। সে তাঁর জন্ম-রহস্যে। মাতৃজঠর থেকে নির্গত হওয়ার পর জানেন না কী অপরাধে পরিত্যক্ত হয়েছিলেন পথের আবর্জনার স্তূপের মধ্যে। তাই তিনি অজ্ঞাতকুলশীল, জানেন না কারা তাঁর পিতা-মাতা। সেজন্য কম বেদনা নেই তাঁর মনে। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয় অবাঞ্ছিত তিনি, হয়তো গোপন লালসার অবৈধ অন্ধকার থেকে উৎপন্ন একটি অবাঞ্ছিত বীজ। এই চিন্তা তাঁকে প্রগাঢ় শূন্যতার মধ্যে নিক্ষেপ করে, আত্মধিক্কার জেগে ওঠে আত্মপরিচয়হীনতার কারণে। আর ঠিক এই জায়গায় এসে পৌঁছায় পরম কারুণিক তথাগতের কোমল সান্ত্বনার স্পর্শ, নরম বাণীর শুশ্রূষা। পরম মমতায় বোঝান তিনি আকুল, তপ্ত, অভিমানাহত জীবককে –

বুদ্ধ । দ্যাখো, কেউ যেমন ফেলে দেয়, আবার কেউ তুলেও নেই –
সব মানুষের উপর তুমি অভিমান করতে পারো না।

সত্যিই তো, জন্ম-পরিত্যক্ত জীবককে আসন্ন মৃত্যুর দরজা থেকে, সেই আবর্জনার স্তূপ থেকে তুলে এনেছিলেন রাজকুমার অভয়। স্নেহ দিয়ে আশ্রয় দিয়ে বড় করে তুলেছিলেন। নাম রেখেছিলেন জীবক। এই জীবককে এ নাটকের কয়েকটি বিশিষ্ট ঘটনার সঙ্গে, চরিত্রের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন নাট্যকার। তাতে কাহিনি আরও বিস্তার পেয়েছে, আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, ধরা পড়েছে জীবক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট চরিত্রের ভেতরকার স্বরূপ।

খুব গভীরভাবে ভেবে দেখলে দেখা যাবে, মোহিতবাবু জীবক চরিত্রটিকে কেবল গৌতম বুদ্ধ কিংবা অজাতশত্রুর চরিত্রকে স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য এখানে ব্যবহার করেননি, বর্তমানকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই চরিত্রে একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা গড়ে তুলতেও সচেষ্ট হয়েছেন। জীবক এ নাটকে কেবল প্রসিদ্ধ চিকিৎসক নন, রাজনীতিরও একটি বিশিষ্ট মুখ। শ্রেণি-পরিচয়ে জীবক বুদ্ধিজীবী। তাঁর সঙ্গে যেমন শাক্যসিংহের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, তেমনি খুব কাছ থেকে দেখেছেন অজাতশত্রুর মতো নির্বিবেক অস্থির-মস্তিষ্ক রাজ্যলোভী রাজপুত্রকেও। দেবদত্তের কূটকৌশলের সঙ্গেও তিনি সম্যক পরিচিত। এই অবস্থান থেকে জীবক নিরপেক্ষভাবে বিচার করেছেন সকলের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শ্রেয়-প্রেয়কে। যিনি বলেন জন্মের চেয়ে কর্মের পরিচয়ই বড়ো – মানবতাবাদী দর্শনের এত বড় প্রবক্তা মহাজীবনের অধিকারী গৌতম বুদ্ধের সরল নিষ্পাপ হিতকারী চরিত্র তাঁকে প্রবলভাবে মুগ্ধ করেছে; আর সেজন্যই পিতৃহন্তা, বিবেকের দংশনে অর্ধোন্মত্ত অজাতশত্রুকে নতুন করে বেঁচে ওঠার পথ দেখাতে দিক্‌ভ্রান্ত রাজকুমারকে টেনে এনেছেন ক্ষমাসুন্দর বুদ্ধের চরণতলে। অন্যদিকে সচেতন সাবধান করে দিতে চেয়েছেন ক্ষমতালুব্ধ দেবদত্তের

ক্রূর ষড়যন্ত্রের জালে বন্দি তথাগতকে। গৌতম বুদ্ধের আদর্শায়িত জীবনের নিরিখে এ নাটকে দেবদত্ত ও অজাতশত্রু কেবল বিপ্রতীপ অ্যান্টাগোনিষ্ট চরিত্র নয়, তাদের মধ্যদিয়ে নাট্যকার পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন ক্ষমতালুব্ধতার বিকারকেও। দেবদত্ত যেমন তার নখ-দাঁত বিস্তার করে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে বৌদ্ধসংঘের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, তেমনি দেবদত্তের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে অবিমৃশ্যকারী এক পিতৃহন্তায় পরিণত হয়েছেন কুমার কুনিয়। নীতির সঙ্গে দুর্নীতির দ্বন্দ্বে, আলোর সঙ্গে কালোর সংঘাতে বিবেকবান বুদ্ধিজীবীদের বিশেষ একটি ভূমিকা থাকে। তাঁরা স্বচ্ছ চেতনার দ্বারা চালিত হন, সার্বিক মঙ্গলের পক্ষে দাঁড়ান। তাঁরা হয়ে ওঠেন অনাচ্ছন্ন বুদ্ধি ও বোধির অধিকারী সমগ্র সুশীল সমাজের চোখ-কান। সুতরাং যে কোন রাষ্ট্রীয় সংকটে এইসব বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা তখন হয়ে ওঠে বিরাট। জীবক এ নাটকে সেই পথপ্রদর্শক বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা পালন করেছেন। এভাবে চরিত্রটি আর কেবল ইতিহাসের বৃত্তে বাঁধা পড়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে এ নাটকের এক প্রতীকী চরিত্র।

বুদ্ধিজীবী মহাভিষক জীবকের মতো আর একটি প্রতীকী উপস্থাপনা হিসেবে বিবেচিত হতে পারেন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ। ঐতিহাসিক তথ্য এই : রাজা বিম্বিসারের মতো প্রসেনজিৎও ভগবান বুদ্ধের সদ্ধর্মের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর রাজধানী শ্রাবস্তীর বিশিষ্ট নাগরিক সুদত্ত ছিলেন রাজকোষাধ্যক্ষ। দরিদ্র মানুষের প্রতি বদান্যতার কারণে সুদত্ত পরিচিত হন অনাথ পিণ্ডিক নামে। রাজগৃহে বুদ্ধের সঙ্গে সুদত্তের সাক্ষাৎ হলে তিনি গৌতমের বাণীতে ও ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর সুদত্ত বিপুল অর্থ দিয়ে শ্রাবস্তীতে অবস্থিত তাঁর জেতবন বিহারটিকে সুসজ্জিত করে তথাগতকে সেখানে আহ্বান করেন। অন্যান্য ভিক্ষুসহ জেতবনে গৌতম উপস্থিত হলে একদিন সপার্ষদ প্রসেনজিৎ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সেই সাক্ষাৎকারটিকে ঘিরে নাট্যকার বানিয়ে তুলেছেন তাঁর নবম দৃশ্যটির সূচনাংশ, যেখানে রাজা তাঁর রাজধর্ম সম্পর্কে উপদেশ লাভ করছেন সন্ন্যাসীশ্রেষ্ঠ শাক্যমুনির কাছ থেকে। আদর্শ রাজার ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা তাঁদের কথোপকথনের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এখানে। রাজক্ষমতা প্রজাসাধারণের উপর যে আধিপত্যের সূচনা করে তার প্রয়োগ দুভাবে হতে পারে – সদাচার ও স্বৈরাচার। প্রজারা রাজার কাছে সন্তানতুল্য। পুত্রের প্রতি পিতার যে মমতৃ-দায়িতৃ-কর্তব্য, প্রজার প্রতি রাজারও সেই আচরণ কাঙ্ক্ষিত। তিনি তীক্ষ্ণ নজর রাখবেন প্রজার সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে-সমস্যায়-সংকটে। প্রশাসনযন্ত্রই হল রাজার রাজ্যশাসনের হাতিয়ার। রাজা কেবল নিজে সৎ হলেই চলবে না, তাঁর প্রশাসনযন্ত্রের অঙ্গ রাজকর্মচারীদেরকেও সততা বজায় রাখতে হবে! ধনের ধর্মই তো অসাম্য। সুতরাং রাষ্ট্রের সম্পদ যাতে মুষ্টিমেয়ের ধনভাণ্ডারে অযথা সঞ্চিত হয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের বুভুক্ষার কারণ না হয়ে ওঠে, রাজার অন্যতম কর্তব্য তা দেখা। কেননা,

তথাগতের মতে, জগতের সবচেয়ে বড়ো দুঃখ হল দারিদ্র্য, যা মানুষের সকল গুণরাশিকে বিনষ্ট করতে সক্ষম। অতএব দারিদ্র্যদশা থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য চাই সম্পদের উপযুক্ত বণ্টন। আর চাই স্থায়ী সম্পদের বৃদ্ধি, যে সম্পদের সমভাগীদার হবে সকলে। নাটকের এই অংশে তথাগত দেখা দেন যথার্থ প্রজাকল্যাণকামী রাষ্ট্রের স্থিতধী এক পরিকল্পক হিসেবে। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, কার্ল মার্কসের কমিউনিজম্ চিন্তার অনেককাল আগে প্রাচীন ভারতবর্ষের একজন চিন্তাবিদ এভাবেই শ্রেণিহীন সমাজ আর সমভোগবাদের কথা ভেবেছিলেন। ধর্মজগতের মানুষ হয়েও দিয়েছিলেন অনেক সামাজিক রোগের দাওয়াই, যা আজও রাষ্ট্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। জটিলতম ব্যাধির সরলতম বিধানের এমন আবিষ্কর্তা রাজা প্রসেনজিৎকে পরামর্শ দিচ্ছেন :

বুদ্ধ । সম্পদের বৃদ্ধিতেই দেশের শ্রীবৃদ্ধি। মহারাজ, রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধির প্রতি মনোযোগী হন এবং লক্ষ রাখুন তার ভাগ ন্যায্যমতো যেন সকলেই পান। এই উদ্দেশ্য সাধনে কৃষিজীবী দরিদ্রদের স্বাবলম্বী করুন। তাদের লাঙল, বলদ, শস্যবীজ দিন। কর্মহীনকে কাজ দিন, ছোট ব্যবসায়ীদের ঋণ দিন। দুঃস্থ বয়োবৃদ্ধদের ভাতা দেওয়া প্রয়োজন। মানুষের নূনতম চারটি প্রয়োজন মেটাতেই হবে : এক, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্য; দুই, সভ্য জীবনযাপনের ও দেহ সুরক্ষার জন্য বস্ত্র; তিন, বাসস্থানের আশ্রয় এবং চার, বিদ্যালাভের সুযোগ।

এই পরামর্শগুলি এ নাটকের দর্শক-পাঠককে হঠাৎ ফিরিয়ে নিয়ে যায় আজ থেকে তিন-চার বছর আগের উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঘটনাধারার মধ্যে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে কৃষকদের জমি আন্দোলন, তৎকালীন প্রশাসকবর্গের মনোভাব সবকিছু কেমন যেন অস্পষ্ট ছায়া বিস্তার করে এই কথাগুলোর চারপাশে। মোহিত চট্টোপাধ্যায় রাজনৈতিক মতাদর্শে বামপন্থী হয়েও রাজ্যের কর্মকর্তাদের সব সিদ্ধান্তই যে নির্বিচারে মেনে নিতে পারেননি, ত স্পষ্ট বোঝা যায় এখানে। কোন্ পথ ধরে একজন যথার্থ প্রজাকল্যাণকামী শাসকের চলা উচিত তারও সম্ভাব্য নির্দেশিকা যেন তৈরি করে দেন ইতিহাস-কাহিনির আড়ালে বলে। আর এজন্যই সার্ধদ্বিসহস্র বৎসরের পুরোনো জীবনাখ্যানকে ফিরিয়ে আনলেও 'তথাগত' হয়ে ওঠে আধুনিক, সমকাল-স্পর্শিত।

এবার নাট্যগঠন নিয়ে দু'একটি কথা। জীবনী-নাটক হিসেবে 'তথাগত' লিখিত হওয়ার কারণে গঠনের দিক থেকে এটি আগাগোড়া সরলরৈখিক। গৌতম বুদ্ধের জীবনের সেইসব ঘটনাবলিকে নাটকের সীমিত পরিসরে নাট্যকার ধরতে চেয়েছেন, যাদের যোগফলের ভিতর দিয়ে এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে একটা সমগ্রতার বোধ গড়ে উঠতে

পারে। তবুও মনে হয়, সিদ্ধার্থের বাল্যকালের আরও কিছু ঘটনাকে কোনওভাবে উপস্থিত করতে পারলে বোধহয় ভালো হত। নিদেনপক্ষে পৃথক দৃশ্যের আয়োজন না করে সংলাপের 'রেফারেন্স'-এ সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার আভাস দেওয়া যেতে পারত। এ নাটকে উপকাহিনি নির্মাণের তেমন কোনো অবকাশ নেই। নাট্যকার সে চেষ্টাও করেননি। কেবল অজাতশত্রুকে ঘিরে একটি সংক্ষিপ্ত বৃত্ত গড়বার চেষ্টা করেছেন, যা পরবর্তী সময়ে মূল কাহিনির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। আর সেই অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে বুদ্ধকেন্দ্রিক মূল আখ্যানের তিনটি বিশিষ্ট চরিত্র – বিম্বিসার, দেবদত্ত ও জীবক।

বিম্বিসার-পুত্র অজাতশত্রুর চরিত্রচিত্রণে নাট্যকার ইতিহাস-দর্শিত পথ ধরেই এগিয়েছেন। কুমার কুনিয় ক্ষমতালোভী, অস্থিরমতি, অবিবেচক, সন্দেহপ্রবণ। রাজা হওয়ার উদগ্র বাসনায় তিনি অন্ধ। তাই ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের বিচার করেন না। স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জঘন্য অমানবিক কাজ করতে তিনি পিছপা নন। পিতাকে সরাসরি হত্যা করতে না পেরে দেবদত্তের কূট পরামর্শে চারিদিক নিরুদ্ধ অন্ধকার বায়ুহীন কক্ষে বন্দি করে তিলে তিলে হত্যার আয়োজন করেন। আবার তাঁর মধ্যেই রয়েছে সুপ্ত বিবেক, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। চতুর দেবদত্ত কুমারের রাজ্যলোভ আর অস্থির মতিত্বের সন্ধান পেয়েছিল। তাই তার পক্ষে অতি সহজে অজাতশত্রুকে তার পিতার বিরুদ্ধে উন্মত্ত করা সম্ভব হয়েছে। দেবদত্তের মূল লক্ষ্য অবশ্য গৌতমের হাত থেকে সংঘের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেওয়া। সেজন্য দেবদত্ত কৌশলে গৌতমের বিরুদ্ধে অজাতশত্রুকে লেলিয়ে দেয়। বুদ্ধ ও বুদ্ধের অহিংস নীতি বিষয়ে অবিবেচক যুবরাজের মনকে বিষিয়ে তোলে বলে :

দেবদত্ত । কুমার, মহারাজ বিম্বিসার তথাগতের মা হিংসী মন্ত্রের প্রভাবে যুদ্ধ বিমুখ। মগধের রাজশক্তি, সৈন্যবল প্রায় নিক্রিয় এবং হতশক্তি। ... মগধের এই দুর্বলতার সুযোগে বৈশালী, অবন্তী, কোশল চুপ করে বসে থাকবে? মগধ তো দখল হয়ে যাবে। তখন কোথায় পাবেন আপনার রাজত্বসুখ? মগধ পরাধীন হতে আর দেরি নেই। ... মগধকে বাঁচাতে ক্ষত্রিয়ের ক্ষুধা নিবৃত্ত করুন। জম্বুদ্বীপের রাজচক্রবর্তী হওয়ার ক্ষমতা আপনি রাখেন। আর মুহূর্ত কালক্ষেপ নয়। এই মুহূর্তে সিংহাসনে বসুন।

অতএব নির্দোষ, নিরীহ, ধর্মনিষ্ঠ, তথাগতের অনুগত পিতাকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকে না ক্ষমতালোভে উন্মত্ত কুমার কুনিয়ের সামনে। কিন্তু পিতাকে নিহত করার পর এক দুঃসহ মনোবিকার তাঁর সত্তাকে গ্রাস করে। সুপ্ত বিবেক হঠাৎ যেন জেগে ওঠে। বুঝতে পারেন কত জঘন্য অপরাধ করেছেন তিনি। কত বড় অমানবিক পাপ এই পিতৃহত্যা। ক্ষমা করতে পারেন না নিজেকে, ক্ষমা করেন না তাঁর কুবুদ্ধিদাতা 'গুরুদেব'

মন্ত্রণা পর্বে আসেন রাজবৈদ্য জীবক। দেবদত্তকে। অজাতশত্রুর জীবনে এই নিদারুণ অনুশোচনা পর্বে আসেন রাজবৈদ্য জীবক। বুঝতে পারেন এ মানসিক অসুস্থতা নিরাময়ের ক্ষমতা তাঁর হাতে নেই, এ রোগের একমাত্র চিকিৎসক মহাজ্ঞানী বুদ্ধ। ইতিহাস সাক্ষী, অনুতাপের আগুনে খাক হতে থাকা কুমার কুনিয় শেষ পর্যন্ত শীতল হতে পেরেছিলেন বুদ্ধের চরণতলে আশ্রয় পেয়ে। তথাগতের অলোকসামান্য চরিত্রমহিমা এভাবেই এক ঘটনা থেকে আর-এক ঘটনায় সঞ্চারিত করে দিয়েছেন নাট্যকার। তিনি ক্রমশ হয়ে উঠেছেন দুঃখী ব্যথী তাপী ক্লিষ্ট অনুতপ্ত মানুষের পরম আশ্রয়। দেখা দিয়েছেন মানবচৈতন্য ও প্রজ্ঞার উচ্চতম এক শৃঙ্গ রূপে।

কিন্তু ভগবান তথাগতের ধর্ম কি একেবারে সমালোচনার উর্দ্ধে ছিল? তাঁর প্রব্রজ্যার আদর্শ কি একটি জাতির পক্ষে চিরকল্যাণকর? অস্বীকার করার উপায় নেই, প্রেম-মৈত্রী-করুণার ধর্মে কোথাও বাহুবলের গুরুত্বকেই স্বীকার করা হয়নি। অনেকের মতে, এ তাই নির্বীর্যের সাধনা – যা একটি জাতি দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করতে থাকলে ক্ষাত্রশক্তির দিক থেকে দুর্বল হতে বাধ্য। এ জন্য পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধের 'মা হিংসী' নীতি কোথাও কোথাও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। রাজধর্ম পালনে রাজদণ্ডের যে একটি সদর্থক ভূমিকা আছে এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। দুর্বিনীতকে শাস্তি কিংবা আক্রমণকারীকে উচিত শিক্ষা দেওয়া রাজধর্মের অঙ্গ। এই যথাযোগ্য কর্তব্যগুলি না পালিত হলে রাষ্ট্রশক্তি নপুংসকতায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধ্বজাধারীরা তাই নানাভাবে বৌদ্ধদর্শনের ও অহিংসপন্থের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন।

তথাগতের আর একটি আদর্শও সমালোচনার অস্ত্রে খণ্ড-বিখণ্ড হয়েছে। সে হল মধ্যপন্থাবলম্বী ভিক্ষুর উঞ্ছবৃত্তি। ভিক্ষা কখনই স্বাবলম্বনকে দৃঢ় করে না। দুর্বলের অক্ষমতার গ্লানিচিহ্ন হল ভিক্ষা। এই বৃত্তি মানুষের মর্যাদাকেও ক্ষুণ্ণ করে। নাটকে এমন প্রশ্ন রেখেই যশোধরা অভিযুক্ত করেছেন তাঁর অলোকসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বামীকে। তিনি চীবর, ভিক্ষাপাত্র আর দু'একটি অতিতুচ্ছ বস্তুর অধিকারী করে সমগ্র বৌদ্ধশ্রমণমণ্ডলীর হাতে কোন্ এমন মহার্ঘ সম্পদ তুলে দিয়ে গেলেন ভবিষ্যতের জন্য? তিনি নিজে ঈশ্বর মানতেন না, বিশ্বাস ছিল না দেবদেবীর মূর্তিতেও। অথচ বাস্তব এটাই যে, তাঁর পরিনির্বাণের পর বৌদ্ধধর্মে দেখা দেয় দেবদেবী, তন্ত্রপ্রভাবিত মন্ত্র-মণ্ডল-মুদ্রা। শিষ্যদের নিরন্তর অনুরোধে নারীদের বৌদ্ধসংঘে প্রবেশের অধিকার দেন তিনি। আর সেই রন্ধ্রপথেই তন্ত্রনির্ভর সহজিয়া মতের অনুপ্রবেশ ঘটে বৌদ্ধধর্মে। সহজানন্দ লাভের অছিলায় শুরু হয়ে যায় মুণ্ডিত মস্তক নেড়ানেড়ীদের যৌন ব্যভিচার। একে বৌদ্ধধর্মের পতন ছাড়া আর কি-ই বা বলা যায়। এই পতনের বীজ লুকোনো ছিল বৌদ্ধধর্মের নিজস্ব প্রকৃতিতে। কথাটা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, ব্যক্তিগতভাবে গৌতম বুদ্ধের কিছু সামাজিক আদর্শ ছিল, কিন্তু সেগুলি প্রচারে তিনি ততটা

মন দেননি, যতটা খেয়াল রেখেছিলেন সংঘ গড়ে তোলার দিকে। নাটকের শেষ দৃশ্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন মৃত্যুর পূর্বে তিনি এ ধর্মের তাত্ত্বিক দিকটির দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছেন তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দের ওপর, আর সাংগঠনিক দায়িত্ব অর্পণ করছেন স্থিতধী বয়োবৃদ্ধ মহাকাশ্যপের হাতে। তারপর ঘটেছে তাঁর মহাপরিনির্বাণ। একটি মহাজীবনের বৃত্ত যেন সম্পূর্ণ হল তাঁর এই জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার মধ্যদিয়ে; সমাপ্তি ঘটল জীবন দিয়ে সত্য আবিষ্কারের এক অন্তহীন যাত্রাপথের।

অবশ্য মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের এই নাটকটি গৌতম বুদ্ধের জীবনপঞ্জির নিছক নাট্যরূপায়ণ নয়, তাঁর ধর্মাদর্শের সারাৎসারকেও যথাসম্ভব উপস্থাপিত করেছে এ নাট্য আখ্যান। নানাজনের সঙ্গে গৌতমের মিলন ও সাক্ষাৎকার, এই ধর্মের প্রতি তাদের আস্থা কিংবা সংশয়, তথাগতের ধর্মের স্বরূপকে সম্যকভাবে বোঝবার চেষ্টার সূত্র ধরে বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্বটি এখানে ব্যাখ্যাত হয়েছে। নাট্যকার নাটকটির নামকরণ করেছেন 'তথাগত' – যা গৌতম বুদ্ধের আর একটি অভিধা। একই সঙ্গে এই শব্দটির ভিতর দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে নাটকটির মূল অভিপ্রায়ও। 'তথাগত' শব্দের আভিধানিক অর্থ হল তদ্রূপ আগত। 'তথা' কথাটির ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় মেলে সিদ্ধত্ব এবং 'গত' বলতে বোঝায় প্রাপ্ত। অর্থাৎ যিনি সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। নাট্যকার নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে এবং গৌতম বুদ্ধের মুখ দিয়ে নিজের বুদ্ধত্ব অর্জনের ঘোষণা করিয়েছেন। সিদ্ধার্থের মনের দৃঢ়তায় মার পরাজিত হয়ে চলে যাবার পর বুদ্ধের আন্তরিক উপলব্ধিতে ধরা পড়েছে 'তথাগত' কথাটির মর্মার্থ। তিনি জানিয়েছেন, অন্ধকার থেকে বিমুক্ত হওয়ার পর তাঁর চিত্তের জাগরণ ঘটেছে, তিনি আলোকিত হয়েছেন। বৌদ্ধ ধর্মদর্শনে তাই শব্দটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যিনি পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত, তিনিই তথাগত। গৌতম বিশ্বাস করতেন, বোধি কিংবা জ্ঞান কোনো ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়, একক অধিকারে রাখার বস্তুও নয় তা; যাঁরাই মহাজ্ঞান লাভ করবেন তাঁরাই হয়ে উঠবেন 'বুদ্ধ'। তিনিই সেই পূর্বের মহাজ্ঞানীদের পথ ধরেই আগত হয়েছেন। তবে তাঁর জ্ঞান অলৌকিক শাস্ত্রজ্ঞান নয়, লৌকিক জীবনবোধের জ্ঞান। কোনো অবিশ্বাস্য মন্ত্রনির্ভর কেরামতিতে তিনি বিশ্বাস করেননি। তাঁর সাধনা লৌকিক উপায়ে মনের নিয়ন্ত্রণ-নির্ভর দুঃখ জয়ের সাধনা। এই দুঃখ কেবল আধ্যাত্মিক নয়, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকও। এইজন্য তিনি সমকালের রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন মানবকল্যাণের আদর্শে, কেননা তিনি জানতেন প্রজার সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ নির্ভর করে রাজার কল্যাণনীতি ও তার যথাযথ রূপায়ণের উপর। বৃহত্তম মানুষের সর্বোত্তম সুখবিধানই ছিল গৌতম বুদ্ধের সামাজিক লক্ষ্য। তাই তিনি তাঁর সমকালের রাজনৈতিক

শক্তিগুলিকে তাঁর প্রজাকল্যাণকামী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নাট্যকারের অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, রাজা বিম্বিসার কিংবা প্রসেনজিতের সঙ্গে বুদ্ধের সম্পর্কিত কথোপকথনকে বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে সফলভাবে মিলিয়ে দেওয়া। যেমনটা ঘটে থাকে ছদ্ম-ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রে, এখানেও তারই অনুবর্তন। আর সেই কারণেই পুরোনো কালের এক অলোকসামান্য মানবব্যক্তিত্বকে নিয়ে লেখা একটি বহুকৌণিক নাটক 'তথাগত' হয়ে উঠেছে প্রবলভাবে আধুনিক, বর্তমানকালের সমস্যা-চুম্বিত।

....

হাঁর না মানা চণ্ডালিকা

ড. দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

"পূজিব না, পূজিব না, পূজিব না সেই দেবতারে
পূজিব না।
কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল, কেন দেব ফুল
আমি তারে – "

বিধাতার বিরুদ্ধে প্রকৃতি'র তীব্র ঘৃণাময় প্রতিবাদ শুরু হয় এভাবেই। নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'। রচয়িতা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। প্রকাশকাল ১৩৪০ ভাদ্র। সর্বসাধারণ সমক্ষে অভিনীত হয় ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে। সেদিন শতবিভক্ত হিন্দুসমাজের ধারক-বাহকদের কী প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল তার প্রামাণ্য দলিল নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু বাংলার সমাজে চণ্ডালিকার, নৃত্যায়ণ, মানবাত্মার অপমান, অবনমনের ক্ষেত্রে একটি মধুর প্রতিবাদ। অবশ্যই নান্দনিক। ব্রাহ্মণ্য শাসিত সমাজে আজন্ম লালিত রক্ষণশীলতার বিপ্রতীপ প্রতিক্রিয়া 'চণ্ডালিকা'।

খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ থেকে ২য় শতাব্দী অর্থাৎ নন্দ ও মৌর্যদের রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ঘটেছিল। এটি ইতিহাসের তথ্য। বাংলার রাজারা বৌদ্ধধর্ম প্রচারেও সহযোগিতা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম তখন একই সঙ্গে দ্বন্দ্বরহিত অবস্থান ছিল বাংলায়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের জাতিভেদহীনতা, মানব সহিষ্ণুতা, উদার মানসিকতা সর্বোপরি শান্তিকামী অবস্থান সহজেই মানুষের অন্তঃকরণে একটি স্বতন্ত্র স্থান নির্দিষ্ট করেছিল। পরবর্তী সময়ে বহু ঘটিত ঘটনার আবহে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন পরিবর্ধন সাধিত হয়। বাদ-বিবাদ গ্রহণ-বর্জন, আদান-প্রদানের পদ্ধতিতেই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহাবস্থান চলতে থাকে। দুই ধর্মের ওপর ইসলামী কট্টরপন্থীদের আক্রমণও নেমে এসেছিল মহানীচ হিন্দুদের মন্দির, দেবগৃহ, প্রাচীনগ্রন্থ ইসলামীধর্মের সৌজন্যে ধূলিসাৎ হয়েছিল। বৌদ্ধবিহারগুলিও এঁদের হীন প্রবৃত্তি থেকে রেহাই পায়নি। বুদ্ধের শান্তিরবাণী ভস্মীভূত হয়েছিল পৈশাচিক সর্বভূক আগ্রাসনে। এ প্রাচীন বৃত্তান্ত সর্বজনজ্ঞাত। বিশদ বর্ণনার পুনর্লিখন নিষ্প্রয়োজন। উল্লেখ্য এই যে, উক্ত অগ্নিগর্ভ আবহেও বিলুপ্ত হল না ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্ম। পরবর্তীকালে মহান সম্রাট হুসেন শাহের আমল (১৪৯৩ খ্রিঃ) থেকেই কালোমেঘ কাটতে শুরু করে। স্বস্তির শ্বাস পড়ল উভয়ধর্মের। মূলতঃ এই সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে আদান-প্রদানের একটা বৈবাহিক সম্পর্ক শুরু হয়ে যায়। বৌদ্ধধর্মে হিন্দুর মূর্তি পূজা, আচার রীতি-নীতি যেমন প্রবেশ করল তেমনি বৌদ্ধদের দেহ সাধনা, তন্ত্রসাধনা হিন্দুর ধর্মাচরণে প্রবেশ করল। বৌদ্ধ-বিষ্ণু-শিব মিলেমিশে একাকার হল। সাহিত্যেও তার প্রভাব বিস্তারিত হল। আমরা ৮ম – ৯ম শতকের চর্যাপদের পরে বৈষ্ণবপদাবলী, মঙ্গলকাব্য, শাক্তপদাবলী, নাথসাহিত্য, বাউল সংগীত প্রভৃতিতে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব

অনুভব করলাম।

বহুযুগ অতিক্রান্ত করে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক কবিমানস রবিঠাকুরকেও বৌদ্ধধর্মের অস্পৃশ্যরহিত ভাবনা, দেহসাধনার ভাবনা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করল। কবিগুরু জাতপাতের ভারতবর্ষে বুদ্ধের মানবতাবাদকেন্দ্রিক মতাদর্শকে গুরুত্ব দিলেন। সুজাতার পরমান্নের অমৃতস্বাদ গ্রহণের আগ্রহে আকুল হলেন। মানস নৈরঞ্জনা নদীতীরে অন্বেষণ করলেন বৌধিবৃক্ষের সান্নিধ্য। তাই তাঁর 'প্রকৃতি' হল বিদ্রোহিনী। অস্পৃশ্যতার অচলায়তন ভঙ্গের হাতিয়ার।

এটা তো ঠিক জন্ম থেকেই মানুষের জাতধর্ম নির্ধারিত হল কোন্ প্যারামিটারে? নবাগতের অপরাধ কোথায়? সে কেন উচ্চবর্ণের ধর্মের সদস্য হবে না? বিদ্যাচর্চা, দূরদর্শিতা, প্রতিভা, অনুশীলন প্রভৃতির মধ্যদিয়ে শূদ্রেরও অন্তর শুদ্ধির অবকাশ আছে। আপন স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার পথ স্তব্ধ করার অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্রাহ্মণের অঙ্গুলিহেলনে মান্যতা পাবে কেন? স্বভাবতই 'প্রকৃতি'র যথার্থ জিজ্ঞাসা জন্মদাত্রীর উদ্দেশ্যে –

"জন্ম কেন দিলি মোরে,
লাঞ্ছনা জীবন ভ'রে –
মা হয়ে আনিলি এই অভিশাপ
কার কাছে বল্ করেছি কোন্ পাপ
বিনা অপরাধে এ কী ঘোর অন্যায়।।"

এই Basic প্রশ্নের উত্তর গোঁড়া রক্ষণশীলদের অনুশাসনে নেই। আছে প্রভাব খাটানোর অবিবেচনীয় দুর্মর আকাঙ্ক্ষা।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে মূল দুটি চরিত্র 'প্রকৃতি' এবং তার মা 'মায়া'। উভয়ের বক্তব্যের মধ্যদিয়েই নাট্যকার অস্পৃশ্যতারোগের প্রকার এবং তার অন্তরসারশূন্য রূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন। প্রকৃতি মা বারংবার সন্তানকে তার জন্মবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মা অদৃষ্টবাদী। চণ্ডাল হয়ে সমাজের পদতললগ্ন হওয়ার জন্যই তাঁর জন্ম। উচ্চবর্ণের লাঞ্ছনা, অবমাননা তাঁর চিরদিনের যৌতুক। এটিই মা অর্থাৎ প্রাচীনের মধ্যে ধারণা। তাই দেখি চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে রাজবাড়িতে কাজ করতে যাওয়ার জন্য বারবার তলব করে ক্লান্ত মা মায়া বলেন –

'থাক্ তবে থাক্ তুই পড়ে
মিথ্যা কান্না কাঁদ্ তুই মিথ্যা দুঃখ গ'ড়ে।'

কিন্তু এতো মিথ্যা কান্না বা দুঃখ নয়। এতো প্রকৃতি'র হার না মানা মন। অপমানক্ষুব্ধ সত্তা। ফুলওয়ালা, দইওয়ালা, চুড়িওয়ালা – কাউকেই সে স্পর্শ করতে পারবে না। মানবের স্পর্শে ফুল, দই, চুড়ি অশুচি হওয়ার বিজ্ঞান প্রকৃতি জানে না। -

'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি,
ওযে চণ্ডালিনীর ঝি – ' – এই অনুরণন প্রকৃতিকে বিমর্ষ করে।

অস্পৃশ্যতার অচলায়তন থেকে মুক্তির উপায় অন্বেষণ তাঁর চক্ষে গভীর জিজ্ঞাসা, বিস্ময় জাগরিত করে।

হিন্দু ধর্মের আগল বড় কঠিন। হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ না করলে হিন্দু হওয়ার উপায় নেই। এমনকি যে ব্যক্তি যে বর্ণে (চতুর্বর্ণ) জন্মেছে সে কোন উপায়ে সেই বর্ণের গণ্ডীর বাইরে আসতে পারবে না। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা উপদেশ থেকেও শূদ্রাদি হীনবর্ণ বঞ্চিত ছিল। ফলতঃ চণ্ডালিকাকে উদ্ধার করবে কে? হিন্দুধর্মের সেই উদারতা কোথায়? বৌদ্ধধর্ম এর ঠিক বিপরীত। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের যেমন স্বধর্ম পালনের উপদেশ দিতেন, তেমনি দেশ-বিদেশে বিভিন্ন জনজাতির মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচারেও উৎসাহিত করতেন। এই বৌদ্ধধর্মেই আছে অস্পৃশ্যতা থেকে উদ্ধারের উপায়।

হিন্দুধর্মের এই অমানবিক, মানুষকে হেয় করার কলঙ্ক ফাঁক-এর কারণেই খ্রিস্ট, বৌদ্ধ এমনকি ইসলাম ধর্মও সহজেই হিন্দুধর্মকে আঘাত করতে পেয়েছে। ধর্মান্তরকরণে বহিরাগতরা সকলেই সার্থক হয়েছেন। কেউ বলপূর্বক, কেউবা সকলবর্ণকে সমানভাবে ভালোবেসে শান্তির বাণী, ক্ষমার বাণী প্রচার করে। সার্বভৌমকবি হিন্দুধর্মের কলঙ্কময় নানা দিককে তীব্র ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছেন। যেমন করেছেন 'বিসর্জন' নাটকে বলিদান প্রথাকে। প্রাণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন অধিক। মনুষ্য, মনুষ্যত্বের প্রাণকে ভালোবাসার কথাই তো বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ সেই ধর্মের শিক্ষায় শুচি-শুদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মের উদ্দেশ্যে।

বুদ্ধশিষ্য 'আনন্দ' প্রখর তপনতাপ ক্লিষ্ট, তৃষিত। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ 'আনন্দে'র মধ্যদিয়ে চণ্ডালিকা উদ্ধারের কর্ম সম্পাদন করলেন। কোন হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী ব্যক্তিত্ব নয় – নিয়ে এলেন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে। তাঁর 'জলদাও আমায় জল দাও' – আহ্বান চণ্ডালিকা প্রকৃতিকে আলোড়িত করে; ব্যথিত করে। কিন্তু সে যে অশুচি। তার তো জলদানের অধিকার সমাজ কেড়ে নিয়েছে। কীভাবে তৃষিতের তৃষা সে মেটাবে? আনন্দ তার উদ্ধার কর্তা। প্রকৃতি'র অন্তরে সে-ও যে আনন্দের মতো একজন মানুষ – এই প্রত্যয় জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চণ্ডালী নাম বাইরের কৃত্রিম আবরণ। সঙ্গত কারণে প্রকৃতিরও জলদানের অধিকার সন্দেহাতীত। অবশেষে সংকোচের অবসান এবং জলদান। এক গণ্ডূষ জলদানেই প্রকৃতির অন্তর মহাস্বাধীনতার হর্ষে উল্লসিত হল –

"ওগো কী আনন্দ' কী আনন্দ, কী পরমমুক্তি।
একটি গণ্ডূষ জল –

আমার জন্ম-জন্মান্তরের কালি ধুয়ে দিল গো
শুধু একটি গণ্ডূষ জল।”

বৌদ্ধভিক্ষু যে সহজ ভাবনায়, যে উদারতায় সমাজকথিত নিম্নবর্ণা প্রকৃতির অন্তকরণে প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করলেন, ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের কোন টিকিধারী ভগবানের পক্ষে তা সম্ভব হল না। সেটা স্বাভাবিকও ছিল না।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রণেতা বাবা সাহেব ভীমরাও রামজি আম্বেদকর (১৮৯১)-এর জীবনও অস্পৃশ্যতার চরম অপমানে জর্জরিত হয়েছিল। নিম্নবর্ণ হওয়ার অপরাধে এদেশের মাটি তাঁকে স্কুল-কলেজ তথা সমাজ থেকেই আলাদা করে রেখেছিল। কিন্তু প্রতিভাধর আম্বেদকর স্বীয় প্রচেষ্টায় সেই অপমানের মধুর প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে উচ্চসমাজের সমীহ আদায় করে নেন। আপন প্রতিভাবলে তিনি হলেন ড. বাবা সাহেব আম্বেদকর। ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা। বঞ্চিত, অবহেলিত অপমানিত জাতির প্রতিবাদী মুখ আম্বেদকর। উচ্চবর্ণের দিনের পর দিন অপমান তাঁর অন্তরে যে আগুন প্রজ্জ্বলন করেছিল তারই সৌজন্যে ভারতবর্ষের পশ্চাদপদ যাত্রীরা প্রাপ্য সম্মান উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্ব-সমাজের ঘৃণিত ভাই-ভগিনীদের চোখের জল মুছিয়ে দলিতদের অধিকার আদায় করেছিলেন। তিনিই অস্পৃশ্যকলঙ্কিত ভারতবর্ষের বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ। সময়টা ছিল বিংশ শতাব্দীর ২য় – ৩য় দশক। রবীন্দ্রনাথের ‘চণ্ডালিকা’ (১৩৪০) প্রায় সমসাময়িক। মনে রাখতে হবে ঠিক এই সময়ে ১৯৩০ খ্রিঃ সাদা চামড়ার সাহেব সমন্বিত ‘সাইমন কমিশন’-এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ সংঘটিত হয়। এই কমিশনের প্রতিবেদনে আমরা জানতে পারি ভারতের শতকরা ১৪ জন মানুষ অস্পৃশ্য।

এরই অব্যবহিত পূর্ব থেকে চলেছে গান্ধিজীর আন্দোলন। জাতির জনক মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি (১৮৬৯) সর্বপ্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যদি ভারতের অবহেলিত নিপীড়িত মানুষকে সামিল করা না যায় তাহলে ভারতের মুক্তি সম্ভব হবে না। অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি জেহাদ ঘোষণা করলেন। তিনি শূদ্রদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে জোর দিলেন শিক্ষায়। চিন্তা করলেন বেকারত্ব ও দীনতা দূর হলে তাদের কেউ অস্পৃশ্য বলবে না। স্বভাবতই শূদ্রদের আস্থা অর্জন ‘ছোটলোক’দের মর্যাদাপূর্ণ নামকরণ করলেন। নাপিত হল ‘নরসুন্দর’, মেথর হল ‘জমাদার’ ইত্যাদি। একসঙ্গে সবাই হল ঈশ্বরের লোক ‘হরিজন’।

এ সমস্ত ঘটনাবহুল প্রেক্ষাপটেই বৌদ্ধ আদর্শের ছায়ায় রচিত ‘চণ্ডালিকা’ এবং নারী চরিত্র ‘প্রকৃতি’। রবীন্দ্রনাথ পরাধীন ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি স্পর্শকাতর বিষয়ের ওপরেই নিজস্ব ভাবনা মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। রূঢ়ভাব কখনো অবলম্বন করেননি। স্থির

চিত্তে বৈজ্ঞানিক ঋদ্ধতায় সমস্যার গভীরে প্রবেশ করেছেন। অন্বেষণ করেছেন দিশা। এবং দেশবাসীকেও সেই আলোর দিশায় উদ্ভাসিত করার আন্তরিক প্রয়াস দেখিয়েছেন। ‘চণ্ডালিকা’ নৃত্যনাট্যটি সেই দায়বদ্ধতারই চিহ্ন।

সঙ্গতকারণেই আনন্দের স্পর্শে ‘প্রকৃতি, চরিত্র বিদ্রোহিনী। আপনভাগ্য জয়ের আনন্দে উতলা সে। অন্য ক মা মায়া মেয়ের সাধ্য-সাধনায় বারবার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। প্রকৃতির অন্তর থেকে ‘জল দাও, জল দাও, জল দাও’ – এই বীজমন্ত্রকে উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন। রক্ষণশীল, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজের প্রতীক হয়ে মায়া ভেবেছেন ‘কোন্ পাতালবাসী দেবতা ইশারায়’ মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব তাকে ঠেকাতে হবে। কিন্তু বুকচেরাধন প্রকৃতি কোন কিছুই বোঝে না। তাঁর কোন একই শুদ্ধ ধ্বনি শ্রবণ করে, তিনি বলেছেন –

“নিজেরে নিন্দা করো না,
মানবের বংশ তোমার
মানবের রক্ত তোমার নাড়ীতে।”

বৌদ্ধধর্মের এই মানবতাবাদী আদর্শ কবিকে আপ্লুত করেছিল। মানবাত্মার অপমান রুখতে কবি বুদ্ধের আদর্শকেই অবলম্বন করে মানুষকে ভালোবাসার গান গাইলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর অহিংসা, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি প্রকৃতি’র মধ্যেও সঞ্চারিত হল। সত্য, সাহস জাগরিত হল হৃদয়ে। তাই, মায়ের বিপরীতে সে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। মা মায়া তাঁর শিষ্যদলকে আহ্বান করলেন, মন্ত্রপড়ে প্রকৃতি’র অস্বাভাবিকত্ব দূর করবেন। শুরু হয় তাঁর বাহিনীর তাণ্ডব – মায়ানৃত্য। প্রকৃতি মধ্যমণি। সেখানে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া – ‘পড়্ তুই সবচেয়ে নিষ্ঠুর মন্ত্র’।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আসি নৈরঞ্জনা নদীতীরে। সেখানে বৃক্ষের তলায় অবস্থান করেছেন গৌতম বুদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষায়। আর সেখানেই ‘মার’ অর্থাৎ পাপাত্মা শয়তান কামদেব স্বীয় পুত্র-কন্যা দলবল নিয়ে উপস্থিত। ভয়, প্রলোভনের মধ্যদিয়ে গৌতমের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঠেকাবার জন্য। তাঁকে বিপথগামী করার জন্য। তথাপি বুদ্ধ যোগাসনে অটল রইলেন, অপ্সরাগণের সহস্র মায়া পরাভূত হল। এই সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন গৌতম বুদ্ধ।

প্রকৃতিও তার মা মায়া এবং তাঁর সম্প্রদায়ের নানা প্রলোভন, ভয়কে উপেক্ষা করে এগিয়ে গেছে অভীষ্ট লক্ষ্যে। বলেছে –

‘নিষ্ঠুর পণ আমার,
আমি মানব না হার, মানব না হার –

আবার ঝিমিয়ে পড়া মাকে চেতনা ফেরাতে নাড়া দিয়ে বলেছে –

‘দুর্বল হোস নে, হোস নে।

এইবার পড় তোর শেষ নাগ মন্ত্র –
নাগপাশবন্ধ মন্ত্র।।'

মা-ও যোগিনীদের সম্মিলনে কুহকজালে প্রকৃতিকে জয় করতে শেষ চেষ্টায় উপনীত।

এ ধরনের প্রয়াস বৌদ্ধধর্মে বিশেষভাবে মহাযানীদের মধ্যে প্রচলন ছিল। তন্ত্রসাধনা, ডাকিনী-যোগিনী, গুহ্যসাধনা বৌদ্ধধর্ম থেকেই হিন্দুধর্মে ঠাঁই পেয়েছে। বৌদ্ধধর্মের এই নানাবিধ সাধনার প্রভাব আমরা ধর্মমঙ্গলে লাউসেন, রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, কানড়া চরিত্রে লক্ষ করি। আবার নাথসাহিত্যেও 'মীনচেতন' বা 'গোরক্ষবিজয়', 'গোপীচন্দ্রের গান' প্রভৃতি কাহিনিতে মীননাথ, গোরক্ষনাথ বা ময়নামতী, অদুনা-পদুনা চরিত্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। বৌদ্ধ ও নাথ যোগীদের নৈকট্য প্রবল। নাথ যোগীরা বুদ্ধত্বের মতো শিবত্ব বা মহামুক্তিতেই বিশ্বাসী এবং স্ত্রী সংসর্গবর্জিত কায়া সাধনাতেই সেই মহামুক্তির সুখ বিধৃত।

'চণ্ডালিকা'তেও সেরকমই একটি আবহ তৈরি করেছেন নাট্যকার। মায়ার কোন খেলায় প্রকৃতি বদ্ধ হয়নি। সে শুধু মনের মধ্যে, ধ্যানের মধ্যে শুনেছে তাঁর (প্রভু) চরণধ্বনি। অবশেষে প্রকৃতির জয়। আনন্দ উপস্থিত হয়েছেন চণ্ডালকন্যা প্রকৃতিকে উদ্ধারের মহৎ কার্যে। চণ্ডালী মানবধর্মে উন্নীত হল –

"প্রভু, এসেছ উদ্ধারিতে আমায়,
দিলে তার এত মূল্য,
নিলে তার এত দুঃখ।"

কৃচ্ছ্র সাধনা ছাড়া সহজ পাওয়ার মূল্য থাকে না। সে কারণেই প্রকৃতিকেও জ্বালা, যন্ত্রণা, পীড়ন ইত্যাদির মধ্যদিয়ে শুদ্ধ চৈতন্যে উপনীত হতে হয়েছে। সত্য হয়েছে তার হার না মানা মন। স্মরণে রাখতে হবে বৌদ্ধধর্ম মঙ্গলের ধর্ম – 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়চ'। 'চণ্ডালিকা'তে কবি তা-ই প্রতিষ্ঠা করেছেন।

ঋণ স্বীকার :

১. বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন – সাধনকমল চৌধুরী।
২. বৌদ্ধধর্ম – সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৩. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) – ড. সুকুমার সেন।
৪. বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (২য় খণ্ড) – গোপাল হালদার।
৫. বাঙ্গালীর ইতিহাস – নীহাররঞ্জন দে।
৬. আধুনিক ভারতের ইতিবৃত্ত – কল্যাণ চৌধুরি।

....

কাকাবাবু ও বজ্রলামা : না ধর্মী সুনীলের ধর্মীয় স্ট্র্যাটেজি

শৌভিক দাশগুপ্ত

যদিও ভেতো বাঙালি বদনামটা কোনদিনই যাবে না, তবে বাঙালির পায়ের তলায় সর্ষে প্রবাদটির সঙ্গেও বেশ ভালোরকমের সখ্যতা। আর তার মধ্যে যদি একটু সন্দ সন্দ গন্ধ পেয়ে অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ পাওয়া যায়, তবে জমে যায় খাসা। সুনীলের লেখায় এমনিতেই ভ্রমণের স্বাদ বেশ সুলভ ও স্বাদু; আর কাকাবাবু চলে এলে পাঠকের আগ্রহ বেড়ে যায় অনেকখানি। আসলে, ক্রাচে ভর দিয়ে একের পর এক রহস্যের জট খুলে যখন কাকাবাবুর জিতে যাওয়া দেখি, তখন ভেতো বাঙালিরও তৃপ্তি আসে, বারবার সেলাম ঠুকতে ইচ্ছে করে রাজা রায়চৌধুরীকে আর তার স্রষ্টা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে। কারণ, কাকাবাবু নায়কীয় ভঙ্গিতে বা চালে পাঠককে মাত করে না, তার আছে একটা আলাদা রহস্য। কাকাবাবুর এই চরিত্রগুণ সম্পর্কে সুনীল নিজেই বলেছেন – " 'কাকাবাবু' সিরিজের লেখাগুলি গোয়েন্দা গল্প নয়, সেরকম আমি লিখতেও চাইনি। সবকটিই রোমাঞ্চকর অভিযান কাহিনি। কিশোর-কিশোরীদের কল্পনা উদ্দীপ্ত করাই এর উদ্দেশ্য। সাধারণত গোয়েন্দা কাহিনির নায়ক সর্বগুণান্বিত হয়। চেহারা সুন্দর, মারামারি ঘুসোঘুসি ভালো পারে, লড়াইতে অকুতোভয়। আমার 'কাকাবাবু' অনেক সাধারণ এবং কাছের মানুষ। তিনি ক্রাচ নির্ভর করে হাঁটেন, তাতে বোঝা যায় তাঁর মনের জোরটার ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে।" ['সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও গ্রন্থ পরিচয়': রফিক উল ইসলাম সম্পাদিত]। এই কথার সূত্র ধরেই সন্ধান পেয়ে যাই, সুনীলের আরেকটি ভাবনার। কিশোর বয়সের পাঠকের কথা ভেবে লেখা, তাই ভয়-ভীতির প্রতি সমর্থন যেমন থাকবে না এটা যেমন স্বাভাবিক তেমনই এ পথও প্রশস্ত যে ঈশ্বর বা ধর্মের করিডরে কাকাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার চলবে না। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারি চলবেন একেবারে নিজের মত, আর তার ভাবনাও চলবে সুনীলিয়ানার ঢঙেই।

দিল্লীতে সরকারি কাজে রাজা রায়চৌধুরীর বেশ নামডাক ছিল। অবসর নেওয়ার পরেও তাই সরকারের উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গে তাঁর বেশ চেনাজানা, অ্যাডভেঞ্চারের রাস্তাও প্রকট হয় সেই সূত্র ধরেই। কাকাবাবুর সমস্ত অভিযানেই তাই ইতিহাসের সঙ্গে এক নিবিড় যোগাযোগ। আবার ইতিহাস যেখানে, সেখানে একই সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে কখন যেন ধর্মবোধ ও বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা ধর্মজালকেও সুনীল উপস্থিত করান পাঠকের সামনে। একটু আগে বলা সুনীলের কিশোর সংক্রান্ত মনোভাবনা তাই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ ধর্ম এলেও তার অমোঘ উপস্থিতিকে তোয়াক্কা না করে ইতিহাস ও পৃথিবী রক্ষায় মানুষের

প্রকৃত কর্তব্যকেই কাকাবাবু বেছে নেন এবং সন্তুর মত পাঠকের চোখেও কাকা নয়, হয়ে ওঠেন কাকাবাবু।

জানুয়ারি ১৯৯০ সালে 'কাকাবাবু ও বজ্রলামা' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এক্কেবারে কাকাবাবুইজমে সমৃদ্ধ এই গল্পটির অন্তরে আছে এক বিরাট ভাবনা। যে ধর্মের অন্তরমহলে মানুষ পৌঁছাতে পারে না, তা আর মানুষের হবে কি করে? এই গল্পেতে তাই ধূমায়িত ধর্মের রহস্যকে কাকাবাবু নিশানা করেছেন। অন্যান্য গল্পগুলির মত এখানেও এক্কেবারে প্রথম পাতা থেকেই প্রায় মূল রহস্যের দরজায় টোকা মারা। অন্ধকার রাতে, রিভলবার হাতে দরজায় ধাক্কা দিয়েই তো ফিলিপ তামাং কাকাবাবুর ঘরে ঢোকে। যদিও মূল গল্প শুরু হয় পরদিন সকালে, যেখানে পুনরায় দেখা যায় ফিলিপ তামাংকে। তেনজিংএর স্মরণসভা অ্যাটেন্ডের শেষ দিনে হিলরি এবং স্ট্রিন্তবার্গের যে ঐ লোকটির কাছে তিনশো বছরের প্রাচীন মানুষদের বেঁচে থাকার কথা বলেছেন তা প্রথম জানা গেল। অতঃপর বৃষ্টি,তাতে ভিজে সন্তুর জ্বর আসা এবং অবশ্যই বীরেন্দ্র সিং-এর কাছে কাকাবাবু, সন্তু ও নরেন্দ্রর প্রথম শোনা তান্ত্রিক লামার কথা। শুধু শোনাই নয়, গ্যাংগ্রিন হয়ে যাওয়া বীরেন্দ্রর হাতে শুধুমাত্র দস্তানা পরিয়ে কীভাবে সচল রেখেছে তা আশ্চর্য করে দেয় সকলকে। যদিও কাকাবাবু আশ্চর্য হলেও একেবারে এতে বিমোহিত হয়ে পড়েন না। এখানে বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার সঙ্গে তাঁর কথোপকথন বেশ তাৎপর্যময় – 'নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তবু একবার ট্রাই নিয়ে দেখলে পারতে! বীরেন্দ্র সিং যা বললেন, তাতে তো মনে হচ্ছে মিরাকুলাস কিওর। ওই তান্ত্রিক লামার নিশ্চয়ই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা আছে।" কাকাবাবু বললেন, "আমি অলৌকিক ব্যাপার স্যাপার থেকে দূরেই থাকতে চাই।"

কাকাবাবুর মনটিকে বুঝতে পারা যায়, কিন্তু মুখ থেকে যেন একটা আক্ষেপসূচক 'ইস্' শব্দ বার করে ফেলি; যদি কাকাবাবুর পা'টা এতে ভালো হয়ে যেত। কিন্তু সুনীলের কলম তো তাঁকে সৃষ্টি করেছে কিশোর মনে বাস্তববোধ ও জোর আনতে। তাই কাকাবাবুর ভাবনাটাও অন্যরকম। বিশদে এর পরিচয় পাই কয়েক পাতা পরেই। গল্প যখন রহস্যের দানাকে জমাট করতে শুরু করেছে সে সময় সন্তুর জ্বরে ক্যাপ্টেন নরবুর বারংবার অনুরোধেও কাকাবাবু তিব্বতী লামা নয়, চিকিৎসকের দ্বারস্থই হতে চেয়েছিলেন। যদিও বর্ষার পাহাড়িয়া রাস্তা আর কোনও মানুষের তিনশো বছর বেঁচে থাকার অবাক কাণ্ড এই দুইয়ের যুগপৎ সন্নিবেশ্ কাকাবাবুকে বাধ্য করল সন্তুর জন্য তান্ত্রিক লামার কাছে আসতে। ততক্ষণে অবশ্য রহস্যের সন্ধান পাঠকেরাও অল্প অল্প পেতে শুরু করেছে। যদিও লামাজীর হাতযশে সত্যি সত্যিই কিন্তু সন্তু 'নো পেইন নো ফিভার'-এর আওতায় চলে আসে। আর তখনই নতুন চাল চাললেন কাকাবাবু। এই তান্ত্রিক লামা তথা বজ্রলামার কাছে

নাছোড়বান্দা হয়ে অনুরোধ করতে থাকেন সেই তিনশো বছর বেঁচে থাকা প্রাচীন লামাকে দেখবেন বলে। কিন্তু চিড়ে অত সহজে ভেজে না। বজ্রলামার বজ্ররূপ প্রকাশ পায়। মিথের জালকে এত সহজে ছিঁড়তে সে দেবে না। কিন্তু কাকাবাবুর প্ল্যানিং তো বরাবরই আটঘাট বাঁধা। স্বয়ং রাষ্ট্রপতির চিঠি তিনি বজ্রলামার হাতে তুলে দেন। যদিও প্রত্যুত্তরে অবজ্ঞা এলে, রাজা রায়চৌধুরীর দৃপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে প্রথম শুনতে পাই ধর্মের পাঁচিলকে ভাঙার কথা – 'কাকাবাবু বললেন "রাষ্ট্রপতি আগেই সরকারিভাবে অ্যাকশান নিতে চান না। আপনাদের ধর্মস্থানে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি হোক, তাও তিনি চান না। সেইজন্যই তিনি প্রথম আমাকে প্রাইভেটলি খোঁজ নিতে বলেছেন। আপনারা তিব্বতীরা ভারতের অতিথি। ভারতের রাষ্ট্রপতির এই অনুরোধটুকু মানবেন না।" অনুরোধ এবং অধিকারের বোধ দুই-ই একথায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অবশেষে একটি ঘোড়ায় কাকাবাবু ও নরবু এবং অন্য একটি ঘোড়ায় সন্তু ও বজ্রলামা যাত্রা করে প্রাচীন লামাকে দেখার উদ্দেশ্যে। যদিও কাকাবাবুর মন শান্ত হয় না, এবং তিব্বতীরা; যাদের আশ্রয় দেওয়ার কারণে চিনের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়েছে তারাই স্বয়ং ভারতীয় রাষ্ট্রপতির অনুরোধ মানতে রাজি নয় ভেবে কাকাবাবু যথেষ্ট বিরক্ত হন। আর কাকাবাবুর ভক্তরা সকলেই জানে যে, একবার যদি জেদ চেপে যায় তবে কাকাবাবু আর দ্বিতীয় ভাবনা ভাবেন না। গল্পে অবশ্য চলতে থাকে প্রাচীন লামা এবং তার বাস যে মনাস্টারিতে সেখানকার রহস্য সম্পর্কে নানা কথা বা প্রহেলিকা। নরবুর মুখে এদের অলৌকিক ক্ষমতা, তন্ত্রসাধনা, কোনও ভয়ংকর জন্তু-জানোয়ারের উপস্থিতি সবই জেনে নেন কাকাবাবু। মনাস্টারির অবস্থানেও যেন রহস্যের আবরণ। ডিংলা নামের একটি ঝোরা এই মনাস্টারিকে তিনদিক থেকে ঘিরে রেখেছে আর পিছনে খাড়া পাহাড়। ফলে সাধারণের বেশ খানিকটা নাগালের বাইরেই এই মনাস্টারি। অবশ্য এরইমধ্যে মনাস্টারির বয়স অনুমান করে কাকাবাবু অনুমান করেন যে এখানে থাকা প্রাচীন লামারও তাহলে জন্ম-ইতিহাস তিব্বতে নয়, ভারতেই রয়েছে। এরপর মনাস্টারিতে প্রবেশ করে তারা। অন্ধকারের মধ্যে পথ এবং মানুষ উভয়েই যেন গুলিয়ে যায় কাকাবাবুর কাছে। যদিও বজ্রলামার সদম্ভ নেতৃত্ব যে এ মনাস্টারিতেও রয়েছে সে কথা বুঝতে বাকি থাকে না কাকাবাবুর। কখনও অনুগতদের নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা আবার কখনও বজ্রলামার শ্যেনদৃষ্টি সমন্বিত আদেশ সে ভাবনাতেই আস্থা প্রকাশ করে। শেষ পর্যন্ত প্রাচীন লামার সাক্ষাৎ পায় কাকাবাবু ও নরবু। ধূপের অচেনা ধোঁয়া আর চকমকি আলো, নিষ্পাপ বালকের মতন এক অতি বৃদ্ধের শুয়ে থাকা এবং তাকে স্পর্শ করতেই কাকাবাবুর অচেতন হওয়া যেন পলকের মধ্যে ঘটে যায় সমস্ত কিছু। তবে সবথেকে বড় ধাক্কা আসে এর পরে, যখন পরদিন সকালে

বজ্রলামা মারফত জানতে পারে যে, সন্তু এ মনাস্টারিতে থেকে যাবে, আর ফিরে যাবে না কাকাবাবুর সঙ্গে। প্রাণের চেয়েও প্রিয়, নিত্যসঙ্গী সন্তুকে ফেলে চলে আসবে কাকাবাবু, একথা সে ভাবতে পারে না। যদিও সন্তু কাকাবাবুকে চিনতে অস্বীকার করে এবং মনাস্টারিতেই থেকে যায়। আর কাকাবাবুকে বজ্রলামা ও তার দলবলের কাছে হার মেনে ফিরে আসতে হয়।

যদিও কাকাবাবুর অন্যান্য অভিযানের মত এক্ষেত্রেও শেষ পর্যায়ে এসে রহস্য জমে ওঠে পরতে পরতে। সন্তুকে উদ্ধারে সাহায্য নিতে হয় পুলিশের, আর তখনই পুনরায় আবির্ভাব হয় ফিলিপ তামাং-এর। এসময় বিজনবাড়ি থানার পুলিশ অফিসারের বক্তব্য চোখে পড়ার মত। রাষ্ট্রপতির চিঠি দেখেও সে কাকাবাবুকে জানায় – "তিব্বতীরা অধিকাংশই খুব ভালো লোক। খুবই ধর্মপ্রাণ ও শান্তিপ্রিয়। এই অঞ্চলে বেশ কয়েকটা মনাস্টারি আছে, কোথাও কোনও গণ্ডগোল হয় না। স্থানীয় লোকদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ভালো। কোনো মনাস্টারিতেই পুলিশ নিয়ে যাবার অর্ডার আমাদের নেই। লামাদের এখানে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধা করে। একমাত্র বজ্রলামাকে সবাই ভয় পায়।"

উত্তরে কাকাবাবুও বলে ওঠেন – "বজ্রলামা সবাইকে এরকম ভয় পাইয়ে রেখেছেন কেন? এটা কি কোনও ধর্মগুরুকে মানায়?" ধর্মের প্রাচীরে যে কিভাবে মানুষ আবদ্ধ হয় এবং তা যে অযথা এ তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যভাবনার অন্যতম মৌল উপাদান। অতঃপর সন্তু উদ্ধার ও প্রাচীন লামার রহস্য উদ্‌ঘাটন এই দুইয়ের জন্য কাকাবাবুর সঙ্গী হলেন ফিলিপ তামাং ও তার অনুচর জগমোহন। আর ক্যাপ্টেন নরবুর উপর দায়িত্ব বর্তাল ভোরের মধ্যে পুলিশ নিয়ে আসার। ফিলিপকে সুবিধের বলে মনে না হলেও কাকাবাবু বাধ্য হলেন তাকে নিয়ে যেতে।

রাজা রায়চৌধুরীর ভক্ত পাঠকবর্গ এসময় টানটান উত্তেজনার পিঠে সওয়ার। মনাস্টারির অন্ধকারের গহিনতায় এক রহস্যময় ধর্মস্থানে এই অভিযান শিহরণে ভরপুর। মনাস্টারির ভিতরেও ছোটখাট দু-একটা লড়াই হয়ে গেল আর বোঝা গেল ফিলিপের উদ্দেশ্য। সে এসেছে 'মারাংবু গাছে'র শিকড় সংগ্রহ করতে, যার আরেক নাম 'ট্রি অফ গুড হোপ'। একশো বছর আগে পৃথিবী থেকে সেই গাছ শেষ হয়ে গেছে। একসময় তিব্বত আর চিনদেশের অন্য দু-একটা জায়গায় পাওয়া যেত। কনফুসিয়াস্ এই গাছের শেকড়ের গুণের কথা লিখে গেছেন। এই শেকড় খেলে মানুষের সব রোগ-ভোগ সেরে যায়। আয়ু অনেক বেশি হয়। এই অমূলক ভাবনা, মিথের মোহ বারবার ধর্মের অন্তরের অমূলকতাকে প্রকাশ্যে এনেছে। সুনীল সারাজীবন যেভাবে মানবধর্মের পক্ষে সওয়াল করেছেন, তাতে ধর্মের মোহকে যে তিনি আঘাত করবেন এমনটাই স্বাভাবিক। ক্রমে মনাস্টারির ছোট ছোট রহস্য

ভেদ হতে থাকে। আর কার্যসিদ্ধি হলে ফিলিপ যখন কাকাবাবুকে বিপদে ফেলে পালাবার সময় বন্দুক তাক্ করে তখন গর্জে ওঠেন কাকাবাবু এবং পুনরায় উচ্চারণ করেন সেই ট্রেডমার্ক কাকাবাবু সাবধানবাণী – "রিভলবারটা নামাও। আমার দিকে কেউ অস্ত্র তুললে তাকে কোনও না কোনও সময়ে আমি শাস্তি দেবই।" যদিও সে সুযোগ আর পান না কাকাবাবু। বজ্রলামার পোষা ভয়ংকর ভাল্লুক নৃশংসভাবে হত্যা করে ফিলিপ তামাংকে। কাকাবাবু যদিও বা ছ'ছটি গুলির দৌলতে নিকেশ করে ভাল্লুকের প্রাণ; কিন্তু উপস্থিত হয় বজ্রলামা। আর অসাধারণ দক্ষতায় তখন বজ্রলামাকে আছাড় মেরে ধরাশায়ী করেন কাকাবাবু। আর বলেন – "আমাকে হিপনোটাইজ করতে পারে এমন মানুষ পৃথিবীতে জন্মায়নি। তুমি আমাকে ইলেক্‌ট্রিক শক খাইয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিলে, আমি তার বদলা নিলাম। নড়াচড়া করলে তোমার পা খোঁড়া করে দেব। লামারা অতি শান্ত ও ভালোমানুষ হয়। তুমি লামাদের মধ্যে একটা কলঙ্ক! এখনও বলো সন্তু কোথায়?" সাধারণ চোখে এই মানুষটাকে তাই শুধুমাত্র খোঁড়া ভাবলে ভুল হবে। ফাঁকা রিভলবার হাতেই উদ্‌ঘাটন করে ফেলেন প্রাচীন লামা রহস্যের। তিনশো দুই বছর নয়, সত্যিই এক নবীন বালক, যে কিনা 'ইলেক্‌ট্রিক ম্যান'। এদের শরীর বিদ্যুৎ জমে থাকে। আর সেই সঙ্গে ছেলেটির অ্যালবিনোও আছে, তাই অমন সাদা চুল। বিশ্বাসে আঘাত নয়, ধর্মের মোড়কটাকে ছিঁড়ে ফেলা হয়। মনাস্টারির আবদ্ধতা, পবিত্রতাকেই গুরুত্ব দেন কাকাবাবু।

আসলে, ইতিহাসের প্রতি গভীর নিষ্ঠা এবং বাস্তব ও বিজ্ঞানকে মর্যাদা – সুনীলের কাকাবাবুর গভীর নিষ্ঠা এর প্রতি। বৌদ্ধ ইতিহাসেও তার যে বিশেষ দক্ষতা তা অবশ্য কনিষ্ক মূর্তি উদ্ধার বা 'পাহাড় চূড়ায় আতঙ্কে' ইত্যাদি প্রসঙ্গেই জানা গেছে। অহৈতুকী ধর্মবিশ্বাসকে একেবারেই না-পসন্দ তাঁর। আর এই গল্পে কাকাবাবুর স্রষ্টা সরাসরি আঘাত হেনেছেন গুরুবাদের বিরুদ্ধে। গুরুবাদের অন্তরে যে ভয় ও স্বৈরতন্ত্রের বীজ লুকিয়ে আছে তা বুঝিয়েছেন। সুনীল জানতেন বৌদ্ধ সাধনায় গুরুবাদের এক বিশাল ব্যাপ্তি রয়েছে। বিশেষত ভারতীয় বৌদ্ধ অধ্যাত্ম সাধনায় গুরুর স্থান অনেক উচ্চে। কারণ ঈশ্বরচেতনা বহু যুগাগত একটি সংস্কার, কিন্তু গুরু সেই ঈশ্বরচেতনার জীবন্ত ও বাস্তব বা চাক্ষুষ প্রমাণ। বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনেও এর প্রমাণ পাই। চর্যাগীতির টীকাকার মুনিদত্ত বিভিন্ন বচন আহরণ করে গুরুমাহাত্ম্য বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। একটি শ্লোকে বলা হয়েছে –

"না বিনা বজ্রগুরুণা সর্বক্লেশপ্রহাণকং।
নির্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্তিকমাপ্নুয়াৎ।।"

অর্থাৎ, বজ্রগুরু ব্যতীত সর্বক্লেশনাশক, শান্ত, পরিবর্তনহীন নির্বাণাবস্থাকে পাওয়া যায় না।

এ গল্পের বজ্রলামার চরিত্রও যেন সেই কাঠামোকে ভিত্তি করেই নির্মিত। আর

এমন গুরুবাদকে ধর্মের কোনও সংজ্ঞাতেই না পড়া নাধর্মী সুনীল যে বিঁধবেন, এমনটাই প্রত্যাশিত, মাধ্যম হয়েছেন কাকাবাবু। সাধারণ বা স্থানীয় মানুষদেরকে বারবার কাকাবাবু বজ্রলামার অলৌকিক শক্তিকে যাচাই-এর কথা বলেছেন। ক্ষিপ্র বুদ্ধির বশে ধূপে যে ফুলঝুরির বারুদ আছে তা বুঝতে পারেন, বৈদ্যুতিন বাল্ব বা প্রাচীন লামার ঘরে জেনারেটরের উপস্থিতিকে ধরতে পারেন। আর এসবের মূলে আছে বজ্রলামার হিপ্‌নোটিজ্‌ম। চোখের দৃষ্টিতেই তিনি বশ করেন সবাইকে। আসলে যে কোনও ধর্মের আড়ালেই তো লুকিয়ে আছে সম্মোহন। যে ধর্মের গুরুরা যত বেশি সম্মোহিত করতে পারেন, তাদের শিষ্যদের প্রতি মোহ বিস্তারও ততোধিক হয়। তাছাড়া মানুষ ধর্মে ততটাই বিশ্বাস করবে, যতটা সে ভয় পাবে। বৌদ্ধধর্মের উপস্থিতি আমাদের কাছে শান্তি ও সৌম্যতার বার্তা বয়ে আনে। কিন্তু বজ্রলামারা নিজেদের সুবিধার্থে তৈরি করে রহস্য আর অন্ধকারময় মনাস্টারি। তাই যে অঞ্চলে নজরে পড়ে স্লিপিং বুদ্ধ, সেখানেই স্লিপিং প্রাচীন লামার রহস্য কিশোর পাঠকের আকর্ষণ জাগায়। উন্মোচন হয় রহস্যের, উন্মোচিত হয় লুকিয়ে থাকা অন্ধ ধর্ম রাজত্বও। আর জ্ঞান, বুদ্ধি আর বাস্তবের স্ট্র্যাটেজিতে জয়ী হন কাকাবাবু ওরফে রাজা রায়চৌধুরী ওরফে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রন্থসূত্র

১. 'কাকাবাবু সমগ্র ২'। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চদশ সংস্করণ ২০১৪।
২. 'বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যগণ বিরচিত চর্যাগীতিকোষ'। সৌম্যেন্দ্রনাথ সরকার। মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৮।
৩. 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও গ্রন্থ পরিচয়'। রফিক উল ইসলাম সম্পাদিত, ২০১২।

....

The Story of Ramayana in Buddhist Literature

Modhurima Mukherjee

In India, the Ramayana is familiar as the most ancient epic. Ramayana is believed as the most holy religious text among the Hindus. Following the advices of Lord Brahma, the eminent ancient poet Valmiki composed this epic on the basis of the character of Rama. Nowadays the form of Ramayana which we go through is divided into seven 'Kandas'. The familiarity of Ramayana to the Indian people has reached in such a great height that all the other epics of the whole world can never touch that level. According to M. Williams, notwithstanding the wilderness of exaggeration and hyperbole through which the reader of the Indian epics has occasionally to wander, there are in the whole range of the world's literature few more charming poems than the Ramayana. According to the Western Indologist Prof. Lassen main story of Ramayana is an allegory of the wide spread of Aryan civilization in southern region of India as well as Ceylon. Seeing similarity between the name 'Balarama' and 'Rama' as well as 'Sita' and 'Hala', Weber thought – she accordingly represents Aryan husbandry, which has to be protected by Rama – whom I regard as originally identical with Balarama 'Halabhrit', 'the plough-bearer', though the two were afterwards separated – against the attacks of the predatory aborigines.

It is quite difficult to find the influence of Buddhism in Ramayana. In famous 'Dasharatha Jataka', Rama as Ramapandit was familiar. According to this story Dasharatha was the ruler of Varanasi. Rama, Lakshmana and Sita were the children of his first wife. Though name of his wife is still unknown. After the death of his first wife, his second wife took her place. Bharata was her only son. Yet her name is still unknown. When the age of Bharata was seven, his mother reminded his father about the promise which he had made her. And wanted her son to be the next king. But it was unfair for the king to select his third son for the throne because of his eldest son being alive. But it was not void for the king to move away from his promises. And so he ordered his two elder sons to go away from his kingdom for twelve long years.

Rama along with his brother Lakshmana and sister Sita went to

the Himalayas and built their hermitage. The prophecy made by the seers that the king Dasharatha would live for twelve years did not come true. King Dasharatha died earlier because of the pain and sorrows which he had after he got detached from his off springs. Now, it was time for Bharata to conquer the throne as king Dasharatha was no more. But the people of Varanasi did not accept him as their new ruler as he was just sixteen years old. Now, Bharata went to the Himalayas to bring back home to his brothers and sister. Rama was sad by news of his father's death, but he didn't return, as he promised to his late father. And so Bharata returned to Varanasi without his eldest brother but brought with him his shoes, which he established on the throne and started to rule the kingdom skilfully on behalf of his brother. After three years Rama returned to Varanasi. Sita became his first wife and they happily ruled the kingdom for long sixteen thousand years.

According to the allegory of the story 'Suddhodana' was Dasharatha. 'Mahamaya' was Rama's mother and 'Sita' was Rahul's mother. Buddha's two disciples, 'Ananda' and 'Sariputra' were Bharata and Lakshmana. And Lord Buddha himself was Rama Pandit. 'Dasharathajataka' has certain characteristics. It is mainly a Buddhist story. Here Rama's power and strength are not mentioned. His thoughts are divine. And some supernatural powers are too mixed with it. Though he married his sister but still he is divine.

Two more Ramayana stories are familiar in Chinese Ramayana. First one was composed on 251 A.D. in Chinese script. In this story, maternal uncle of Rama forcefully captured his kingdom. Rama along with Sita moved to mountainous region and started living there. In absence of Rama an evil snake cheated and kidnapped Sita. Rama along with his troops of monkeys saved Sita. And the other story was written in 472 AD in Chinese script. But in this story marriage of Rama was not found. But, here Rama took the place of Narayana and his powers.

The story of Ramayana had deep influence in the Thai culture as well as religion. The capital of this kingdom was Ayodhya. The story of Ramayana which was composed in Thailand was familiar with the name 'Ramakein'. The name of the ruler was Rama. The kingdom ruined in mid

of eighteenth century. For this reason in Thailand the Ramayana's story is found very widely-spread. The first ruler in name of Rama made Bangkok his capital.

Though 'Ramakein' was mainly built with Buddhist religion and culture but the first king Rama, was much fond of the Hindu culture and religion. Whereas 'Ramakein' was mainly consisted of Buddhist principles. It was religion followed by a specific kingdom. And the followers of Lord Shiva were too found in this kingdom.

References: -

1. A History of Sanskrit Literature – A.B. Keith, New Delhi.
2. Jataka (Vol. II) – Ishan Chandra Ghosh, Kolkata.
3. Ramakathar Prak Itihas – Sukumar Sen, Kolkata.
4. Ramayanacharcha, Bharate Bohir Bharate – Edt. By Tapas Bhowmik (Kolkata).

....

positive qualities like knowledge, purity etc; nirvana was the source of the origin of beauty and prosperity of life. It had no birth or death i.e., it was immortal, absolute, eternal, and pure. Happiness, purification and emancipation were its chief characteristics.[7] The Buddhists regarded this worldly life as an existence full of turmoil. 'His aim is to escape from the movement of phenomenal life into a state of absolute quiescence, a condition in which all emotions and all concrete thought is stopped for ever.[8] The term 'Nirvana' was probably pre Buddhistic and was formerly applied to the Brahmanical ideal of the dissolution of the individual in the universal whole or 'brahma-nirvana'. According to Nagarjuna, there was no line of demarcation between the phenomenal world and the Absolute.

'Where is the limit of Nirvana,
Tis also the limit of Samsara,
There is no line of demarcation,
No slightest shade of difference
between them.'

Nirvana meant the suppression of absolutely all the false imagination. In the Nirvana, all elements of existence were finished 'because all of them, whether they be called defilers or the creative power of life or individual existence or groups of elements, they have all totally vanished. Absolute is negation of the Phenomenal.'[9]

Buddhism ignores the theories of God and soul. The Buddha genuinely believed that there is no existence, no reality which is static and stationary. Things are in perpetual motion, constantly originating and constantly ceasing without any break or *nirantara*.[10] The Buddha is the only omniscient because the only ultimate truth was realized by the Buddha only. All other doctrines are lost in the false doctrine of soul. The possession of the perfect knowledge of all things, the knowledge of all the true nature of things (i.e., of their soul- lessness) is the sole characteristic of a Buddha.[11] The Buddha preached the ideal of a perfect life in this world, in Arahatship and thereby ignored the theory of the soul. Real advance in ethical life starts when the delusions about the soul have been renounced. The salvation that the Buddhist seeks is not salvation from hell or sin. Arahatship is a state of unspeakable bliss. It is an escape from the cycle of rebirths. Ignorance is the cause of Individuality.

Individual's thought, word and deed are the qualities that make up an individual Consciousness, Name and Form, the Senses, Contact, Sensation, Thirst(craving following from sensation), Grasping, Becoming (the tendency to be), Birth, the Old age and Death constitute the chain of causes happening in human life. There is a dependence of each one of these links upon the other, but the dependence is not always of the same kind, either of time or of cause and effect.[12] From this wheel, the soul longs to escape. The Buddhists view salvation not as an escape from sin or hell but from this relentless circle of births and sufferings. All the Indian philosophies are unanimous in propagation that ignorance is the cause of origin of the whole evil which needs to be destroyed. But they differ as to the consequences that would result after the destruction of the ignorance. The Vedantist believe that the soul of a man will merge with the Bigger soul leading to union with God. According to the Buddhist philosophy, the destruction of ignorance is the way to escape from the wheel of life but the union with God is not to be achieved after death. The victory to be gained after the destruction of ignorance can be enjoyed in this life only. This is called the Buddhist ideal of Arahatship i.e. 'the life of a man made perfect by insight, the life of a man who had travelled along the "Noble Eightfold path" and broken all the "Fetters" and carried out in its entirety, the Buddhist system of self culture and self control'.[13] Nirvana is stated as the advent of the kingdom of Heaven within a man. In a primary sense, Nirvana means the "going out" (going out of the flame of a lamp) and in a ethical sense, it signifies the going out or destruction of the threefold fire of lust, ill-will and delusion. It also means the end of grasping which will lead to the another birth of a new individual. The Buddhist poem reaches its highest beauty when it describes the glory attained by achieving victory over the world and over birth and death. An inward peace and joy is achieved that can never be shaken. Nirvana is to be known "by freedom from distress and danger, by confidence, by peace, by calm, by bliss, by happiness, by delicacy, by purity, by freshness...". When one reaches a state in which there is no becoming, he then will be calm. He will get rid of lust, of evil, of karma, of cravings, of passion and would achieve peace or Nirvana. 'And therewith does his mind leap forward into the state in which there is no becoming, and then has he found peace, then does he exult and rejoice

Publishers Ltd, 1998), p.272
8. Theo.Stcherbatsky, *The Concept of Buddhist Nirvana. (Varanasi, Bharatiya Vidya Prakashan, 1975), p.3*
9. *Ibid, p.193*
10. Lalmani Joshi, *op.cit.p.197*
11. *Ibid, p.207*
12. Rhys Davids, *History and Literature of Buddhism. (Calcutta, Susil Gupta India Ltd, 1952), p.109*
13. *Ibid, p.111*
14. *Ibid, p.120*
15. *Ibid, p.126*
16. Nalinaksha Dutt, *Mahayana Buddhism, (Calcutta, Firma KLM Pvt. Ltd, 1976), p.187*
17. *Ibid, p.189*
18. *Ibid, p.195*
19. *Ibid, p.248.*

....

Psycho-Therapeutic Aspects of Buddhist Meditation

Animesh Prakash

This is my humble attempt to throw light on the therapeutic aspects of Buddhist Meditation that cure the mental problems and abnormal behaviours in the modern society.

Buddhist meditation is a form of mental concentration that leads ultimately to enlightenment and spiritual freedom. Meditation occupies a central place in all forms of Buddhism, but has developed characteristic variations in different Buddhist traditions. There are two main types of Buddhist meditation. One is *Samathā*, the other is *Vipassanā*. Samatha (Sanskrit: *śamatna*) is a *Pāli* word made up with the root √Sam means to become calm (PED: 682). The term *samatha* means concentration, calmness, serenity. The purpose of *Samatha* meditation is to attain higher concentration of mind. *Vipassanā* (Sanskrit: *vipaśyanā*) is a *Pāli* word has two component parts: '*vi*' and '*Passanā*'. 'vi' is a prefix, meaning minutely, perfectly, exactly, sincerely, inwardly, intrinsically etc. And '*Passanā*' means looking, observing, analyzing, introspecting, investigating etc. (Tiwary, 15). Thus, the word '*vipassanā*' as a whole, may be rightfully explained as 'to see or to perceive' correctly and accurately or to go positive into the insightness. By insight, one should mean, to see the nature of thing as they really are, not as they seem to be. It makes it crystal clear that everything is impermanent (*sabbe saṅkhārā aniccā*), everything is subject to suffering (*sabbe saṅkhārā dukkhā*) and everything is substanceless (*sabbe dhammā anattā*).

The role of meditation in effecting the total development of the personality-intellectual, ethical and spiritual, has been beautifully expressed in that famous world-classic, the Dhammapada, in these words:

Yogā ve jāyatī, bhūri, ayogā bhūrisaṅkhayo;

Etaṃ dvedhāpathaṃ ñatvā, bhavāya vibhavāya ca.

(Dhp., verse 282)

In the whole journey of human life suffering is an inevitable part of life. No one can avoid it. In the present era everyone is running to make their physical health better by avoiding mental pressure. They don't

shrug it off by saying that is just a part of life. Due to this negative emotions formed such as *ragā*, *dosa*, *moha*, *māna* etc. A practical minded person cares as much for repairing the mind as to healing bodily malfunction or in other words by psychotherapy, ·they independently perform self-therapy of mind.

Training of mind is assumed to be the task of formal education in schools, colleges and universities. By learning the facts and figures and techniques of the various academic subjects, it is assumed that the mind is trained. The knowledge one can gain through formal education may be of immense value, but it is not the same as training of mind.

Intelligence, knowledge and thinking abilities allows the mind to be very good at handling the outside world, but they may be of little value in helping an individual to control his inner life. Understanding the mind is one of the vital issues to the human world. The question "what is mind and what it is?" Was raised by thinkers only with one problem of bondage and salvation. Actually, bondage means all sorts of miseries experienced by the external and internal sense organ. The salvation refers to the achievement of the state where there is no miseries at all. The fact, therefore of human mind is that is under the shadow of misery starting from the moment of birth till death. For, this reason the Buddha has given much emphasis on the study of mind. For mind, according to the Buddha is forerunner of thoughts and actions – "*Mano pubbangmā dhammā........*). thoughts and actions spring from motivation – *Cetanāham, bhikkhave, kammam vadāmi*". (DN, 3.348; AN, 6.63)

According to one recent report[1] The World Health Organization predicts that within 20 years more people will be affected by depression than any other health problem. WHO figures reveal that currently, it is now estimated that 350 million people globally are affected by depression or mental disorders.

We find the meaning of mental illness in Buddhism as follow:

- Mental illness is determined by the manifestation of mental defilements

[1] See http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8230549.stm http://www.who.int/mental_health/management/depression/who_paper_depression_wfmh_2012.pdf

- Mental illness is impermanent
- Mental illness is conditioned
- Mental illness is an ultimate reality (Nandisena; 139)

In the whole journey of human life suffering is an inevitable part of life. No one can avoid it. In the present era everyone is running to make their physical health better by avoiding mental pressure. They don't shrug it off by saying that is a part of life. Due to this negative emotions formed such as *lobha*, *rāga*, *dosa*, *moha*, *māna* etc. In the *Mūla Sutta* (AN, 1.201) it is said that individual's mind is beleaguered by the Noxious trio – *lobha*, *dosa*, *moha*. According to *Loka Sutta* (SN; 5.175) this triple root, when arising, causes harm, stress and discomfort. After all modern material progress by itself is not objectionable it is the craving of man for more and for himself only is creating all the troubles in the world. Dangers of clinging to material progress alone manifest themselves in many part of the world today, for it often breeds profanity and bestiality in man. To avoid such dangers, progress in material comfort and conveniences must be paralleled by a corresponding development in spirituality. It is clear that material progress alone cannot bring about peace and happiness in the world. A practical minded person cares as much for repairing the mind as to healing bodily malfunction or in other words by psychotherapy, they independently perform self-therapy of mind.

Rathavinīta Sutta (MN; 1.201) expounds sevenfold purity (*satta visuddhi*) as the seven successive methods of purification in Insight meditation:

1. Purity of Morality: *Sīla-visuddhi*
2. Purity of Mind: *Citta-visuddhi*
3. Purity of Views: *Diṭṭhi-visuddhi*
4. Purity of overcoming Doubts: *Kaṇkhāvitaraṇa-visuddhi*
5. Purity of knowledge and Vision of what is Path and Not-Path: *Maggāmaggañāṇadassana –visuddhi*
6. Purity of knowledge and Vision of the Way or Progress: *Paṭipadā-ñāṇadassanavisuddhi*

7. Purity of knowledge and Insight: *Ñāṇadassana-visuddhi*

It is not possible to by-pass any of these stages. It will thus be seen that Purity of Morality (*Sīla-visuddhi*) is the first essential requisite and the Purity of Mind (*Citta-visuddhi*) is the second to be fulfilled before one can profitably embark on the five final stages of purification of Understanding.

The *Dasuttara Sutta* of *Dīghanikaya* explains the Sevenfold Purifications among nine fectors of endeavour leading to purification (*pārisuddhipadhāniyanga*), out of which the last two are purification of wisdom and purification of emancipation. In the context of the seven successive methods of purification, purity in a nutshell means the elimination of unwholesome factors repugnant to purification.

1. Purity of morality (*Sila-visuddhi*): "Purification of Morality" is in brief, to refrain from all evil and to do well "*Sabba Pāpassa akaraṇaṃ, kusalassa upasampadā*" Refraining from all evil is based on the internal restrain of clearly conscious mind. This consist mainly – abstain from bodily and vocal misconduct. The 'bodily misconduct includes – killing (*Pāṇātipātā*); Stealing (*Adinnādānā*); sexual misconduct (*Kāmesemicchācārā*); use of intoxicants; wrong modes of livelihood. The vocal misconduct consists of lying (*Mūsāvādā*); slander (*Pisunavācā*); harsh speech (*Farusāvācā*) and frivolous talk (*Samphappalāpā*). In order to do good one develops characteristics directly opposed to unskilful acts and speech just mentioned above.

By abstaining from immoral speech, actions and livelihood, the quality of blamelessness with non-remorse as the benefit can be achieved. One who observes the precepts is dear and loved by his companions holding him in high esteem. Non-remorse leads to joy (*piti*) and bliss (*sukha*), followed by tranquillity (*passadhi*), the proximate cause of concentration (*Samādhi*). With concentrated mind, one is able to penetrate into the true nature of things (*yathābhūta- ñāṇa*) through Insight (*vipassanā*) and attain the Path and Fruition Knowledge (*magga-phala ñāṇa*). Thus, Sila is of many therapeutic aspects beginning with non-remorse and ending with the realization of *Nibbāna*. The Moral Purity purges the mind of its inferior, mean and inimical propensities and paves

the way for inward purification.

2. Purity of mind (*citta -vasuddhi*): Purity of mind is the second of the seven stages of purification. It is profitable unification of the mind on a single object whereby the mind remains undistracted, unscattered, pure and tranquil. As such it is preliminary condition absolutely necessary as a foundation either for developing insight (*Vipassanā*). Mental concentration can never be bypassed before one may profitably embark on meditative development of understanding (*Vipassanā Bhāvanā*).

The following mental disorders suffered by the Deluded-natured (moha-carita) are brought into diminution by Purity of Mind.

- *thīna-middha* – sloth and torpor (3rd of the five Hindrances),
- *Uddhacca* – restlessness (one mental hindrance and also one of the Ten Fetters),
- *Kukkucca* – wrongly-performed-ness like scruples, remorse, uneasiness of conscience, worry
- *Vicikicchā* – sceptical doubts (one of the three fetters)

3. Purity of Views: *Diṭṭhi-visuddhi* : Purity of view is the vision according to reality, that what is commonly referred to as a living being, consist merely of *Nāma* and *Rūpa* "mentality and materiality", and is void of an ego. The meditative development of this view may be done in any one of several ways prescribed in *Visuddhimagga*.

Due to *Diṭṭhi Visuddhi*, one attains the view of reality or seeing things as they are (*yathābhūta-dassana*) that avoids falling into extremes and forming perversions or distortions of views (*diṭṭhi-vipallāsa*). The misconception that causes one to think as "I-ness" or "I am-conceit" (ego-conceit, *asmi-māna*) is eliminated. Seeing the transience of the Five Aggregates and their relation to phenomenal existence, he is not worried by the vicissitude of the world. A potentiality to face and overcome sorrow and lamentation is developed, and mindfulness to understand the truth that everything is impermanent including our own lives is developed. A wakefulness that everything is changing all of the time is created. By seeing this truth of impermanence of all worldly vicissitudes, our mind is

trained to maintain equanimity leading to balance of our mind.

4. Purity of overcoming Doubts (*Kaṇkhāvitaraṇa-visuddhi*) : To gain freedom from all doubts concerning the nature and pattern of existence, it is necessary to understand the law of cause and effect, dependent origination, *kamma* and its result etc. Should be understood as Purity of overcoming doubts.

It is the knowledge established by overcoming doubts about the three phases of time-past, present and future by discerning "conditions of mentality and materiality" according to cause and effect. It is the conquest of all doubts regarding the phenomenan existence through the comprehension of the causal relation of mind and body (*nāma-rūpa*) understanding their causes and conditions in the context of *saṃsāric* existence. It sees only a conditioning body-and-mind process and a conditioned body-and-mind process. It can also be stated in the manner that it is the knowledge that comprehends the law of *kamma* and its result in the context of mind and body and it is done by reducing doubts about the three phases of time by discerning the conditions of mentality-materiality.

5. Purity of Knowledge and Vision of what is Path and Non-Path (*Maggāmaggañāṇadassana – visuddhi*) : "By purification by knowledge and vision of what is path and not-path (*Maggāmaggañānadassana – visuddhi*) is meant that understanding which knows the right path from the wrong path: "This is the right path, that the wrong path." During such insight practice, however, may arise the 10 imperfections (or defilements) of insight (*vipassanūpakkilesa*) : effulgence of light (*obhāsa*), knowledge (*ñāna*), rapture (*pīti*), tranquillity (*passaddhi*), happiness (*sukha*), determination (*adhimokkha*), energy (*paggaha*), awareness (*upaṭṭhāna*), delight (*nikanti*) (Ñāṇamoli; 739). Here the knowledge established by coming to know that seeing illumination etc. is obstacle in the way to *Nibbāna* and therefore it is wrong path, ignoring them and continuing to meditate is the right path.

6. Purity of Knowledge and Vision of the Way or Progress (*Paṭipadāñāṇadassana -visuddhi*) : At this stage, with the absence of the inimical influences of the Ten Imperfections of Insight, insight reaches its culmination through a gradual and steady progress (known as *paṭipada*) which consists of the Eight Knowledge with knowledge in Conformity with truth (*saccānulomika-ñāṇa*), as the ninth. This is the knowledge adapted to the Four Noble Truths. The knowledge of contemplation of dissolution (*bhangānupassanā-ñāṇa*), one of the Eight Knowledge is conducive to eight advantages:

1) Elimination of wrong views regarding becoming
2) Abandoning the craving for life
3) Constant application in what is suitable
4) Purity of livelihood
5) Elimination of anxiety
6) Expulsion of fear
7) Possession of patience and self-control
8) Overcoming of dissatisfaction

7. Purity of Knowledge and Insight (*Ñāṇadassana-visuddhi*) : This is the complete purity gained through the knowledge of the four noble path – the path of stream entry, the path of once return, the path of non-return and the path of perfect holiness (Ñāṇamoli: 701). The knowledge of these four mundane paths that lead to the total eradication of all defilements is the purity of knowledge and insight.

The mental problems caused due to attachment, aversion, torpor, restlessness and conflict are overcome by the Purity of Mind(Citta-visuddhi) through eight attainments – four *rūpā jhānās* and four *arūpa jhānas* (*aṭṭha samāpatti*) with access-concentration (*upacāra – Samādhi*) which has the potentiality to suppress the Five Hindrances (*pañcanivaraṇa*). The overcoming by tranquilization is *Paṭipassaddhi-pahāna*. As a result we see that the total purity of mind brings about the complete eradication of all taints or cankers putting an end to all types of mental disorders and problematic behaviours.

The seven types of Purification mentioned above are different stations on the way to *Nibbāna*. Anybody who wants to achieve his emancipation has to cross them one by one till he attains his goal. Eventually, psychotherapeutic methods reflected in seven stage of purification can profusely be adopted to cure mental problems and abnormal behaviours in the modern society.

RÉFERENCE

- **Primary Sources :**
  Tipitaka & Its Commentary
  (All reference taken from VRI *Chaṭṭa Saṅgāyana, Devanāgar* Edition, 1998, Igatpuri, Maharashtra, India.)

- **Secondary Sources :**
  - Nandisena, Bhikhu, *Mental illness according to Theravād Bhuddhism towards a theory of Mental Illness based upon th Buddha's Teachings*. proceedings of the 2nd IABU conferenc Thailand, 2012.
  - Davids R and Stede W, *Pali English Dictionary*. Motil Banarsidas Publishers, Delhi, 2003.
  - Nanomoli, Bhikkhu, *The path of Purification*. Buddhi Publication Society, Kandy, Sri Lanka, 2010.
  - Tiwaṛy M, *Sīla, Samādhi* and *Prajñā*, K.P. Jayaswal Resear Institute, Patna, 1987.

ABBREBRIATION

AN	*Aṅguttara – Nikāya*
Dhp	*Dhammapada*
DN	*Dīgha-Nikāya*
MN	*Majjhima-Nikāya*
SN	*Saṃyutta-Nikāya*
PED	Pāli English Dictionary

....

UDDALAK
Jan.-Dec.-2014
Vol.-13

D.L. No.- 55 JM 03
ISSN : 2320-9275

উদ্দালক পাবলিশিং হাউসের বই

পুলিন দাস রচিত

মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ : ১৪০ টাকা

সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত ও সম্পাদিত

রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ সাহিত্য : ১০০ টাকা
রক্তকরবী : আলোকিত উদ্ভাসন (সম্পাদিত) : ২২৫ টাকা
বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে রবি কিরণে নবরত্ন : ৬০ টাকা
রবীন্দ্র কাব্যনাট্য রূপ ও রূপান্তর : ৯০ টাকা
দূরশিক্ষা দিশারী বাংলা (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়)
পার্ট-১— ৩০০ টাকা, পার্ট-২— ৩০০ টাকা
দূরশিক্ষা দিশারী বাংলা (কল্যানী বিশ্ববিদ্যালয়)
পার্ট-১— ৩৫০ টাকা, পার্ট-২ (প্রকাশিতব্য)

প্রতিযোগিতামূলক

নেট-সেট জেনারেল প্রথম পত্র : দ্বিভাষিক ৩৫০ টাকা
নেট-সেট বাংলা দ্বিতীয় পত্র : বৈকল্পিক ৪৮০ টাকা
নেট বাংলা তৃতীয় পত্র : বৈকল্পিক ৩৪৫ টাকা
সেট বাংলা তৃতীয় পত্র : সংক্ষিপ্ত ও রচনাধর্মী ৩৬০ টাকা
এস. এস. সি. টেট : ১৮০ টাকা
এস. এস. সি. বাংলা (পাস) : ১৮০ টাকা
এস. এস. সি. বাংলা (অনার্স/পি.জি.) : ২২৫ টাকা
সি. টেট (প্রাইমারি) : ৩০০ টাকা

উদ্দালক সাহিত্য পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

মধুসূদন-দীনবন্ধু, রবীন্দ্র উপন্যাস, চৈতন্যপূর্ব বাংলা সাহিত্য, বাঙালির সংস্কৃতি, রবীন্দ্র নাটক, মহাকাব্য, বাঙালির আত্মপরিচয় ইত্যাদি সংগ্রহের জন্য পত্রিকা দপ্তরে যোগাযোগ করুন।

দপ্তরের ঠিকানা : ১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা - ৭০০০৪৯
দূরভাষ : ০৩৩-২৫৪১-৪৬১৭
কলেজ স্ট্রিটে প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, প্রজ্ঞা বিকাশ, পাতিরাম